খাওয়ারীজ এবং জিহাদ

শাইখ আবু হামযা আল মাসরি

পরিবেশনায়

খাওয়ারীজ এবং জিহাদ

শাইখ আবু হামযা আল মাসরি

সুচিপত্র

قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ عَـٰلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِى مَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

"বলুন, হে আল্লাহ আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত"।

(সূরা যুমার, আয়াত ৪৬)

বই পরিচিতি

তুমি তো খারেজিদের অন্তর্ভুক্ত! তুমি বৈধ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা বল!

এ কথাগুলো কি চেনা চেনা লাগছে? বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ তথা বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, বিশেষ করে রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা, তর্ক বিতর্কের ক্ষেত্রে, অবধারিত ভাবেই কোন না কোন পক্ষ এই উপসংহারে পৌছে যান যে তার প্রতিপক্ষ খারেজি।

কিন্তু যাদেরকে আজকে খারেজি বলা হচ্ছে, তাদের সবাই ইসলামি শারীয়াহ-র দৃষ্টিকোণ থেকে আসলেই কি খারেজি বলে অভিহিত হবার যোগ্য? খারেজি বিষয়ক আমাদের এই গবেষণাতে আমরা এসব অভিযোগ এবং সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছি। খারেজিদের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়, গভীর মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে ইসলামি শারীয়াহ ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আর অবস্থানের আলোকে, এ গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

খারেজিরা কিভাবে চিন্তা করে? তাদের মতাদর্শের যারা অনুসরণ করে তাদের ব্যাপারে খারেজিরা কিরকম ধারণা পোষণ করে? খারেজিরা কি কাফিরদের অন্তর্গত? নাকি মুসলিম?

আধুনিক খারেজি কারা? তাকফিরি আর খারেজির মধ্যে পার্থক্য কি? কিভাবে আমরা একজন খারেজিকে সনাক্ত করতে পারি? এ প্রশ্নগুলোর জবাবও এ কিতাবে দেয়া হয়েছে।

আধুনিক যুগে খারেজিদের চিন্তাধারার পুনঃজাগরন ঘটেছে যে ব্যক্তির মাধ্যমে তার একটি সাক্ষাৎকার এ বইতে আছে। পাশাপাশি উপমহাদেশে ও আলজেরিয়াতে খারেজিদের উত্থানের ইতিহাস এখানে আলোচিত হয়েছে। এবং বইটির উপসংহারে তাদের ভ্রান্ত ধারণা সমূহের অপনোদন করা হয়েছে। সাধারণ খারেজি ও মুরজি’আ খারেজিদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। মুরজি’আ খারেজিরা কিভাবে প্রায় সমগ্র মুসলিম উম্মাহর উপর তাদের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে আছে, কি ধরণের কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছে সে সম্পর্কে দুটি এক্সক্লুসিভ ঘটনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

ইংরেজী অনুবাদের সম্পাদকের বক্তব্য

বর্তমান বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মনোযোগী এবং উৎসাহী দর্শকদের জন্য এই বইটি ইনশাআল্লাহ্ অত্যন্ত উপকারী বলে সাব্যস্ত হবে। বইটি একই সাথে সময়োপযোগী এবং ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। এই বইয়ের বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য ও আক্বিদাগত বিষয়ে নিয়ে টীকা এবং তথ্যসংযোজন করতে পেরে আমি আনন্দিত বোধ করেছি। আমি নিশ্চিত আমার মতো, পাঠকও এই পর চেষ্টাকে উপভোগ করবেন এবং এ থেকে লাভবান হবেন।

আল্লাহ্ যেন আমাদের এই বিনীত ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন

ইবন উমার

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমান আর-রাহীম

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ
ওয়া আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু

আমার প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আস সালামু ‘আলাইকুম,

আশা করি আমার এই কথাগুলো পড়ার সময় আপনারা সুস্থ ও শান্তিতে আছেন এই বইটি ঠিক কী কারণে লেখা হল, এ প্রশ্নের জবাবে বেশ কিছু কারণ উপস্থাপন করা যায়। যার মধ্যে একটি হল, এই উম্মাহ ও মুজাহিদিনের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার জবাব দেয়া। তাগুতের আজ্ঞাবহ দরবারী ‘আলেমরা মুজাহিদিনকে খারেজি বলে আখ্যায়িত করে উম্মাহকে বিভ্রান্ত করেছে। একই ভাবে অজ্ঞ ও জাহেল ব্যক্তিরাও খারেজিদের মুজাহিদিন বলে আখ্যায়িত করে সমান অবিচার করেছে।

ব্যাক্তিগতভাবে আমি নিজেও খারেজি বলে আখ্যায়িত হয়েছি। বিশেষভাবে এই কারণটি আমাকে এই বইটি লেখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইসলামের ইতিহাসের পাতার দিকে তাকালে স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইতিহাসে আমিই এমন প্রথম ব্যক্তি না, যাকে জিহাদের প্রতি আহবান করার কারণে খারেজি বলা হয়েছে। ইমামুল আহলুস সুন্নাহ আহমাদ ইবন হানবাল, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহুম আজমা’ইনের মতো মহান উলামাগনকেও খারেজি বলা হয়েছিল এবং এ রকম আরো অনেক বিশেষণে ভূষিত

করা হয়েছিল। সত্যের পক্ষালম্বনের কারণে তারা প্রবল প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। সুতরাং এটা নতুন কিছুনা। পাশাপাশি যতো প্রতিকুলতাই আসুক না কেন, সত্য তুলে ধরার জন্য এবং জিহাদী আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের দায়িত্বের ব্যাপারে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে দায়বদ্ধ। এ কারণে কোন বাধা-বিপত্তি, প্রতিকূলতা বা অন্যায় আক্রমনের কারণে আমরা থেমে যেতে পারিনা। একই সাথে এই বিষয়টি (খারেজি ও জিহাদ) উম্মাহর সামনে পরিষ্কার করে তুলে ধরাও আমাদের দায়িত্ব।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল খারেজি এবং যাদেরকে অন্যায়ভাবে খারেজি বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, এদের মধ্যে পার্থক্য বোঝার জন্য আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়াল করা উচিৎ।

১. অনেক মানুষই খারেজি এবং মুজাহিদিন – এই দুটো শ্রেণীর পার্থক্য না বুঝে মিলিয়ে ফেলেন।
২. আমাদের অবশ্যই একটা পার্থক্য বুঝতে হবে। অনেক সময় কিছু মুজাহিদিন খারেজিতে পরিনত হয়। আর অনেক ক্ষেত্রেই খারেজিরা মুজাহিদিনের সাথে একসাথে হয়ে কাজ করে।
৩. যখন শারীয়াহ থাকে না, তখন কে খারেজি আর কে মুজাহিদ এটা বোঝা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন হয়ে পড়ে। অত্যাচারী শাসক ও তাওয়াঘীতের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মানুষের মধ্যে মুজাহিদিন তো অবশ্যই থাকেন, কিন্তু এমনও লোক থাকতে পারে, যারা মুজাহিদিনের রূপ ধারণ করে আছে, কিন্তু তারা আসলে খারেজি।
৪. আমাদের খারেজি বা এরকম নামে ডাকা হচ্ছে এজন্য আমরা জিহাদী আন্দোলন থামিয়ে দিতে পারিনা।

৫. খারেজিরা হল ইসলামের শত্রু, আর বর্তমান শাসকরা হল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শত্রু।

৬. যারা তাকফিরি কিন্তু নিজেদের ভ্রান্তবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে হত্যা করে না, আর যারা খারেজি, অর্থাৎ নিজেদের বিশ্বাসের উপর 'আমল করে যারা মুসলিমদের হত্যা করে – এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম শ্রেণীর অসুস্থতা হল তাদের মনে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্যা তাদের মনের সাথে সাথে তাদের তলোয়ারেও।

৭. খারেজিরা স্বেচ্ছায় মুনকার করতে চায়নি। কিন্তু শাসকরা স্বেচ্ছায় অনিষ্টকরে এবং দৃঢ়তার সাথে করে।

৮. আমাদের বিভিন্ন মুবতাদী দল সম্পর্কে ভালো করে অধ্যায়ন করা উচিৎ যাতে করে আমরা বুঝতে পারি, খারেজিরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিদ'আতি ফিরকা না, তবে তারাই প্রথম।

৯. পরিশেষে আমরা সকল আন্তরিক ভাই ও বোনদের আহবান জানাই, বাতিল ফিরকাদের অনিষ্ট সম্পর্কে সচেতন হবার জন্য। আমরা চাই আমাদের ভাই-বোনদের শেখাতে কিভাবে এসব দলের অনিষ্ট থেকে আমাদের নিজেদের এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর বিশুদ্ধ বিশ্বাসকে এবং আমাদের 'আমলকে হেফাযত করা যায় এবং এসব দল আমাদের জন্য যেসব সমস্যার সৃষ্টি করে কিভাবে এগুলোর মোকাবেলা করা যায়। বিভিন্ন সমস্যা আছে, একথা সত্য। কিন্তু তাই বলে উম্মাহ জিহাদকে ছেড়ে দিতে পারে না। কিছু মানুষকে অবশ্যই উঠে দাড়াতে হবে এবং কিছু মানুষ দাড়াবেই, যেমনটা হাদিসে বর্ণিত আছে। সাহীহ মুসলিমের এই হাদিসে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন –"আমার উম্মাহর একটি দল সর্বদা সত্যের উপর ক্বিতাল করতে থাকবে"।

এ কারণে এ বিষয়ে করণীয় উত্তম কাজ হল মানুষদের আহবান জানানো, জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর প্রতি তাদের অন্তরকে উন্মুক্ত করে দিতে। এবং এজন্য তিরস্কারকারীরা যে নামেই ডাকুক না কেন, যে অপবাদই দিক না কেন, তা উপেক্ষা করে সমাজ, রাষ্ট্র ও দুনিয়া থেকে অনিষ্ট ও কুফর অপসারণের জন্য ইস্তেকামাতের সাথে করে যাওয়া। আমাদের অবশ্যই সকল হারাম কে নির্মূল করতে হবে। আমরা কোন ভাবেই পৃথিবীতে কুফরকে প্রতিষ্ঠিত হতে দিতে পারি না।

আমি ভাই ইবন উমারকে ধন্যবাদ দিতে চাই, আমি তাকে যে টেপ গুলো দিয়েছিলাম সেগুলো থেকে গুছিয়ে বক্তব্য ট্রান্সক্রাইব করার জন্য। আমি তাকে ইজাযাহ দিচ্ছি এই টেপের বক্তব্যগুলো শেখাতে এবং সম্পাদনা ও পরিমার্জন করে প্রয়োজনীয় অন্য কোন কাজে ব্যবহারের জন্য। আল্লাহ্ যেন আমাদের তাঁর উত্তম যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আপনাদের ভাই

আবু হামযা
লিখিতঃ শীত **১৯৯৯**
চূড়ান্তকরনঃ বসন্ত ২০০০

ভূমিকা

এই নিবন্ধ উম্মাহর কিছু অসুস্থতাকে কুর'আন ও সুন্নাহতে উল্লিখিত ঔষধ দ্বারা সারিয়ে তোলার একটি প্রচেষ্টা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের জন্য কুর'আনের উপযোগীতার কথা বলেছেন যারা একে একটি পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

فَذَكِّر إِن نَفَعَتِ الذِّكرىٰ

"উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন।" (সূরা আল আ'লা, আয়াত ৯)

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সুস্পষ্ট মানদন্ড প্রদান করেছেন এবং আমাদের দেখিয়েছেন যে, কুর'আন আমাদের জন্য এক সতর্কতা স্বরূপ যা আমাদের উপকারের জন্যই নাযিল হয়েছে। যে একমাত্র উপায়ে এটি আমাদের জন্য উপকারী হতে পারে তা হল যদি আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের অন্তর্ভুক্ত হই যারা কুর'আনের শিক্ষা ও যিকরের মাধ্যমে কল্যান লাভ করেন। শুধুমাত্র আল্লাহর দয়ার মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি পরিপূর্ন ভাবে হিদায়াত প্রাপ্ত হতে পারেন, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُ

"এমনিভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে চালান।" (সূরা মুদাসসির, আয়াত ৩১)

কিন্তু কারা পথভ্রষ্ট আর কারা সঠিক পথে আছেন? আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী আয়াতেই এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন,

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلضَّلَٰلَةُۚ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَٰطِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحۡسَبُونَ أَنَّهُم مُّهۡتَدُونَ

"একদলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।" (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ৩০)

এই আয়াত থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া আল্লাহর এক বিরাট রহমত এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন আর যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। তবে এই হিদায়াতের কিছু শর্ত আছে। রাব্বুল আলামীন আল্লাহর নাযিলকৃত দ্বীন-ইসলামের উপর একবার হিদায়াত লাভের পর এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পূর্বশর্ত হল কুর'আন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহতে যা উল্লেখ করা আছে তার উপর অটল থাকা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব আল কুর'আনে উল্লেখ করেছেন,

كَلَّآ إِنَّہَا تَذۡكِرَةٌ (١١) فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ۥ (١٢) فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ (١٣) مَّرۡفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةِۭ (١٤) بِأَيۡدِى سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامِۭ بَرَرَةٍ (١٦) قُتِلَ ٱلۡإِنسَـٰنُ مَآ أَكۡفَرَهُ ۥ (١٧)

"কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশবানী। অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ করবে। এটা লিখিত আছে সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে, লিপিকারের হস্তে, যারা মহৎ, পূত চরিত্র। মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ!" (সূরা আবাসা, আয়াত ১১-১৭)

নিশ্চিতভাবেই এটা মানুষের কাছে স্পষ্ট যে ইসলামের মূল শিক্ষাকে বজায় রাখার জন্য কুর'আনের দিক-নির্দেশনা সর্বোচ্চভাবে গুরুত্বপুর্ন। ইসলামে সুন্নাহরও সমপরিমান গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا غَوَىٰ (٢) وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ (٣) إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡىٌ يُوحَىٰ (٤) عَلَّمَهُ ۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَىٰ (٥) ذُو مِرَّةٍ فَٱسۡتَوَىٰ (٦)

"তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। তাঁকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা, সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল।" (সূরা আন নাজম, আয়াত ২-৬)

জেনে রাখা প্রয়োজন, কুর'আন এবং সুন্নাহ উভয়ই সেই ওয়াহী যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর ইচ্ছায় জিবরীল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে লাভ করেছেন। উভয়ই হালাল বিষয়কে বৈধতা দান করার ও হারাম বিষয়কে নিষিদ্ধ করার মানদন্ড ধারণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বলেছেন যে সুন্নাহর কর্তৃত্বের অধিকার (authority) কুর'আনেরই সমপর্যায়ের; রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা আল্লাহর আনুগত্য করারই শামিল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবাধ্যতা আল্লাহরই অবাধ্যতা করার নামান্তর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের।" (সূরা আন নিসা, আয়াত ৫৯)

এই আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে সর্বপ্রথম আনুগত্যের দাবীদার তিনি, তারপরে উনার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার পর হল যারা আমাদের উপর কর্তৃত্ব করেন তাঁরা। আল্লাহর হিদায়াত প্রাপ্তদের জন্য কুর'আনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার ব্যাপারে আমরা ইতিমধ্যেই দীর্ঘ আলোচনা করেছি। এর পরে আমরা আলোচনা করব আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ প্রয়োগকরার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে এবং যারা আমাদের উপর কর্তৃত্বে আছে, কুর'আন ও সুন্নাহকে মানদন্ড ধরে, কুর'আন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে তাদের আনুগত্য করার ব্যাপারে। শেষের বিষয়টি এই নিবন্ধের আলোচ্য মূল বিষয়।

আজকের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হল মুসলিম ভূমিগুলোতে যারা আমাদের উপর শাসন করছে আমরা তাদের আনুগত্য করবো কিনা? তারা যদি ইসলামের আইনের বাইরে গিয়ে কোন কাজে লিপ্ত হয় তখন তাদের বাধা দেওয়া কি বৈধ বা জায়েজ হবে? এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে বর্তমান সময়ে বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। যারা বিশ্বাস করে যে তারা উম্মাহর

ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে, তারা বর্তমান শাসকদের কোন ধরণের অন্যায়কেই বাধা দেয় না। কারণ তাদের ধারণা যে এসব শাসকদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা হলে এতে ফিতনা তৈরি হবে যাতে ভালোর চেয়ে মন্দই বেশি হবে।

অন্যদিকে আরেকটি দল আছে, যারা যে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেয়ায় বিশ্বাস করেন, এবং মনে করেন এসব অবাধ্য নেতাদেরকে প্রতিহত ও উৎখাত করা এবং তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া, ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ করার অন্তর্ভুক্ত। কারণ এই শাসকদের দ্বারা উম্মাহর কল্যানের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। প্রথমে উল্লেখিত দলটি পরের দলটির ফিকরাকে (যে ধারণাকে কাজে পরিণত করা হয়) খারেজিদের পদ্ধতি মনে করে। কেননা প্রথম দলটির বিশ্বাস, পরের দলটি বৈধ মুসলিম শাসকদের অবাধ্যতা করছে এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে বিনষ্ট করছে। কিন্তু আসলেই কি বিষয়টি এরকম? বর্তমান যুগের সব শাসককে কি আমরা বৈধ মুসলিম শাসক বলে ধরে নিবো? তাদের বিরোধীতা যারা করছে তাদেরকে খারেজি গণ্য করবো? নাকি এই বিষয়টি অন্য কিছু দিক আছে যা আমরা বিবেচনা করিনি? আমরা আমাদের এই নিবন্ধে এ বিষয়েই অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করেছি এবং ইনশাআল্লাহ্ এটি পাঠকদের জন্য, তারা যেখানেই বসবাস করুন না কেন, হোক সেটা ইংল্যান্ড বা অন্য কোন দেশ উপকারী হবে। এই বিশ্লেষণের বিভিন্ন দিক আছে, এবং আমাদের এই নিবন্ধে সবগুলো দিকই বিবেচনা করা হবে। এর উপসংহার টানা হবে কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাব, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ, সাহাবাদের রাদ্বিয়াল্লাহু তা’আলা ওয়া আজ’মাইনের ইজমা এবং পূর্ববর্তী হাক্কানী উলেমাদের বিশ্লেষণ এবং ফাতাওয়ার ভিত্তিতে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলাই একমাত্র পথপ্রদর্শক এবং আমরা তাঁর কাছে দুয়া করি যেন তিনি আমাদের সকলকে সত্যের সন্ধানে এবং আখিরাতের পুরষ্কারের জন্য সঠিক পথ দেখান। আমিন।

অধ্যায় ১

খারেজিদের ইতিহাস

সাধারণ ইতিহাস

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে প্রতিটি বিদ্রোহী ও বিধ্বংসীদলের উৎপত্তি কোন একটি ঘটনা বা ফ্ল্যাশপয়েন্টে নিহিত, যা হতে পারে কোন একটি কাজ বা ঘটনা বা বিশ্বাস, যা এ ধরণের দলগুলোর কার্যক্রম ও মতাদর্শের জন্য ট্রিগার হিসেবে কাজ করে। কোন একটি ঘটনা যার ফলশ্রুতিতে এসব দলের অনুসারীদের এমন ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়, যা তাদেরকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বাইরে নিয়ে যায়। কিন্তু খারেজিদের এরূপ বিশ্বাস তৈরি হওয়ার পিছনে কারণ কী ছিল? এই বিপজ্জনক দলটির উৎপত্তি ইসলামের একদম প্রাথমিক সময়ে, এবং বস্তুত এরাই ইসলামের সর্বপ্রথম গোমরাহ দল বা বাতিল ফিরকা। উম্মাহর মধ্যে খারেজিদের আত্বপ্রকাশ ঘটে খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়। বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খারেজি এ বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "এরা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট। এইসব লোকেরা কুফফারের ব্যাপারে নাযিলকৃত কিছু আয়াত নিয়ে সেগুলো মুমিনীনদের প্রতি প্রয়োগ করে"।[1]

খারেজিরা বিরাট মারাত্মক অনাচার করে এবং তাদের ফিতনা ছিল সত্যিকার অর্থেই ব্যাপক ও মারাত্মক। তবে তারা বিদ'আতি দলগুলোর মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট নয়। তারা সর্বপ্রথম দল যারা এরূপ বিদ'আতের সূচনা করে। আরেকটি উদাহরণ হল যখন কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবিলের ব্যাপারে এই মন্তব্য করেন- "এমন কোন মানব সন্তানকে অন্যায্যভাবে (বৈধ কোন কারণ ছাড়া) হত্যা করা হয় না, যার

---

[1] সহীহ আল বুখারি, খন্ড ৯, পৃঃ ৫০

কিছুটা দায়ভার আদমের প্রথম সন্তান (ক্বাবিল), যে পৃথিবীতে হত্যার ধারা চালু করেছিলে, তার উপর বর্তায় না”।[1] যদিও ক্বাবিল হত্যা করার সুন্নাহ প্রচলন করে সেটা কিন্তু তাকে সর্বনিকৃষ্ট হত্যাকারীতে এ পরিণত করে না। কেননা মিসরের ফিরাউন তার চেয়েও অনেক বেশি হত্যাকান্ড সংঘটিত করেছিল। আরও উল্লেখ্য হল হামান ও ইহুদীরা, যারা কিনা তাদের নবীদের হত্যা করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের মাধ্যমে এই বিপজ্জনক দলটির পরিচয় খুব স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে-

“আবু সা’ঈদ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আলী ইবন আবূ তালীব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক পাঠানো কিছু স্বর্ণ বন্টন করছিলেন, একজন ব্যাক্তি তার ভাগ পাওয়ার পর কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করলন। আব্দুল্লাহ ইবন যুল খাওয়াইসারা আত-তামিমি নামের এই লোকটি সামনে এসে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, ইনসাফ করুন!” রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথাযথ ভাবেই তার উত্তরে বললেন, ‘ধ্বংস তোমারা জন্য! আমি ইনসাফ না করলে হলে আর কে ইনসাফ করবে?’ ‘উমার ইবন খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে তার শিরোশ্ছেদ করার অনুমতি দিন!” রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, কেননা তার কিছু অনুসারী বা সঙ্গী আছে। আর তোমরা যদি তাদের সালাহ ও সাওমের সাথে নিজেদের সালাহ ও সাওমের তুওলনা করে দেখো তাহলে নিজেদের সালাত ও সাওমকে তুচ্ছ মনে করবে। কিন্তু তারা এমনভাবে দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে যেভাবে তীর তার লক্ষ্যবস্তু পশুর শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। যখন তীরের এক দিক পরীক্ষা করা হয় তখন তাতে কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। যখন তীরের অন্যদিক পরীক্ষা করা হয়, তখন তাতে কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তীর এতোই দ্রুততার সাথে পশুর শরীর ভেদ করে বের হয়ে গেছে যে তাতে রক্ত বা গোবরের কোন দাগ পড়ে নি। এ লোকদের চিহ্ন হবে, তাদের মধ্যে একজন লোক থাকবে যার এক হাত হবে স্ত্রীলোকের ছোট স্তনের ন্যায়। যখনই লোকেদের মাঝে কোন মতবিরোধ দেখা দেয় তখনই এরা আত্মপ্রকাশ করবে।”

---

[১] সহীহ আল বুখারী, খন্ড ৯, হাদিস ৬

আবু সা'ঈদ রাদ্বিয়াllাহু আনহু আরও উল্লেখ করেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্যের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এদের হত্যা করছেন এবং এসময় আমি তাঁর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন বর্ণনা করছেন তেমন এক ব্যাক্তিকে আলীর কাছে আনা হয়ছিল এবং কুর'আনের এক আয়াত নাযিল হয়েছিল ওই বিশেষ ব্যক্তির (অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন যুল খাওয়াইসারা আত-তামিমি) ব্যাপারে।[1]

এই আয়াতটি হলঃ

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى ٱلصَّدَقَـٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا۟ مِنْهَا رَضُوا۟ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا۟ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

"তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সদকা বন্টনে আপনাকে দোষারূপ করে। এর থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়।" (সুরা আত তাওবাহ, আয়াত ৫৮)

একই ব্যাক্তির (অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন যুল খাওয়াইসারা আত-তামিমি) ব্যাপারে আরেকটি হাদিসে বলে হয়েছে, "আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়ায়ল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়ায়ল্লাহু আনহু যখন ইয়েমেনে ছিলেন তখন তিনি কিছু স্বর্ণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পাঠান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ স্বর্ণ বানু মুজাসির আল-আক্বরা বিন হাবিস আল হানযালি, বানু কিলাবের উয়াইনা বিন বাদর আল-ফাযারি, আল-ক্বামা বিন উলাহা আল-আমিরি এবং বানু নাবহান গোত্রের যাইদ আল খালিক আল-তা'ই-এর মাঝে বন্টন করে দেন। তখন কুরাইশ এবং আনসারবৃন্দ এতে অসন্তুষ্ট হয় এবং বলে, "তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাজদের গোত্রপতিদের দিলেন আর আমাদের দিলেন না!" রাসূলুল্লাহ তখন তাদের বললেন "আমি (এর মাধ্যমে) তাদের অন্তরসমূহকে (ইসলামের প্রতি) আকৃষ্ট করতে এবং আবদ্ধ করতে চেয়েছি মাত্র।"

---

[1] সহীহ আল বুখারী, খন্ড ৯, হাদীস ৬৭

এসময় কোটরে বসা চোখ, বেরিয়ে আসা কপাল, ঘন দাড়ি, মোটা এবং উচু গালের হা বিশিষ্ট এবং মাথা কামানো এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, "হে মুহাম্মাদ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর!" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি যদি আল্লাহ-র অবাধ্যতা করি তাহলে কে আল্লাহর বাধ্যতা করবে? তিনি দুনিয়ার মানুষদের ব্যাপারে আমাকে বিশ্বাস করেছেন, আর তুমি আমাকে বিশ্বাস করছো না?" তখন উপস্থিত লোকেরদের মধ্যে একজন, আমার মনে হয় তিনি ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ, এই ব্যক্তিকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বারণ করলেন। যখন লোকটি চলে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই লোকের বংশধর থেকে এমন কিছু লোক আসবে যারা কুর'আন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু কুর'আন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে যাবে না, আর তারা ইসলাম থেকে এমন ভাবে বের হয়ে যাবে, যেভবে তীর তার লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে বের হয়ে যায়। তারা মুসলিমদের হত্যা করবে আর মুশরিকদের ছেড়ে দিবে। যখন তাদের আবির্ভাব ঘটবে তখন যদি আমি উপস্থিত থাকি তবে আমি তাদের সেভাবে হত্যা করবো যেভাবে 'আদ জাতিকে হত্যা করা হয়েছিল।"[1]

আরও একটি হাদিস থেকে আমরা এই অশুভদল সম্পর্কে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারি। আবু সাইদ আল খুদরি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেনঃ আলী ইবন আবু তালিব চামড়ায় পেঁচিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে একখন্ড সোনা পাঠিয়েছিলেন, যা তখনো খনিজ আকরিক থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয় নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারজন ব্যক্তির মাঝে এই স্বর্ণখন্ডটি ভাগ করে দেনঃ উয়াইনা বিন বাদর, আক্বরা বিন হাবিস, যাইদ আল খালিল এবং চতুর্থ জন ছিল হয় 'আলক্বামা অথবা 'আমির বিন আত-তুফাইল। তখন একজন সাহাবা বললেন, "এই ব্যক্তিদের তুলনায় আমরা এই স্বর্ণ পাবার অধিক যোগ্য"। যখন এই খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পৌছালো তখন তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[1] সহীহ বুখারি, খন্ড ৯, হাদিস নং ৫২৭

বললেন, "তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করো না? যখন যিনি আসমানে আছেন আমি তাঁর বিশ্বস্ত, আর আসমান থেকে দিনরাত আমার কাছে ওয়াহী আসছে?"

এসময় কোটরে বসা চোখ, বেরিয়ে আসা কপাল, ঘন দাড়ি, মোটা এবং উচু গালের হাড়বিশিষ্ট, মাথা কামানো এক ব্যক্তি এবং গোজা ইজারের একজন ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, "হে মুহাম্মাদ, আল্লাহ্‌কে ভয় করুন!" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "পৃথিবীর বুকে সব মানুষের মাঝে আমিই কি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করা ব্যক্তি নই?" তখন লোকটি চলে গেল। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে আদেশ দিন, আমি এই ব্যাক্তির গর্দান উড়িয়ে দেই!" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, "না, হয়তো সে সালাত আদায় করে।" খালিদ তখন বললেন, "এমন অনেকেই আছে যারা সালাত আদায় করে এবং মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, "আমাকে মানুষের অন্তরের খোজ নেবার, আর মানুষের বুক চিরে দেখার আদেশ করা হয় নি। "তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটির দিকে তাকালেন, লোকটি তখন চলে যাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এই লোকের বংশধরদের থেকে এমন কিছু লোক আসবে যারা ক্রমাগত, খুব সুন্দরভাবে কুর'আন তিলাওয়াত করতে থাকবে। কিন্তু কুর'আন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে যাবে না। তারা এই দ্বীন থেকে সেভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে তীর তার লক্ষ্যবস্তু শিকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। "আমার মনে হয় তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এও বলেছিলেন, "যদি তাদের আবির্ভাবের সময় আমি উপস্থিত থাকি, তবে আমি তাদের সেভাবে হত্যা করবো যেভাবে সামুদ জাতিকে হত্যা করা হয়েছিল"।[1]

আবূ হুরাইরা বর্ণনা করেন যে, "আমি আল্লাহর বিশ্বস্ত ও সত্যবাদীকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি যে ' আমার উম্মাহর ধ্বংস হবে কুরাইশের কিছু

[1] সাহীহ আল বুখারি, খন্ড ৫, হাদিস নং ৬৩৭

যুবকদের হাতে”।[1] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শুরু থেকেই এই দল এত বেশি অবাধ্য ছিল যে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পর্যন্ত মান্য করতো না। উসাইর বিন আমীর বর্ণিত আরেকটি হাদিসে বর্ণিত যে তিনি সাহল বিন হুনাইফকে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খারেজিদের ব্যাপারে কোন কিছু বলতে শুনেছেন?” তিনি উত্তর দিলেন, “আমি তাঁকে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরাকের দিকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বলতে শুনেছি, “এই জায়গায় (ইরাকে) এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুর’আন পড়বে কিন্তু কুর’আন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে যাবে না। আর তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেভাবে তীর তার লক্ষ্যবস্তুর শরীর ভেদ করে বেরিয়ে যায়।”[2] এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরাকের দিকে নির্দেশ করেছিলেন যা কিনা পরবর্তী এই হাদিস বোঝার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবে-

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “হে আল্লাহ্, আমাদের শামে বরকত দান করুন! হে আল্লাহ্, আমাদের ইয়েমেনে ব্বরকত দান করুন”। তখন উপস্থিত লোকেরা বললো, “আর আমাদের নাজদেও?” আমার মনে হয় যখন তৃতীয়বারের মতো তারা এই কথা বললো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ”এটা (নাজদ) হল ভূমিকম্প আর বিপর্যয়ের জায়গা, আর এখান থেকে শয়তানের শিং বের হবে।”[3]

ইবন হাজার আল ‘আসকালানী আল খাতিবী নামের এক সাহাবীর কথা উল্লেখ করেন যিনি এই হাদীসের ব্যাপারে বলেন-

---

[1] সহীহ আল বুখারি, খন্ড ৯, হাদিস নং ১৮০

[2] সহীহ আল বুখারি, খন্ড ৯, হাদিস নং ৬৮

[3] সহীহ আল বুখারি, খন্ড ৯, হাদিস নং ২১২-২১৪

"নাজদ হল পশ্চিম দিকে, আর সেটা হল ইরাকের প্রান্তরের, উচ্চভূমি আর শহরগুলো। এটা হল মাদীনা থেকে পূর্ব দিকে, আর নাজদ শব্দের মূল শব্দের অর্থ হল, 'যা ভূমি থেকে উত্থিত হয়েছে'। এছাড়া আদ-দাউদিও বলেছেন, "নাজদ হল ইরাক"।"[1]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনটি বলেছিলেন- ইরাক অঞ্চলের লোকদের ফিতনা করার ও বিবাদ সৃষ্টিকারী দল গঠনের এক ইতিহাস আছে। তারা এই ব্যাপারে এতই কুখ্যাত যে 'আমর ইবন আল 'আস তাদের ব্যাপারে বলেন,

"(এরা হল) অনৈক্য আর নিফাক্বের লোক।"

ইরাকেই খারেজিরা তাদের ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট বিশ্বাসগুলো প্রচার ও প্রসারের জন্য এক উর্বর ভূমির সন্ধান পায়। তারা উম্মাহর নিরাপত্তা ও কল্যানের বিপক্ষে যে বিপদ ডেকে আনে তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক হাদিসেই এই ব্যাপারে আমাদেরকে আদেশ করেছেন।

"নিশ্চয় এই লোকের বংশধরদের থেকে এমন এক দল লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা আল্লাহ-র কিতাবের প্রচুর তিলাওয়াত করবে। কিন্তু কুর'আন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে প্রবেশ করবে না। আর তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেভাবে তীর তার লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে বেরিয়ে যায়। যদি আমার সুযোগ হয়, আমি তাদের কওমে সামূদের মতো হত্যা করবো।"

"আমি কি তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট দুই ব্যক্তির ব্যাপারে বলবো না? (একজন হল) সামূদ জাতির আহমির, যে উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল, আর যে তোমাকে আঘাত করবে হে আলি, এখানে (মাথায়), আর এটা (দাড়ি) গড়িয়ে রক্ত পড়বে।"

"একসময় কিছু নির্বোধ এবং বোকা যুবকের আবির্ভাব ঘটবে। তারা সর্বোত্তম কথা বলবে। তারা কুর'আন পড়বে কিন্তু সেটা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে যাবে না। তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে, ঠিক যেভাবে তীর তার লক্ষ্যবস্তু থেকে বেরিয়ে যায়। যখন তোমারা তাদের ব্যাপারে

---

[1] ফাতহুল বারি, খন্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৫১

প্রমাণ পাবে, তাদের হত্যা করবে। যদি তোমরা তাদের হত্যা কর, তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পুনরুত্থানের দিন তোমরা পুরস্কার পাবে।”

“লোকেরা কুর'আন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু সেটা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে যাবে না। তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে, ঠিক যেভাবে তীর তার লক্ষ্যবস্তু থেকে বেরিয়ে যায়।”

“আমার পর আমার উম্মাহ থেকে এমন কিছু লোক আসবে যারা কুর'আন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু সেটা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে যাবে না। তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে, ঠিক যেভাবে তীর তার লক্ষ্যবস্তু থেকে বেরিয়ে যায়। আর তারপর তারা আর তাতে (দ্বীনে) ফেরত আসবে না। তারা হল সৃষ্টি এবং সৃষ্ট জীবসমূহের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট।”

“আমার উম্মাহ থেকে একসময় এমন এক দল লোক আসবে যারা তোমাদেরকে এমন কথা বলবে, যা তোমরা এবং তোমাদের পিতারা আগে শুনোনি, সুতরাং তাদের ব্যাপারে হুশিয়ার, তাদের ব্যাপারে হুশিয়ার থাকবে!”

“আমার উম্মাহ-র মধ্যে মতপার্থক্য ও বিভেদ দেখা দিবে। একদল লোক কথা বলবে সুন্দর কিন্তু তারা গুনাহ-র কাজ করবে। তারা কুর'আন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু সেটা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে যাবে না। তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে, ঠিক যেভাবে তীর তার লক্ষ্যবস্তু থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর তারা আর তাতে (দ্বীনে) ফেরত আসবে না, যতোক্ষণ না তাদের একদল রিদ্দা করবে। তারা হল সৃষ্টি এবং সৃষ্ট জীবসমূহের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট। বরকত এবং অভিনন্দন তাদের প্রতি যারা এদের হাতে নিহত হবে এবং যারা এদেরকে হত্যা করবে”।[1]

মূলত খারেজিদের কার্যক্রমের শুরু হয় উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফাতকাল থেকে। আবদুল্লাহ ইবন সাবাহ নামে এক লোকের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়।[2] এই কার্যক্রম শুরু করার পিছনে ইবন সাবাহর মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের ভিতরে প্রবেশ করে, ভিতর থেকেই

---

[1] সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, সাহীহ বুখারি আর আন-নাওয়ায়ীর শার'হ থেকে গৃহীত।

[2] এই লোক ইমামী শি'আ/ইসনে আশারী শি'আদেরও পত্তন করেছিল। এদের (১২ ইমাম শিয়া) সম্পর্কে আরো জানতে শাইখের “The Shia” নামের টেপটি শুনতে পারেন।

ইসলামের ধ্বংস সাধন করা। এর জন্য সে যা যা করা সম্ভব তার সবই করছিল। কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল ইসলামিক বিশ্বের শহরাঞ্চল গুলোতে নিজের সমর্থন বাড়ানো। তবে এতে সে সামান্যই সাফল্য লাভ করে। যখন সে বসরায় গেল তখন তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। বাগদাদেও একই ঘটনা ঘটল।

পরবর্তীতে মিসরে এসে তার উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করল। সেখানে সে বিপ্লবী মনোভাব ও বিশ্বাসের লোক খুঁজে পেল এবং তার নিজের সমর্থকদের সাহায্যে সে মিসরের এসব লোকদেরকে উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনের বিরুদ্ধে ও তাঁর কিছু আত্মীয়ের বিরুদ্ধে, যারা সিরিয়া ও অন্যান্য স্থানে গভর্ণর হিসেবে ছিলেন, তাদের কথিত শোষণের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে সক্ষম হল। তার মূল প্রনোদনা ছিল আহলুল বাইতের (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটতম আত্মীয়গণ) সদস্যদের সাথে কথা বলে তাঁদেরকে উসমান ইবন আফফানের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত করা। কিন্তু দেখা গেল যে, যে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বাগাড়ম্বর চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছিল তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের এক দলকে প্রভাবিত করল ও উস্কে দিল। এই দলের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ ও সৎ ইবাদাতকারীই ছিল বটে তবে তাদের মাথার মধ্যে নানা বিপ্লবী চিন্তাভাবনা ও মতবাদ ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। তারা বিভিন্ন শাসকদের শাসনের মধ্যে ভুল খুঁজে পেতে শুরু করল এবং ফল স্বরূপ তারা উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণ করে। বানোয়াট কাগজপত্র তৈরির মাধ্যমে উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র হল এবং অসংখ্য ব্যক্তি এই হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়ল। অতঃপর এই হীন হত্যাকান্ড সংঘটিত হল। এমনকি আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর পুত্র মুহাম্মাদ ইবন আবু বকর ও এই ঘৃন্য দৃশ্যপটে জড়িত হয়ে পড়লেন।

এমনকি আ'য়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা যিনি উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন, তিনিও অনিচ্ছাসত্ত্বে ও অসতর্কতাবশত এই বিভেদপূর্ণ পরিস্থিতিতে জড়িত হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীতে আলী ইবন আবু তালীবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন, যা 'উটের যুদ্ধ বা জামালের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের কারণ ছিল কিছু সাহাবা উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর বদলা নিতে চাচ্ছিলেন আর কিছু সাহাবা বলছিলেন যে ইসলামী

রাষ্ট্রকে আগে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে তারপর তাঁর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষ মিলিয়ে ৫,০০০ সাহাবা মৃত্যুবরণ করেন। এই যুদ্ধে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার বিপক্ষে জয়লাভ করেন এবং এই দুর্যোগপূর্ণ ঘটনার পর 'আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে মদীনায় তাঁর পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। এই ঘটনা সহ আরও অনেক বিশৃংখলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মাহর মধ্যে সংঘটিত হতে থাকে যা কিনা আবদুল্লাহ 'ইবন সাবাহ খুব বিচক্ষণতার সাথে সংঘটিত করেছিল। তার উদ্দেশ্যই ছিল উম্মাহ মধ্যে স্থিতিশীলতা নষ্ট করা এবং বিশ্বাসীদের অন্তরে দ্বিধা তৈরি করা।

এই ঘটনার পরে আরও এক ঝাঁক নতুন সমস্যার উদ্ভব হল, যার ফলশ্রুতিতে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুয়াআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মৃত্যুর পরে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সকল আত্মীয়দেরকে সকল ধরণের শাসনভার থেকে সরিয়ে দেন, কেননা তাঁদের বিরুদ্ধে লোকেদের পক্ষ থেকে কঠোরতার অভিযোগ উঠছিল। 'ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সহ অন্যান্য অনেক সাহাবাদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন।[1] কিন্তু মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে অস্বীকার করেন এবং আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ ও কঠোর প্রতিপক্ষে পরিণত হন। তাঁর এরূপ ব্যবহারের কারণ হল উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাঁর একজন আত্মীয় এবং এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র স্ত্রীও আহত হয়েছিলেন। উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যাকারীদের আঘাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর একটি আঙ্গুল কেটে যায়। এই ঘটনার পর উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর স্ত্রী এই কাটা আঙ্গুল ও উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র রক্তাক্ত কাপড় নিয়ে সিরিয়া পালিয়ে যান।

---

[1] আরেকটি প্রায়োগিক বিষয় যা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বিরুদ্ধে গিয়েছিলো আর তা হল খিলাফতের কেন্দ্র মদীনা থেকে ইরাকে সরিয়ে নেওয়া। এর ফলে এতে মুনাফিক ও অজ্ঞ লোকেদের অনুপ্রবেশ অনুপ্রবেশ ঘটে এবং মদীনাতেও একটি শুণ্যতার সৃষ্টি হয়।

এই ঘটনা দেখে মুয়ায়বিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর আত্মীয়ের হত্যাকান্ডের বিচারের দাবি জানান। আলি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর তিক্ততার আরেকটি কারণ ছিল যে তিনি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছিলেন – "কেন আপনি আমার কাছ থেকে বাই'য়াহ চান আর কেনই বা আপনার সেনাবাহিনীতে উসমানের হত্যাকারীরা রয়েছে? আপনি তো এখনো উসমানের হত্যার বদলা নেননি। উসমানের হত্যার বদলা নিন, আর তাহলেই কেবল আমি আপনাকে বাই'য়াহ দেবো, নয়ত কোন ভাবেই আমি আপনাকে বাই'য়াহ দেবো না" আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সেনাবাহিনীতে কিছু খারেজি ছিল যারা তাঁকে বলল- "আল্লাহর ফয়সালা দ্বারা ফয়সালা করুন, নয়ত আমরা উসমানের সাথে যা করেছি আপনার সাথে ঠিক তাই করব।" একথা শুনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেনাবাহিনী গঠন করে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হন, কেননা মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বাই'য়াহ (আনুগত্যের অঙ্গীকার - যা বৈধশাসক (হাকিম) যাদের উপর শাসন করবেন (মাহকুম) তারা ঐ শাসককে প্রদান করে) দিতে অস্বীকার করেছিলেন। যখন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী গঠন করতে শুরু করলেন তখন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বাহিনীর কিছু অংশ ও সমর্থক আলীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিরুদ্ধে রাগান্বিত হল, এই কারণে যে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে সীমালঙ্ঘনাকারী বিবেচনা করে তাঁদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। কেন তিনি এই পদক্ষেপ নেননি এই বিষয়ে তারা নিজেদের মধ্যে চিন্তা করতে লাগল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে সালাহর জামা'আতে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে অভিশাপ দিতে বা গালমন্দ করতে শুরু করলেন এবং অন্যান্যদেরকেও একই কাজ করতে বললেন। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এহেন কোন কাজ করলেন না এবং তাঁর অবস্থান সঠিক থাকা সত্ত্বেও তিনি এমন কোন কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু চাইলেই মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে অভিসম্পাত করতে পারতেন কিন্তু তিনি এ থেকে বিরত থাকেন। এই ঘটনায় আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বাহিনী এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করে "যদি বিপক্ষ দল আমাদের অভিসম্পাত করে ও আমাদের বিরুদ্ধে কটূক্তি করে তাহলে তারা কিরূপ?" খলীফা (ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক) উত্তর দিলেন যে, " তাঁরা আমাদের

ভাই এবং তাঁরা ভুল করছে (বাগী)।” আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে একটি বার্তা পাঠান যে তিনি যেন আল্লাহর সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে তাওবা করেন এবং তাঁকে বাই'য়াহ দেন। কিন্তু তিনি ও তাঁর দল তা করতে অস্বীকার করেন। মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বাহিনীতে ছিলেন ‘আমর ইবন আল'আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বিরোধীতা করার প্রাথমিক পর্যায়ে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সিরীয়ান বাহিনী প্রবলভাবে নাস্তানবুদ হচ্ছিল। ‘আমর ইবন আল'আস একটি চাতুর্য কৌশলী পরিকল্পনা নিয়ে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কাছে আসলেন। তিনি বললেন, “আমি কি তোমাকে একটি পরামর্শ দেবো যাতে বিপক্ষ দলে সর্বোচ্চ বিভেদ সৃষ্টি হয়?” মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, “কি সেটা?” ইবন আল ‘আস (রা) বললেন, “ আপনি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরাজিতই হবেন, সুতরাং আপনি বর্শার আগায় কুর'আনকে রেখে বলবেন ‘কেন আমরা কুর'আনের বিচারের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে বিভেদের ফয়সালা করছিনা? কেন আমরা একে অপরকে হত্যা করছি? এই যে আল্লাহর কিতাব, কেন আমরা এর মাধ্যমে নিজেদের বিচার করছিনা?”

এই পরামর্শ অনুযায়ীই তারা কাজ করলেন। যখন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সেনাবাহিনী প্রতিপক্ষকে বর্শার উপরে কুর'আনকে তুলে ধরতে দেখল তখন তারা বলতে শুরু করল, “দেখো, তারা কুর'আন উপরে তুলে ধরেছে। কেন আমরা একে অপরকে হত্যা করব যখন কিনা আমরা কুর'আনে মাধ্যমে নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ফয়সালা করতে পারি? কেন আমরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করব?” আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তখন উত্তর দিলেন যে, “তোমাদের কি ধারণা? কেন আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি? কুর'আনকে আমাদের মাঝে ফয়সালাকারী হিসেবে নেওয়ার জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি উদগ্রীব। আমরাই তাদেরকে প্রথমে কুর'আনের মাধ্যমে ফয়সালা করার জন্য আহবান করেছিলাম। এখন যখন তারা লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছে তখন তারা কুর'আনকে ব্যবহার করতে চাচ্ছে, যাতে করে তারা হয়ত পুনঃসংগঠিত হতে ও শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তোমরা এগিয়ে যাও, সর্বশেষ বারের মত এই ফিতনা আমরা সমাপ্ত করব।”

কিন্তু আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর অবাধ্য বাহিনী অনড় ছিল এবং তাদের একটাই দাবী ছিল- যেন যুদ্ধ বন্ধ করা হয়। তারা সিদ্ধান্ত নিল শাসক আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের কথা অনুযায়ীই চলতে হবে। এভাবেই সর্বপ্রথম এই কথার উৎপত্তি হল- 'তুমি যদি আমাদের কথা অনুযায়ী না চল, আমরা যা বলি তা না কর তাহলে তুমি কাফির।' যুদ্ধের উত্তাপ ও উত্তেজনার মধ্যেই এইসব মতবাদ গড়ে উঠতে শুরু করল। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জানতেন না যে তাঁর সেনাদের মধ্যে যারা মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করছিল তাদের মধ্যে উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যাকারীরাও ছিল। এদের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না- প্রায় ২০,০০০ এর কাছাকাছি। যতবারই আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যার বিচার করতে চাইতেন ততবারই ১০,০০০ লোক বেরিয়ে এসে বলত 'আমরা সবাই তাকে হত্যা করেছি, আমরা সবাই তাকে হত্যা করেছি।'' এইসব ফিতনার কারণে এবং আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বাহিনী কর্তৃক যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য চাপ দেওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ হল এবং মধ্যস্ততার প্রক্রিয়া শুরু হল।

যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার ফলে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও 'আমর ইবন আল 'আস অত্যন্ত খুশি হলেন কেননা এই সুযোগে তারা পুনঃসংগঠিত হবার সুযোগ পেলেন। তাদের পরিকল্পনা সুচারুভাবে কাজে লাগল। তাদের দলের সংহতি বেশি ছিল, তবে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বাহিনী সামরিক দিক দিয়ে তাদের বাহিনীর চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল। একটা আনুষ্ঠানিক চুক্তি তৈরি করা হল যার শর্তসমূহ পালন করা হবে। এতে নির্ধারিত হল কিভাবে উভয়পক্ষ একে অপরের বিষয়ে ফয়সালা করবে। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র পক্ষ থেকে একজন ও মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বাহিনীর পক্ষ থেকে একজন –এই দুই জন মিলে চুক্তিটি প্রস্তুত করার কথা ছিল। সামরিক কৌশলে পারদর্শিতার কারণে ও আলীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিপক্ষে আসন্ন পরাজয় রহিত করতে পারার কারণে 'আমর ইবন আল 'আসকে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর পক্ষে মনোনীত করা হল।

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পক্ষ থেকে মধ্যস্ততাকারী হিসেবে ইবন 'আব্বাসকে পাঠাতে চাচ্ছিলেন কেননা তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কুর'আনের ব্যাপারে তাঁর ছিল গভীর জ্ঞান। কিন্তু আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু 'র বাহিনীর মধ্যে অনৈক্যের কারণে এই ব্যাপারে একটা

বিবাদ সৃষ্টি হল। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলা হল যে 'ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠানো আর তাঁর নিজের যাওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই,[1] এবং তাঁর উচিত অন্য কাউকে পাঠানো কেননা 'আমর ইবন আল 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত কৌশলী এবং তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে সক্ষম। তাদের দাবী ছিল যে আবূ মূসা আল আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে পাঠানো হোক, কেননা তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ এবং প্রথম দিককার একজন সাহাবী।

যদিও তাদের মধ্যেই অনেকে এর বিরুদ্ধে মত দিচ্ছিলো কেননা তাদের ধারণা ছিল যে আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রতারিত হতে পারেন, তবুও তারা এই মতের উপরেই অটল থাকল। আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মধ্যস্ততাকারীর ভূমিকা পালন করতে রাজী হলেন। কিন্তু কিছু লোক, যারা শয়তানের ওয়াসওয়াসায় কান দেয়, তাদেরকে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিতে শুরু করল। ফলে নতুন এক সমস্যার উদ্ভব হল। উভয় পক্ষেরই কিছু খারেজি চিন্তা করতে শুরু করল- "যেহেতু যুদ্ধ এখন থেমে গেছে তাই এখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিচার অনুযায়ী ফয়সালায় ফেরত যাওয়া যাবে। তাহলে কেন আমরা এখন আল্লাহ-র বিচার না মেনে, এই দুই ব্যাক্তির ফয়সালা মানবো?"[2]

মধ্যস্ততা চলাকালীন সময়েই মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বাহিনী একটা শর্ত দিয়েছিল যে এক মাসের মধ্যে এই ফয়সালা শেষ করতে হবে এবং যখন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হবে

---

[1] ঘটনার এই পর্যায় থেকে আমরা ২টা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা পেতে পারি,

1. কিভাবে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মত একজন ভাল ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা অবাধ্য সৈনিকদের কারণে একটা যুদ্ধে পরাজিত হতে পারেন;
2. খারেজিরা কতটা বিশৃংখল আর অভদ্র, তার উপর কিভাবে তারা রাহাজানি করার মাধ্যমে তাদের মত অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয়।

[2] এই সময় তারা পরিপূর্নভাবেই শয়তানের কব্জায় চলে গিয়েছিলো! যখন তারা এই ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল তখন তারা ভাবতে লাগল যে এই মীমাংসা আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে হচ্ছে না বরং মানুষের মাধ্যমে হচ্ছে। এটাই অজ্ঞদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এরা যখন কুর'আনের একটা আয়াত পড়ে তখন এর পূর্ণতা তারা অনুধাবন করতে পারে না, বরঞ্চ তারা এতে নিজেদের বিবেচনা প্রয়োগ করার চেষ্টা করে।

তখন উভয় পক্ষই সে সিদ্ধান্তসমূহ ঘোষণা করবে। যখন মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র দূত এসে তাঁর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম দেওয়া শর্তগুলো পড়ছিল তখন খারেজিরা তার উটকে হত্যা করে। তারা তাকে বললঃ "আমরা আপনাকে বলেছি যে কুর'আনের মাধ্যমে ফয়সালা করতে, আমাদের বা আপনাদের মত মানুষের মাধ্যমে না"। আলী রাদ্বিয়ায়ল্লাহু আনহু বললেন যে "সবাই মিলেই এ সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে এবং এটাই অনুসরণ করা উচিৎ"।

খারেজিরা পুনরায় দলত্যাগ করতে চাইল ও যুদ্ধ শুরু করতে চাইল। কিন্তু আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদের জানালেন যে সেই সুযোগ আর নেই, কেননা মধ্যস্ততার শর্তগুলো পড়া হয়েছে এবং তাতে সায় দেওয়া হয়েছে। সিফফিন থেকে কুফা যাবার সময় পুরো রাস্তাটুকু এই লোকগুলো একে অপরকে গালাগালি করতে থাকে এবং একে অপরের প্রতি থুথু নিক্ষেপ করতে থাকে ইত্যাদি। এরা ক্রমাগত একে অপরের সাথে অসম্মতি জ্ঞাপন করে ও কটূক্তি করে। এক দল বলতে থাকে "মানুষের বুদ্ধি অনুযায়ী ফয়সালা করে তোমরা কুর'আনের বিরুদ্ধে গিয়েছো এবং এতে তোমরা গুনাহ করেছো"। আরেকদল উত্তর দেয় যে, "তোমরা আমাদের ইমামের বিপক্ষে গিয়েছো অথচ তোমরা ইমামের প্রতি আনুগত্যের শপথ করেছিলে। তোমরা ইমামের অবাধ্য হয়েছো"।

তারা কুফায় পৌঁছানর পূর্বেই উভয়পক্ষের মধ্যস্ততাকারী আবূ মূসা আল আশ'আরি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও 'আমর ইবন আল 'আসের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মধ্যে মধ্যস্থতা শুরু হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু খারেজিরা এসব কিছুই শুনছিলো না। তারা মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর উপর তাকফির[1] করতে শুরু করল এবং আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকেও আহবান করলো মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর উপর তাকফির করতে। এরা শহরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করল এবং শহরের বাইরে ক্যাম্প করল। তারা মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনল যে তিনি আল্লাহর আইন অনুসারে বিচার করতে অস্বীকার করছেন এবং এজন্য তারা

---

[1] কবীরা শিরক বা কবীরা কুফর করার কারণে কাউকে প্রকাশ্যে কাফির হিসেবে ঘোষনা দেওয়া। কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে তাদের দাবীর ব্যাপারে খারেজিরা কোন সঠিক প্রমাণ দিতে সক্ষম নয় এবং তারা ইসলামের মূলনীতিকে বিকৃত করেছে।

তাঁকেও কাফির হিসেবে ঘোষনা করল। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেখানে পৌঁছানোর পর বললেন যে তিনি তাদের (খারেজিদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না কিংবা তাদেরকে মসজিদে প্রবেশে বাধা দেবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলিমদের রক্তপাত না করে। কিন্তু সঙ্কট চলতেই থাকল। যখনই আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে খুতবা দিতেন তখনই খারেজিরা একটা বিরাট হইচই বাধাতো এবং চিৎকার করে বলতঃ "বিচারের মালিক কেবলমাত্র আল্লাহ্!" (সূরা আন'আম, আয়াত ৬৭)

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আয়াতটি সত্য কিন্তু তোমরা একে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করছো। আল্লাহর কিতাবের পক্ষে নিজে নিজে বিচার করা সম্ভব নয়। মানুষই এই কিতাব ব্যবহার করে বিচার করবে।" পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করলে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে জানার জন্য তাদের কাছে ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠালেন।

ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে তারা কথা বলা শুরুই করল এই বাক্য দিয়ে- আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজেই তো একজন বিশ্বাসী নন। তারা বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে শুরু করল, যেমন আ'য়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর বিরুদ্ধে উটের যুদ্ধে তারা যুদ্ধবন্দিসহ কোন গনীমত পেল না কেন। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেই সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন যে- "তোমাদের মধ্যে কে উম্মাহাতুল মু'মীনীনদের যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক?[1] গনীমত বিলিয়ে দেওয়া হয়নি কেননা যাদের সাথে যুদ্ধ হচ্ছিল তারা কাফির ছিলেন না, বরঞ্চ গুনাহগার মুসলিম ছিলেন। শুধুমাত্র কাফির (অবিশ্বাসী) ও

---

[1] এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা এতে দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে খারেজিদের বুঝের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। যখন কোন মতানৈক্যের কারণে মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ হয় তখন তাঁরা একে অপরকে যুদ্ধবন্দী বা দাস হিসেবে বন্দী করে না, কেননা এটা নিষিদ্ধ। তাঁদের এমন যুদ্ধ থেকে নারীদেরকেও বন্দী হিসেবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ কারণ তাঁরা মুসলিম নারী। শুধুমাত্র মুশরিক নারীদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রহন করা ও তাঁদের সাথে সহবাস করার অনুমতি আছে। কিন্তু 'আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুএর সাথে এরূপ করা একটা বিরাট কুফরী হবে কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীরা উম্মুল মুমীনীন, বিশ্বাসীদের মা। সুতরাং কে তার নিজের মায়ের সাথে সহবাস করবে?

মুশরিকদের (মূর্তিপূজারী) দের কাছ থেকেই যুদ্ধে গনীমত নেওয়া জায়েজ করা হয়েছে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই কাজ করা কবীরা গুনাহ”।

তাদের পরবর্তী সমস্যা ছিলো যে তারা বিশ্বাস করত যুদ্ধে উভয় দলই ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছে কেননা উভয়ই –“বিচারের মালিক কেবলমাত্র আল্লাহ্’- এই আয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তাদের যুক্তি ছিল যে যদি বিচার একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই করা সম্ভব হয় তাহলে কেন মানুষের কাছে ফয়সালা চাওয়া হল? তারা তাদের বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করে একে গুরুতর কুফর হিসেবে ধরে নেয় এবং এতে তাদের কোন সন্দেহ ছিল না। তবে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উভয়ই এই ধরণের যুক্তির ভুলগুলো ধরতে পারলেন। সাবধানতার সাথে বিবেচনা করে দেখা যায় যে তাদের এই যুক্তি কোনভাবেই কুর’আনের সেইসব প্রমানের সামনে দাঁড়াতে পারবে না যেখানে মানুষের বিবেচনা ব্যবহার করতে আহবান জানানো হয়েছে।

আল্লাহ্ সুবহানা ওয়া তা’য়ালা বলেন,

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا

“যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩৫)

আল্লাহ্ তা’আলা আরও বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ

كَفَّـٰرَةٌ طَعَامُ مَسَـٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ

"তোমাদের মধ্যে যে জেনে শুনে শিকার বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে- বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসেবে কাবায় পৌছাতে হবে। অথবা তার উপর কাফফারা ওয়াজেব-কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখতে যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে।" (সূরা মায়'ইদা, আয়াত ৯৫)

খারেজিরা আবারো পরাভূত হল। এই আয়াতের সমর্থনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন যে, "উভয় পক্ষ থেকে একজন বিচারক বা মধ্যস্ততাকারী নিয়োগ দেওয়ার ফলে মুসলিমদের রক্ত ও ঐক্য রক্ষা পেয়েছে কিনা?" এর মাধ্যমে ৩,০০০ জনের মত খারেজিদের একটি দল আহলে সুন্নাহর মাঝে ফিরে আসে আর বাকী খারেজিরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে।

এই সব কিছুর মধ্যেই মূসা আল 'আশ 'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আমর ইবন আল 'আসের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যস্ততা চলতে থাকে। আমর ইবন আল 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার প্রতিপক্ষকে বললেন যে "চলুন আমরা উভয়েই এই দুইজন শাসককে মেনে নিতে অস্বীকার করি কেননা তাদের কারণে অনেক মুসলিমের রক্তপাত হয়েছে। এদের বাদ দিয়ে বরং মুসলিমরা আবার নতুন করে শুরু করুক। এরপর আমরা আমার পুত্র 'আমর ইবন 'আমর কে আমাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব দিই।" আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন "না, তোমার পুত্র শাসন করা মানে হল তুমিই শাসন করা"। 'আমর ইবন আল 'আস এটা মেনে নিলেন এবং বললেন, "তাহলে আমরা উভয়ই তাদেরকে পরিত্যাগ করি। আপনি ফিরে গিয়ে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে পরিত্যাগ করুন আর আমি ফিরে গিয়ে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতি একই কাজ করব। এরপর আমরা উপযুক্ত নেতা নির্বাচন করার ব্যাপারটা মুসলিমদের উপর ছেড়ে দেব। এতে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।"

আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মূলত মসলিমদেরকে রক্তপাতের হাত থেকে রক্ষা করতে এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। তবে এই ক্ষেত্রে একটা বিষয় আমাদের বুঝতে হবে- আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সক্রিয়ভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি চিন্তাই করতে পারেননি যে কোন সাহাবা তাঁর বিরুদ্ধে কোন চক্রান্তে লিপ্ত হতে পারে। সুতরাং যখন আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ভাবছিলেন যে তাঁরা উভয়ই উম্মাহর ঐক্য রক্ষার জন্য কাজ করছেন তখন প্রকৃতপক্ষে তাঁকে প্রতারিত করা হচ্ছিল।

অতঃপর সেই অপেক্ষিত দিন আসলো- যেদিন মুসলিম উম্মাহর বিষয়ে দুইজন মধ্যস্ততাকারীর সিদ্ধান্ত লোকদের জানানো হবে। ‘আমর ইবন আল ‘আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আবু মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন- “আপনি আমার পূর্বে ইসলামে প্রবেশ করেছেন, আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী এবং আপনি উনার সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়ে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আপনি শুরু করুন এবং লোকদেরকে বলুন আমরা কী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।”

এভাবে আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে প্রথমে সিদ্ধান্ত পড়ার জন্য জোর করা হল। আবূ মূসা শুরু করলেন- “ হে লোকসকল, আমরা একে অপরের বিপক্ষে যুদ্ধ করছি এবং আমরা আমাদের বাইরের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছি না। অথচ আমাদের বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার কথা কারণ তারা আমাদের আক্রমণ করছে। আমি ইমাম আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে পরিত্যাগ করছি কেননা তিনি আমাকে অধিকার দিয়েছেন আমার বিবেচনা অনুযায়ী একটি সিদ্ধান্ত নিতে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আর আমাদের খলীফা নন এবং অন্য কারও খলীফা হওয়া উচিৎ”। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঘটনাপ্রবাহ বোঝার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর জন্য সবচেয়ে খারাপটা তখনো বাকী ছিল। আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এতটুকু ঘোষণা করেই দ্রুত নেমে গেলেন। এরপর আমর ইবন আল ‘আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এলেন এবং তিনি তার বিচার বলতে শুরু করলেন, “আমি মুয়াবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে খলীফা হিসেবে সমর্থন করছি, কেননা মুসলিমরা খলীফা ছাড়া থাকতে পারেনা। উনি খলীফা হওয়ার যোগ্য ও তার রক্ত পরিশুদ্ধ এবং তিনি উসমান

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যায় হস্তক্ষেপ করেননি।" এই ঘোষণায় মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বাহিনী অত্যন্ত খুশি হল এবং তারা অনুধাবন করল যে এখন তারা খলীফার সৈন্যবাহিনী এবং তাদের পরিকল্পনা পরিপূর্ণভাবে কাজে লেগেছে। আর হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় ইমাম আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী পুরোপুরি বিশৃংখল হয়ে পড়ল।

আবু মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন বুঝতে পারলেন যে তাঁকে প্রতারিত করা হয়েছে তখন তিনি লজ্জায় লোকচক্ষুর অন্তরালে মক্কায় পালিয়ে গেলেন এবং লুকিয়ে থাকলেন। এরপরে খারেজিরা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ও পরবর্তীতে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কাফির আখ্যায়িত করল এবং উভয়কেই আল্লাহর দৃষ্টিতে অপরাধী হিসেবে গণ্য করল। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এই বিপর্যয়ের মধ্যেও শান্ত থাকার চেষ্টা করলেন। তিনি তাঁর বাহিনীর প্রতি বললেন, "শুনো, এরা দুজন আল্লাহর আইন অনুসারে বিচার করেননি। আল্লাহর শরীয়াহতে কোথায় বলা আছে যে তুমি খলিফার প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করতে পার? তাদেরকে মধ্যস্ততা করার জন্য নির্ধারন করা হয়েছিলো কিন্তু তারা তা করেননি। আমাদের উচিৎ পুনরায় একত্রিত হওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।"

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুফায় ফিরে গেলেন এবং তাঁর বাহিনীকে প্রস্তুত করলেন। তিনি খারেজিদের চিঠি পাঠালেন এটা বলে যে এখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় যারা সঠিকভাবে বিচার করেনি। কেননা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা অনুযায়ী বিচার না করে তারা গুনাহ করেছেন। এর উত্তরে খারেজিরা অত্যন্ত কঠোর এক চিঠি পাঠিয়েছিলো যাতে বলা হয়, "না, আমরা পূর্বেই আপনাকে ক্রোধান্বিত হতে আহবান করেছিলাম এবং আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে বলেছিলাম। আমরা শুরুতেই আপনাকে তা করতে বলেছিলাম। এরা দুইজন কোন প্রমাণ ছাড়াই বিচার করেছে। কিন্তু এখন আপনি আমাদেরকে যুদ্ধ করতে বলছেন আল্লাহর জন্য নয় বরং আপনার অবস্থান রক্ষা করার জন্য। আপনার ক্ষমতা রক্ষার জন্য আজ আপনি আমাদেরকে যুদ্ধ করতে বলছেন। যতক্ষন পর্যন্ত না আপনি স্বীকার করবেন যে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একজন কাফির ছিলেন এবং আপনি নিজেও কাফিরে পরিণত হয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনার হয়ে যুদ্ধ করব না। আপনি যদি তা করেন তাহলে আমরা আপনাকে সাহায্য করার বিষয়টি বিবেচনা করব।"

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যুত্তরে বললেন, "আমি সাক্ষ্য দেবো যে আমি একজন কাফির? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হিজরত করার পর এবং তাঁর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে এতগুলো যুদ্ধে অংশ নেবার পর আমি কিছুতেই এরূপ সাক্ষ্য দেবো না!"

খারেজিরা তাঁর এরূপ উত্তরে রেগে গেলো এবং জানিয়ে দিলো যে তাদের যেন আর কোন যোগাযোগ করা না হয়। এই সময়ে তারা মুসলিমদের রক্তপাত করতে শুরু করল। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আদেশ করলেন যে খারেজিদেরকে তাদের মত থাকতে দেওয়া হোক এবং তিনি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করার পর ফিরে এসে খারেজিদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করবেন, যাতে তারা সঠিক পথে ফিরে আসে।

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর কাছ থেকে বিজয় ছিনিয়ে আনতে গেলেন তখনই খারেজিরা তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু করল। তারা রাস্তায় রাস্তায় লোকদেরকে থামিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতবাদ জানতে চাইত।[1] যখন লোকদের উত্তর তাদের বিরুদ্ধে যেত এবং যখন লোকেরা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুবা মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে অভিসম্পাত করতে অস্বীকার করত তখন খারেজিরা তাদের হত্যা করত। এরকম একজন শহীদ হলেন 'আব্দুল্লাহ ইবন খাব্বাব ইবন আল আরাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, যিনি

---

[1] বিদ'আতরত ব্যক্তিদের চিহ্ন হল জ্ঞানের প্রতি তাদের অবজ্ঞা, যেটা পাঠকমাত্রই এই নিবন্ধের শেষে এসে অনুধাবন করতে পারবেন। যখনই বিদ'আত করতে থাকা লোকরা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে সেটা তারা আন্তরিকভাবে উত্তর পাবার জন্য করেনা। বরং তাদের উদ্দেশ্য থাকে টোপ ফেলে আপনাকে আটকে ফেলা। আপনি যদি তাদের মন মত উত্তর দেন তবে তারা আপনাকে ছেড়ে দেবে এই মনোভাবে যে আপনি 'সত্য' বা সঠিক মানহাযে আছেন। কিন্তু যদি আপনার উত্তর তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে ভিন্ন হয় তবে তারা আপনাকে পথভ্রষ্ট, বিদ'আতী বা কিছু ক্ষেত্রে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করবে। যদিও কোন ক্ষেত্রেই তাদের হাতে কোন প্রমানাদি নেই। এই ধরণের আচরণ বর্তমানে খুব বেশি দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে নতুন সালাফিয়্যাহ আন্দোলনের মধ্যে - একটা নতুন ও দুর্বৃত্তদল যারা পূর্বে উল্লেখিত বিদা'আতী ও অন্ধ অনুসরনকারী ব্যক্তিদের চরিত্রের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আরো তথ্যের জন্য দেখুন টেপ সেট- 'এটা কি সালাফী মতবাদ নাকি শাইখী মতবাদ?'

ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন সাহাবার পুত্র। সাহাবা খাব্বাব ইবন আল আরাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন এবং কুর'আনের অনেক আয়াত নাযিল হয়েছিল এই মহৎ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে।

'আব্দুল্লাহ ইবন খাব্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এই সময়ে তাঁর অন্তঃস্বত্তা স্ত্রীকে নিয়ে যাত্রা করছিলেন। খারেজিরা তাঁকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল যে, "আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সময়কার খিলাফত সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?" 'আব্দুল্লাহ ইবন খাব্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন যে, "মাশা'আল্লাহ (আল্লাহ্ যা ভালো মনে করেছেন), সেটি ভালো ছিলো"। এরপর তারা আবার জিজ্ঞেস করল, "আর উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু?" তিনি উত্তর দিলেন, "মাশা'আল্লাহ, ভালো ছিলো।" তারা আবার বলল, "আর উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু?" তিনি আবারো উত্তর দিলেন , "মাশা'আল্লাহ্, তা ভালো ছিলো। যদিও লোকেরা তাঁকে পছন্দ করত না, তবুও তিনি ভালো ছিলেন।" খারেজিরা বলল, "তুমিও 'তাদের' অন্তর্গত। তুমি জানো যে তারা উসমানের হত্যাকান্ডে জড়িত ছিল" এরপর তারা ক্রোধান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ব্যাপারে তোমার ধারণা কি?" তিনি বললেন, "তিনি উত্তম। আর তোমরা যদি তাঁকে সাহায্য কর তাহলে তিনি আরো উত্তম হতে পারবেন। আর তোমাদের যদি তাঁকে সাহায্য করার মনোভাব না থাকে তাহলে সরে যাও ও নিশ্চুপ থাকো।" তারা বলল, "এখন আমরা বুঝতে পারছি। তুমি আমাদেরকে সেইসব লোকের প্রতি বিশ্বাস করতে বলছো যারা কিনা নিজেরাই সত্যকে বিশ্বাস করেনা। কিন্তু আমরা তোমাকে সত্যটা দেখাচ্ছি!"

এরপর তারা এই দম্পতিকে নিয়ে বেঁধে রাখল। এটা করার সময় একজন অমুসলিমের খেজুর গাছ থেকে একটা খেজুর এসে এক খারেজির উপর পড়ল। সে তা খেয়ে ফেললে আরেকজন খারেজি তাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি এটার দাম দিয়েছো? যদি না দিয়ে থাকো তবে তোমার সেটার দাম দিতে হবে, কেননা তা তোমার নয়"। এরপর লোকটি গিয়ে সে যা খেয়েছে তার দাম দিয়ে আসলো। পাশাপাশি খারেজিরা একটা শূকরও হত্যা করল এবং এই অমুসলিমের শূকরের দাম কে দেবে সেটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহ করতে শুরু

করল। শূকরের মালিক আসলে খারেজিরা ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং তার শূকরের জন্য যা দেবার কথা ছিল তা দিয়ে দিল।

'আব্দুল্লাহ ইবন খাব্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সামনে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনা দেখছিলেন এবং তিনি তাদের বললেন, "আমার নিজেকে নিয়ে খুবই চিন্তিত লাগছে। তোমরা মুসলিমদের হত্যা কর আর মুশরিকদের ছেড়ে দাও।" তিনি এটা বলার পর খারেজিরা তাঁকে ও তাঁর অন্তঃস্বত্তা স্ত্রীকে হত্যা করে। এতেও তারা ক্ষান্ত হয়নি। তারা তাঁর মৃত স্ত্রীর পেট কেটে তাঁর গর্ভের সন্তানকেও হত্যা করে।

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে এই খবর পৌঁছানোর পর তিনি তাদের প্রতি বার্তা পাঠালেন যে, "তোমরা এখন মুসলিমদের হত্যা করতে শুরু করেছো। তোমরা যদি ক্ষমা প্রার্থনা না কর আর এই লোক, তাঁর স্ত্রী-সন্তান ও অন্য মুসলিমদের হত্যা করার জন্য রক্তপণ না দাও তবে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হব।" আবু আইয়ুব আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে তাদের সাথে কথা বলার জন্য ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর দাবী পেশ করার জন্য পাঠানো হল। তাদের প্রতি ও নিজের সেনাবাহিনীর প্রতি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর আরেকটি বার্তা ছিলো যে "যদি তোমরা তাদের (খারেজিদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তবে তোমাদের দশজনও মারা পড়বে না, আর তাদের দশজনও অবশিষ্ট থাকবে না।"

যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া হল। খারেজিরা এর পর আর কোন যোগাযোগই করল না বরং তারা অন্য মুসলিমদের উপর তাকফির করতে শুরু করল ও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকলো।[1]

---

[1] এক্ষেত্রে এটা ব্যাখ্যা করা গুরুত্বপূর্ণ যে খারেজিদের বিরুদ্ধে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যুদ্ধ করাটা মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার থেকে ভিন্নতর। খারেজিদের সাথে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর যুদ্ধ ছিল পথভ্রষ্টদের বিরুদ্ধে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লড়াই। এক্ষেত্রে মূলত চারটা ভিন্নতা রয়েছেঃ

১। কুফফার বা পথভ্রষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মুসলিমদেরকে সেই কুফফার বা ভ্রষ্টদের ব্যক্তিগত সম্পদকে গনীমত হিসেবে নেওয়া হালাল করে। কুফফারদের ব্যক্তিগত সম্পদকে গ্রহণ করার একটা উদাহরণ হল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তাঁর দুইজন নারী, সাফিয়্যা ও রাইহানা কে গ্রহণ করেছিলেন। এরা সকলেই মূলত ইহূদী গোত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যাদেরকে ইহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ের পরে নেয়া হয়েছিল

এবং তাদের স্বামীদেরকে, যারা যোদ্ধা ছিলেন, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো। কিন্তু মুসলিমদের জন্য মুসলিম নারীদেরকে যুদ্ধে গনীমত হিসেবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, যেমনটি আমরা দেখেছিলাম উটের যুদ্ধে, যেখানে আ'য়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জড়িত ছিলেন।

২। এটি একজন যোদ্ধাকে অনুমতি দেয় একজন ব্যক্তি যিনি ভ্রান্ত বা কুফফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছে তার পিছু নিয়ে তাকে হত্যা করার। কিন্তু এটা দুটি মুসলিম দলের মধ্যে যুদ্ধের ক্ষেত্রে করা নিষিদ্ধ, কেননা যেসব বিদ্রোহী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্য হল, তাদেরকে যুদ্ধ করা থেকে বিরত করা। তাদের বিরুদ্ধে এইজন্য লড়াই করা হয় না যাতে তাদের হত্যা করা যায়। তাদেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় না।

৩। মুসলিমরা চাইলে গোমরাহ কোন ফিরকার আহত যোদ্ধাদের হত্যা করতে পারে, কিন্তু এটা সীমালংঘনকারী মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই এর ক্ষেত্রে করা যাবে না। এর প্রমাণ হল যে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَاۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ

"অতঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দানে মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে!" (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ৪)

৪। মুসলিম অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় তাদের দেহকে সম্মান করা, তাদের জানাযা পড়া, তাদেরকে মুসলিম হিসেবে সম্মান করা, মুসলিমদের জন্য ওয়াজিব। কিন্তু গোমরাহ বা বিচ্যুতদের বা কাফিরদেরকে এই বিবেচনা করার বা সুবিধা দেবার কোন প্রয়োজন নেই। এর দালীল হল বদরের পর পর হয়ে যাওয়া এই ঘটনা। আবু জাহল ইবন হিশাম, 'উতবা ইবন রাবি'আ, শাইবা ইবন রাবি'আ, উক্বা বিন আবি মু'আইত, উমাইয়্যা ইবন খালাফ নিহত হয়েছিল। উমাইয়্যা ছাড়া বাকি সবার মৃতদেহ একটি কূয়ায় নিক্ষেপ করা হয়। উমাইয়্যার শরীর অত্যন্ত মোটা হওয়ায় তাকে কূয়াতে ফেলা যাচ্ছিলো না। তাই তার শরীর খন্ডিত করে তারপর কূয়াতে নিক্ষেপ করা হয়। সহিহ বুখারির ষষ্ঠ খন্ডে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে একজন মুসলিমের মৃতদেহের সাথে এরকম করা ভুল, কিন্তু কুফফার এবং গোমরাহ দলগুলোর সাথে এরকম আচরণ করা জায়েজ। এ ব্যাপারে আরো তথ্য এবং দালীলের জন্য দেখুন মাজমু'আ ফাতাওয়া, খন্ড ২৮, পৃষ্ঠা ৪৭৬-৪৭৯, যেখানে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ "আলি এবং উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া ইজমা'ইন থেকে বর্ণিত হয়েছে, এবং এই ব্যাপারে ইসলামের 'আলিমগণের ইজমা আছে যে এই দুই ব্যক্তিকেও (অর্থাৎ দুর্বল ও অসহায় খারেজি এবং দুর্বল ও অসহায় রাফিদ্বা ব্যক্তি) হত্যা করতে হবে। যে ব্যক্তি যুদ্ধ করছে না তার ব্যাপারে কিছু কিছু 'উলেমার মধ্যে মতভিন্নতা হয়েছে, কিন্তু দলের মধ্যে অবস্থান করলে

দুই দলের মাঝে লড়াই হল অত্যন্ত দ্রুত ও হিংস্র। কিন্তু শেষপর্যন্ত মিথ্যার অন্ধকার, জুলুমের উপর যেমন সত্যের জয় হয়, তেমনি ভাবেই খারেজিরা যুদ্ধে হেরে গেলো। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন মৃতদের দেহগুলো পর্যবেক্ষণ করছিলেন তখন তিনি কিছু চিহ্ন খুঁজছিলেন যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিসে উল্লেখিত খারেজিদেরকেই হত্যা করেছেন। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেই লোকটাকে খুঁজছিলেন যার কথা রাসূললুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন- লোকটির একটি হাত মেয়েদের ছোট স্তনের ন্যায় হবে। যখন তাকে খুঁজে পাওয়া গেলো তখন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খুশিতে বলে উঠলেন, "আল্লাহু আকবার! (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যতবানী সত্য করার জন্য আমাকে কাজে লাগানো হয়েছে আর তোমাদের সকলেরই হাদীসটি জানা আছে।" এরাই ছিলো প্রথম প্রজন্মের খারেজি এবং তাদের ইতিহাস এখানেই শেষ। কিন্তু এরাই একমাত্র খারেজি ছিলো না। খারেজিরা কেবলমাত্র এই একটা লোক ও তার অনুসারিদের মধ্যে দিয়েই শেষ হয়নি, বরঞ্চ তাদের পরম্পরা চলতে থাকে। দিমাস্কে (দামেস্ক) দ্বিতীয় প্রজন্মের খারেজিরা দেখা দেয় এবং আবূ আমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিম্নোক্ত হাদিসে তাদের কাহিনী ব্যাখ্যা করেনঃ আবূ কুরাইব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে আসা বর্ণনার সনদে সূত্র ধরে, ওয়াকি'আ বিন রাবি'আ বিন সাবিহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হাম্মাদ বিন সালামাহ আবু গালিব থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেছেন," আবু আমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দিমাশকের (দামেস্ক) মসজিদের সিঁড়িতে কিছু ছিন্ন মস্তক দেখতে পেয়ে কাঁদছিলেন। আবু আমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এরপর বললেন যে, "জাহান্নামের কুকুর (খারেজিরা) হল

এদের হত্যা করা জায়েজ। কারণ তারা দলকে অস্ত্র দিয়ে প্রতিরক্ষা করছে। আর হত্যার হুকুমের চাইতে, যুদ্ধের হুকুমের ব্যাপ্তি বেশী"।

এবং এই ব্যাপারে ইজমা আছে এবং ফিক্বহের সকল কিতাবেই এরকম বলা আছে। এই বইটির প্রথম সংস্করণের প্রকাশের পর, কিন্তু জ্ঞানহীন লোকেরা এ বিষয়টি নিয়ে সন্দেহের উত্থাপন করেছিল। কিন্তু ফিক্বহের একটি হলেও কিতাব পড়েছে এমন যেকোন ব্যক্তি এই ফাতাওয়া খুঁজে পাবেন। শুধু সেইসব শাইখরা এই হুকুম খুঁজে পায় না, যারা নিজেদের শাইখ দাবি করে তাদের জ্ঞানহীন সমর্থক - যারা নিজেরা জ্ঞান অর্জন করতে পারে না – তাদের কাছ থেকে এই তথ্য গোপন করে।

আকাশের নিচে অবস্থানরত সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি যাদের হত্যা করা হয় আর তারা যাদের হত্যা করে তারা হত্যা হওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি”।[1]

এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ

يَوۡمَ تَبۡيَضُّ وُجُوهٞ وَتَسۡوَدُّ وُجُوهٞۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡوَدَّتۡ وُجُوهُهُمۡ أَكَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ (١٠٦) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبۡيَضَّتۡ وُجُوهُهُمۡ فَفِي رَحۡمَةِ ٱللَّهِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ (١٠٧)

“সেদিন কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো। বস্তুতঃ যাদের মুখ কালো হবে, তাদের বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর। আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে রহমতের মাঝে। তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।” (সূরা আল ইমরান, আয়াত ১০৬-১০৭)

“এরপর আমি আবু আমামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বললাম, ‘আপনি এটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে শুনেছেন?’ তিনি বললেন, ‘আমি যদি একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার কিংবা সাতবার এটা না শুনে থাকতাম তবে আমি এটা বলতাম না’।

খারেজিরা বিভিন্ন সময়ে সময়ে আবির্ভূত হতে থাকে এবং প্রতিবারই তারা যেখানেই যেত সেখানেই আতংক ও কোন্দল সৃষ্টি করত। আবুল আব্বাস ‘আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবন ‘আলী ইবন ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাসের সময়ে একটি খারেজি প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে। এই খলীফা জিহাদে তার ক্ষিপ্রতার ও প্রবলতার জন্য পরিচিত ছিলেন। এজন্য তাকে নাম দেওয়া হয়েছিলো আস-সাফ্ফা (যিনি রক্ত ঝরান)। আব্বাসীয় খিলাফাতের সময়ে (মুসলিম শাসন)

[1] তাফসীর উল কুর'আন আল 'আযীম, পৃ: ৫১৭-৫১৯

খারেজিরা অত্যন্ত দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, কেননা আব্বাসীয় খিলাফত তাদের বিরোধীতাকারীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিল, তারা ভুল বা ঠিক যাই হোক না কেন। আরও একটি কারণ ছিল যে তারা ছত্রভংগ হয়ে গিয়েছিলো এবং কেউ কেউ তিউনিসিয়া ও খোরাসানে চলে গিয়েছিলো।

তবুও খারেজিদের কখনোই গণনার বাইরে রাখা হয়নি কেননা আহত সাপই সবেচেয়ে বেশি বিপজ্জনক হয়। আল জুলান্দি ইবন মাস'উদের নেতৃত্বকালে সেই সময়ের খারেজিরা, যারা ইবাদিয়্যাহ নামে পরিচিত ছিল, তারা ব্যাপক ধ্বংস সাধন করতে শুরু করে।[1]

কিন্তু তারা কোনভাবেই "আস সাফফা'র মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। উনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যাকে উন্মত্ত ও চরমপন্থী শিয়ারাও ভয় পেত। একবার যখন খারেজিদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হল তখন 'আস-সাফফা' ইবন মাস'উদ সহ তার দশ হাজার অনুসারীকে হত্যা করেন। মূলত তিনটি প্রধান দল থেকে আগত হলেও খারেজিরা পরবর্তীতে বিভিন্ন দলে ভাগ হতে শুরু করে। সময়ের সাথে সাথে তারা জটিল মিশ্রণের বিভিন্ন উপদলে ভাগ হতে থাকে। কোন কোন দল অন্য দলের বিদ'আতী চিন্তাধারাকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে ও নিজদের চিন্তাধারায় তা যুক্ত করে। এভাবেই তাদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসগুলোতে আগে থেকেই থাকা ভ্রষ্ট ধারনাগুলোর পাশাপাশি বিদ'আতের উপরে বিদ'আত জমা হতে শুরু করে।

---

[1] এরা আবদুল্লাহ ইবন ইবাদের এর সহচর, যারা মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো। তাদের একটা সুপরিচিত মতবাদ হল যে আহলে ক্বিবলাহর লোকদের মধ্যে যারা তাদের সাথে ভিন্নমত করে তারা কাফির কিন্তু মুশরিক (মূর্তিপূজক) নয় এবং তারা এদের বিয়ে করতে পারবে এবং তাদের সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারবে। তারা এটাও বিশ্বাস করত যে সুলতান (শাসক) যে দেশ শাসন করছে সেটা একটা 'বাগীই' বা অন্যায়ের স্থান আর যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ করছে সে একজন মুওয়াহহিদ (তাওহীদে বিশ্বাসী) কিন্তু সে মুমিন নয়।

কয়েকটি প্রাচীন খারেজি দল

নিম্নে কিছু খারেজিদের কথা উল্লেখ করা হল যারা প্রাচীনকালে বিদ্যমান ছিলঃ

১। মুহাক্কিম আল 'উওলা (যে সকল লোক ফয়সালা দাবি করে এবং তাদের সমগোত্রীয়রা): এই ধরণের দলের উদাহরণ উপরোল্লিখিত হয়েছে। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল যুল খুওয়াইসিরা নামে এক ব্যক্তি যিনি রাসূললুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বিচার চেয়েছিলেন। আলী ইবন আবূ তালিবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সময়ে এদের পতন হয় যখন তিনি একজন লোককে খুঁজে পান যার হাত ছিল নারীর ছোট স্তনের ন্যায়।এদের মধ্যে মাত্র দশজন বেঁচে ছিলো কিন্তু তারা পালিয়ে যায় এবং নিজেদের নতুন দল গঠন করে। এরাই 'আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, 'আমর ইবন আল 'আস ও আবু মুসা আল আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু- যারা যারা তাহকীম (বিচার-ফয়সালা) এর সাথে জড়িত ছিল, তাদেরকে কুফফার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছিল।

২। আল আযাআ'রিক্কাঃ এরা ছিল আবু রশীদ নাফী' ইবন আল আযরাক্কের সংগী। এরা নাফী'র সাথে ইরাকের বসরা ত্যাগ করে আল আহওয়াযে চলে যায়। সেখানে নাফী'র সাথে আরো ছিল খারেজিদের অন্যান্য নেতারা, যেমন- 'আতিয়াহ ইবন আল আসওয়াদ আল হানাফী, 'আবদুল্লাহ ইবন আল মাহুয এবং তার ভাইয়েরা- 'উসমান ও যুবাইর, 'আমর ইবন 'উমাইর আল 'আনবারী, কাতারী ইবন আল ফাজা'আ আল মাজিনী, 'উবাইদা ইবন হিলাল আশ –শুকরি ও তার ভাই, মাহরায ইবন হিলাল, সাখর ইবন হাবিব আত-তামিমী, সালিহ ইবন মিখরাকক আল 'আবদী, 'আবদু রাব্বিল কাবির, 'আবদু রাব্বিস সাঘীর।

এসময়ে অনেকে ব্যহ্যিকভাবে খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রায় ৩০,০০০ ঘোড়া নিয়ে বসরায় খারেজিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হল এবং এতে লোকেরা যোগ দিল। এরপর সেখানে এসে যোগ দেন 'আবদুল্লা ইবন আল হারিথ ইবন নুফাইল আন-নুফাইল, তাঁর সাথে আরো ছিলেন তাঁর সেনাবাহিনীর বন্ধু মুসলিম ইবন 'আবিস ইবন

কুরাইয ইবন হাবিব। খারেজিরা মুসলিম ইবন আবিসের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাঁর সংগীদের পরাজিত করে।

এরপর খারেজিদের বিরুদ্ধে ‘উসমান ইবন মু’আম্মীর আত-তামীমি লড়াই করতে আসেন এবং খারেজিরা তাঁকেও পরাজিত করে। এরপর এক বিরাট জনাকীর্ণ সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসেন হারিথা ইবন বদর আল ‘ইতাআবী, কিন্তু খারেজিরা তাদেরকেও পরাজিত করে। বসরার লোকেরা খারেজিদের হাত থেকে নিজেদের জীবন ও ভূমি রক্ষা করার ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়ল। এরপর সেখানে আসলেন আল মাহলুব ইবন আবি সাফারা, যিনি ১৯ বছর ধরে আযা-আ’রিক্বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন এবং শেষপর্যন্ত আল হাজ্জাজের সময়ে এসে তিনি তাদের ধ্বংস করতে সক্ষম হলেন। নাফী’, আযা আ’রিক্বাদের সাথে আল মাহলুবের যুদ্ধের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে। নাফী’র মৃত্যুর পরে খারেজিরা কাতারী ইবন আল ফাজা’আ আল মিজানীর প্রতি বাই’য়াহ দেয় এবং তাকে “আমীরুল মু’মিনিন” হিসেবে নামকরণ করে।

৩. আন নাজদাআতঃ এরা ছিল নাজদা ইবন ‘আমীর আল হানাফির লোক এবং তাঁকে সম্বোধন করা হত অভিভাবক হিসেবে। সে তার সেনাবাহিনী নিয়ে আল ইয়ামামা ত্যাগ করে এবং আযাআ’রিক্বাদের মাঝে অবস্থান করার চেষ্টা করে।

এরপর সে আবু ফাদাইক ও ‘আতিইয়া ইবন আল আসওয়াদ আল হানাফীকে সেই দলে গ্রহণ করে যা নাফী’ ইবন আল আযরাক্বকে ত্যাগ করেছিল। তারা তাকে নাফী’র সাম্প্রতিক কাজ সম্পর্কে অবহিত করে যেমন- দলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা লোকদেরকে তাকফির করা সম্পর্কে মতানৈক্য, অন্যান্য সাধারণ ঘটনাবলি এবং ঘটমান বিদা’আত। এরপর তারা নাজদা কে বাই’য়াহ দিল এবং তাকে নাম দিল- আমিরুল মু’মিনিন। এরপর তারা নাজদার সাথে তাদের মতপার্থক্য দেখা গেল, এবং নাজদার বিরুদ্ধে তাদের কিছু অভিযোগ ছিল, যার ভিত্তিতে তারা নাজদাকেও কাফির ঘোষণা করলো।

এ অবস্থায় নাজদার ছেলেরা এক সেনাবাহিনি গঠন করলো এবং আলক্বাতিফ আক্রমণ করলো। এরা পুরুষদের সাথে যুদ্ধ করল এবং নারীদেরকে নিজেদের জন্য যুদ্ধবন্দী হিসেবে নিলো। তারা বলল যে, “তাদের বিলিবন্টনের মাধ্যমে আমরা আমাদের অংশ পেলাম এবং

আমরা কেবলমাত্র উদ্বৃত্তটুকু ফিরিয়ে দিলাম। এবং বন্টনের পূর্বেই তারা মহিলা বন্দীদের সাথে সহবাস করেছিলো। বন্টনের পূর্বেই তারা গনিমত (যুদ্ধে পাওয়া সম্পদ) থেকে খাদ্যগ্রহণ করেছিলো।"

এরপর তারা নাজদার কাছে ফিরে এলো এবং তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করল। সে বলল, "সে কি তোমাদের এরূপ কাজের জন্য তোমাদেরকে কোন কটূক্তি করেনি?" তারা বলল, "আমাদের এরকম কিছু জানা নেই। সে আমাদেরকে কটূক্তি করেনি।" এরপর তারা নিজেদের অজ্ঞতার ব্যাপারে অজুহাত দিতে শুরু করল।

নাজদার সংগীরা এই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত দিল। আবার তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ তার অজ্ঞতার অজুহাত ও ইজতিহাদের উপর বিচারে সহমত দিল (অর্থাৎ যারা এরকম করেছে তারা ইজতিহাদ করেছে কিংবা তারা অজ্ঞতাবশত ভুল করেছে তাই তাদের শাস্তি না দেয়া হোক)। তারা বলল "দ্বীনের মধ্যে দুইটি বিষয় আছে, একটা হল আল্লাহ্ ও তাঁর নবী রাসূলগণের প্রতি সচেতনতার ব্যাপারটি। অপরটি হল মুসলিমদের রক্তপাত হারাম হবার ব্যাপারটি এবং আল্লাহ-র পক্ষ থেকে যা এসেছে তা সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা। এ দ্বিতীয় বিষয়টি তাদের পক্ষে যায়। এটা সকলের উপরে ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) এবং এই ব্যাপারে অজ্ঞতা কোন অজুহাত হতে পারেনা।"

"দ্বিতীয়টি হল তা যা পূর্বের বিষয়ে সমকক্ষ। সুতরাং যতক্ষন পর্যন্ত কারো কাছে হালাল ও হারামের ব্যাপারে হুজ্জাহ (সুস্পষ্ট প্রমাণ) পৌঁছায়নি, মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞতার অজুহাত দিতে পারবে। আর যে ব্যাক্তি হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে গুনাহগার মুজতাহিদের (যিনি ইজতিহাদ করেন)[1] উপর শাস্তির বিধান প্রয়োগ করে, সে কাফির।"

নাজদা ইবন 'আমীর, যিম্মী (চুক্তিবদ্ধ)[2] লোকদের রক্তকে হালাল হিসেবে ঘোষণা দিল

---

[1] ইসলামের আলেম যিনি কুর'আন ও সুন্নাহর মূলপাঠ ব্যবহার করে কোন স্বতন্ত্র ফয়সালায় পৌঁছান।

[2] যেসকল ইহুদী ও খ্রিষ্টান যারা ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অধীনে থাকে। এরা ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক নিরাপত্তা লাভ করে কারণ এরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না এবং তারা জিজয়া প্রদান করে। (যে কর অমুসলিমরা

এবং তাদের সম্পদকেও তাকি'য়ার[1] শর্তাধীনে এনে হালাল ঘোষণা করল। সে এই ফয়সালা করল যে যেই ব্যক্তি উপরোল্লিখিত রক্ত ও সম্পদকে হারাম মনে করবে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে ও ঘৃণা করতে হবে।

৪. আল 'আজ আদিরাঃ এরা 'আবদুল করীম ইবন 'আজ আরিদ নামে এক ব্যক্তির সংগী ছিল। সে আন-নাজদাতকে তাদের বিদা'আতে সহযোগীতা করেছিল এবং কেউ কেউ বলত যে সে আবু বাহাইসের সংগীদের মধ্যে একজন ছিল। এরপর সে তার সাথে মতবিরোধ করল এবং নিম্নোক্ত কথাগুলোর মাধ্যমে নিজেকে পৃথক করে ফেললঃ

"যেকোন শিশুর প্রতিও বারা'আ (আল্লাহ্ তা'আলা যেই ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ঘৃণা করতে বলেছেন তা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা ও সেটার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা) ঘোষণা করা বাধ্যতামূলক, যতক্ষন না পর্যন্ত তারা ইসলামের শাহাদাহ গ্রহণ না করে।"

"এবং এটাও আবশ্যক যে তারা বালেগ হওয়া মাত্র এই বিষয়ে সাক্ষ্য (মুসলিম সাক্ষ্য) দেবে। মুশরিকদের (মূর্তি উপাসকদের) শিশুসন্তানেরাও তাঁদের পিতাদের সাথেই জাহান্নামের আগুনে থাকবে।" সে আরও বিশ্বাস করত যে সম্পদের মালিককে হত্যা না করা পর্যন্ত সম্পদ গনিমত হিসেবে বিবেচিত হবে না।

যারা খারেজিদের নিজস্ব স্বীকারোক্তি দ্বারা তাদের চিনে ফেলত এবং এ কারণে তাদের সেনাবাহিনী (অর্থাৎ তাদের অধীনে যুদ্ধ করা) ছেড়ে যেত, এই খারেজিরা তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করত। তারা এটাও বিশ্বাস করত যে হিজরত একটা বরকতপূর্ণ কাজ, কিন্তু আবশ্যকতা নয়, বরং তা একটি ঐচ্ছিক 'আমল। তারা কবীরা গুনাহতেও অবিশ্বাস করত। (যেমন- ধূমপান করা, মদ খাওয়া ইত্যাদি)। তাদের কাছ থেকে এও বর্ণিত আছে যে, তারা কুর'আনের সূরা ইউসুফকে অস্বীকার করত এই বলে যে সেটা আদিকালের এক কল্পিত

ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রদান করে)। এভাবে তারা তাদের ধর্ম পালন করতে পারে কিন্তু জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে ভূমিতে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে।

[1] এক্ষেত্রে তাকিয়্যা অর্থ সংশয় পূর্ণ অবস্থা থাকা। এর মানে হল নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত এই সম্পদ হালাল হারামের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকবে।

গল্প সমাহার। তারা বলে "এটা সম্ভব নয় যে একটা প্রেমের গল্প কুর'আনের অংশ হত পারে।"

৫. থা'আলিবাঃ এরা থা'আলাবা ইবন 'আমীর এর লোক, যে আব্দুল করীম ইবন 'আজারীদের সঙ্গী ছিল। থা'আলাবা শিশুদের কাফির হবার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছিল। সে বলেছিল, "নিশ্চয় আমরা তাদের (শিশুদের) উপর কতৃত্বশীল এবং তাদের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তারা ছোট হোক বা বড়, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা তাদের কাছ থেকে এই দেখতে পাচ্ছি যে তারা আল্লাহর অধিকারকে অস্বীকার করে এবং যুলুম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে"।

এরপর 'আজ'আরিদারা থা'আলাবার প্রতি বারা'আ ঘোষণা করে এবং থা'আলাবার ব্যাপারে আমরা আরও বলি যে সে বলেছিল, "শিশুকাল থাকা অবস্থায় একটা শিশুর ওয়ালা ওয়াল বারা'আ সম্পর্কে কোন বিচারবুদ্ধি থাকে না, যতক্ষন না তারা সেটা বুঝতে পারছে এবং সেই ব্যাপারে স্বীকারোক্তি দিচ্ছে। তাই, তারা যদি আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে সেটা অনুযায়ী তারা বিবেচিত হবে, কিন্তু তারা যদি তা অস্বীকার করে তাহলে তারা কাফিরে পরিণত হয়।"

৬. আল ইবাদি'ইয়্যাঃ এরা ছিল আবদুল্লাহ ইবন ইবাদ এর সঙ্গী, যিনি মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তাদের একটা প্রসিদ্ধ মতবাদ ছিল যে মুসলিমদের মধ্যে যারা তাদের প্রতি দ্বিমত করে তারা কুফফার, কিন্তু মুশরিক নয়। তারা এদের বিয়ে করতে পারবে এবং তাদের সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারবে। তারা এটাও বিশ্বাস করত যে সুলতান (শাসক) যে দেশ শাসন করছে সেটা একটা 'বাগীই' বা অন্যায়ের স্থান আর যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ করছে সে একজন মুওয়াহহিদ (তাওহীদে বিশ্বাসী) কিন্তু সে মুমিন নয়।

৭. আস সুফরি'ইয়াঃ এরা ছিল যিয়াদ ইবন আল আসফার এর সঙ্গী ও অনুসারী। এদের বিশ্বাস তাদের পূর্ববর্তীদের চেয়ে কোন অংশেই কম অদ্ভুত ও কূটিল ছিল না। একমাত্র পার্থক্য ছিল যে তারা আযাআরিক্বা, নাজদাত ও ইবাদিয়্যাদের সাথে সুফরি'ইয়্যার বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করত- যেসকল লোক বৈধ শাসকের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীতে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানাতো তারা তাদেরকে তাকফির করত না।

তারা মুশরিকদের সন্তানদেরকেও মুশরিক মনে করত না এবং এটা ভাবত না যে তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। তাদের দাবী ছিল যে তারা (শিশুরা) “ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম, এবং তারা অবগত নয়, হয়তবা আমরাই আল্লাহর দৃষ্টিতে ঈমান পরিত্যাগকারি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছি”।

এই লোকদের ব্যাপারে উপসংহারে বলা যায় যে, যেসব ব্যক্তি বৈধ শাসকের বিরুদ্ধে যায় (যে শাসকের ব্যাপারে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'তের মতৈক্য রয়েছে) সেসব ব্যক্তিই খারেজি। খারেজিরাই প্রথম দল যারা সিফফিনের যুদ্ধে আলী রাদ্বিয়ায়ল্লাহু আনহু এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তারা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিল। কবীরা গুনাহ করা ব্যক্তিদেরকে তারা কাফির আখ্যায়িত করেছিল এবং তারা বলেছিল যে কোন ইমাম যদি সুন্নাহর বিরুদ্ধে যায় বা ভিন্নমত করে (তাদের মতানুযায়ী) তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েজ এবং বাধ্যতামূলক।[1]

[1] আল মিলাল ওয়ান নাহল, পৃষ্ঠা ৮৭-৯৯

অধ্যায় ২

খারেজি বলতে কি বোঝায় এবং কারা খারেজি?

‘খাওয়ারিজ’ শব্দটির দ্বারা ইসলামের ‘আলেমগণ এমন লোকেদের বোঝান যারা কিছু আক্বীদা এবং আমলের মাধ্যমে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে রাসূলুল্লাহ এই ফিরকার আবির্ভাবের পূর্বেই তাদের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন। তবে ‘আলেমগণ খাওয়ারিজদের তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন, কারণ সকল খাওয়ারিজ একটি নির্দিষ্ট, অবিচ্ছেদ্য দলের অংশ না। এদের মধ্যে প্রথম দল হল সেই সব খাওয়ারিজ যারা সূরা ইউসুফ অস্বীকার করে, এবং বলে থাকে যে এটি একটি প্রেমকাহিনী। এছাড়া তারা কুর’আনের আরো কিছু আয়াতকে অস্বীকার করে। এই খাওয়ারিজরা ইসলামের গন্ডির বাইরে, এবং আল্লাহ-র কিতাবের আয়াত অস্বীকার করার কারণে তারা সম্পূর্ণভাবে কুফফার হিসেবে পরিগণিত। খাওয়ারিজদের অন্য দুটি দল আহলুল বিদ’আর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়, তবে তাদের বিদ’আ তাদেরকে ইসলামের গন্ডির বাইরে নিয়ে যায় না।

এই তিনটি খাওয়ারিজ দল ছাড়া, খাওয়ারিজদের আরেকটি লুকায়িত দল আছ। এই ফিরকাটি খাওয়ারিজ মুরজি’আ নামে পরিচিত। ‘খাওয়ারিজ মুরজি’আ’ এই নামটি শুনতে প্রথমে সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে, তবে এটি এমন একটি অসুস্থতা যা উম্মাহর মধ্যে প্রসার পেয়েছে এবং বর্তমানে সুপরিচিত। যদিও আমাদের কাছে একে নতুন মনে হতে পারে কিন্তু এই অসুখ বেশ পুরনো। খাওয়ারিজ মুরজি’আ হল এমন এক দল লোক, যারা সেসব লোককে কাফির অথবা বিদ’আতি ঘোষণা করে, যারা তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে। এই দলের লোকেরা তাদের প্রতিপক্ষকে অভিশম্পাত করে আর একই সাথে আল্লাহ-র হাকিমিয়্যাহকে (আল্লাহ-র আইন দ্বারা শাসন এবং মহান আল্লাহ-ই আইন প্রণেতা) অস্বীকার

করে। আধুনিক কালে যে আন্দোলন "সালাফিয়্যা" নামে পরিচিতি লাভ করেছে, তার সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশের মধ্যেই খাওয়ারজ মুরজি'আদের বৈশিষ্ট দেখা যায়। এই তথাকথিত "সালাফি"-রা অবলীলায় তাদের প্রতিপক্ষদের বিদ'আতি, কুফফার ইত্যাদি বলে থাকে, কিন্তু নিজেরা ক্রমাগত চেষ্টা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছ থেকে তাঁর হাকিমিয়্যার বৈশিষ্টকে বিচ্ছিন্ন করতে। অথচ কুর'আনে দুটি জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেকে আল-হাকীম (আইন প্রণয়নকারী বিচারক) হিসেবে বর্ণিত করেছেন।

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَـٰكِمِينَ

"আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্টতম বিচারক নন?" (সূরা তীন, আয়াত ৮)

وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَـٰكِمِينَ

"...তিনিই শ্রেষ্ট মীমাংসাকারী"। (আল-'আরাফ, আয়াত ৮৭)

দুটি আয়াতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেকে আল-হাকীম বলেছেন, যার অর্থ তিনিই একমাত্র আইনপ্রণেতা বিচারক। কিন্তু খাওয়ারিজ মুরজি'আদের বৈশিষ্ট হল একে অস্বীকার করা। এবং নিজেদের এই বিচ্যুতি থেকে মনোযোগ সরাতে, তারা অন্যদিকে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এজন্য তারা অন্যান্য লোকদের বিদ'আতি, গোমরাহ ইত্যাদি নাম দেয়া শুরু করে।[1] যারা সালাহ আদায় করে না, এবং শারীয়াহকে মানব রচিত আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে, তাদের তাকফির না করার ব্যাপারে খাওয়ারিজ মুরজি'আ-রা অত্যন্ত সচেষ্ট। কিন্তু এই একই দল, যারা তাদের সাথে একমত পোষণ করে না, সেই সব লোককে মুহূর্তের মধ্যে গোমরাহ, বিদ'আতি কিংবা কাফির বলে ফেলে।

[1] খাওয়ারিজ মুরজি'আদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন, আল ইমাম ফাতহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল কারিম আশ-শাহরাস্তানির কিতাব, আল মালাল ওয়ান নাহল, পৃষ্ঠা ১০০-১০৫

খারেজি মনোভাবের বৈশিষ্ট

খারেজিদের এমন কিছু বৈশিষ্ট আছে যেগুলোর মাধ্যমে তাদের সহজেই সনাক্ত করা যায়। এরকম বৈশিষ্ট ৭ টি।

১। মুসলিমদের এমন গুনাহ-র জন্য কাফির ঘোষণা করে যেগুলো প্রকৃতপক্ষে কাউকে দ্বীনের গন্ডি থেকে বের করে দেয় না। (যেমন, মদ পান, যিনা ইত্যাদি)

এর দালীল হল, আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এই কথা। খাওয়ারিজদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেনঃ

“তারা (খাওয়ারিজ) হল আল্লাহ-র সৃষ্ট জীবসমূহের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট। এই লোকেরা এমন কিছু আয়াত নেয় যা নাযিল হয়েছে কুফফারদের ব্যাপারে, আর তারপর তারা নিজেরা মন মতো এইসব আয়াতে এমনভাবে ব্যাখ্যা করে যাতে তারা দাবি করে এগুলো মু’মিনদের ব্যাপারে প্রযোজ্য[1] (অর্থাৎ খারেজিরা কুফফারের ব্যাপারে প্রযোজ্য আয়াতসমূহকে মু’মিনদের উপর প্রয়োগ করে এবং এজন্য তারা তাউয়ীল ব্যবহার করে)”।

২। তারা নিজেদের কলুষিত আক্বিদার কারণে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে, কিন্তু তারা ইহুদী-নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অতোটা ইচ্ছুক না। কিন্ত কুফফারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করলেও তারা উম্মাহ-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেই। একথার দালীল হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই কথা: “তারা মু’মিনদের হত্যা করবে আর মুশরিকদের ছেড়ে দেবে। যদি তাদের আবির্ভাবের সময় আমি উপস্থিত থাকি, তবে আমি তাদের হত্যা করবো যেভাবে ‘আদ জাতিকে হত্যা করা হয়েছিল”।[2]

---

[1] সাহীহ আল বুখারী, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৫০

[2] সাহীহ আল বুখারী, খন্ড ৯, হাদীস নং ৫২৭

৩। তারা কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া বৈধ শাসকের বিরোধিতা করে এবং তাকে উৎখাত করতে চায়। একথার দালীল হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি খাওয়ারিজের পূর্বপুরুষ আব্দুল্লাহ ইবন দ্বিল খুওয়াইসারার বক্তব্য: “হে আল্লাহর নাবী! আল্লাহকে ভয় কর!”

৪। যখন তাদের সাথে কারো মতবিরোধ হয়, তখন তারা সেই ব্যক্তিকে কাফির ঘোষণা করে।

৫। তারা রুক্ষ, উদ্ধত এবং তাদের ‘ইলম হল ভাসাভাসা (অগভীর)।

৬। যেসব মুসলিম তাদের বিরোধিতা করে, তারা সেসব মুসলিমের বিরুদ্ধে ঠিক সেইভাবে যুদ্ধ করে, যেভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আ কুফফারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। খাওয়ারিজ মুসলিমদের অতর্কিতে আক্রমণ করে, তাঁদের ধনসম্পদ গানীমাহ হিসেবে গ্রহণ করে, মুসলিমদের নারী ও শিশুদের গানীমাহ হিসেবে গ্রহণ করে এবং যদি মুসলিমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে থেকে পালিয়ে যায় তবে খাওয়ারিজ তাঁদের পিছু ধাওয়া করে এবং হত্যা করে।

৭। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের এমন কোন নাম দেয় যা সমসাময়িক মুসলিমদের হেকে তাদের পৃথক ও বিশেষায়িত করে। এর প্রমান হল, আল-মুকাফফিরাহ তাকফির ওয়াল হিজরা, জামা’আত আল মুসলিমীন, আহলুত তাওহীদ নামের দলগুলো। তাদের কাছে এই নামগুলোর অর্থ হল, শুধুমাত্র তারাই দ্বীনের একমাত্র রক্ষক, শুধুমাত্র তারাই তাওহীদের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তারাই শুধু সুন্নাহ পালন করে। এছাড়া এই ধরণের নামের মাধ্যমে তারা সুক্ষভাবে এটাই বোঝায় যে তাদের জামা’আ বা দলের বাইরে যারা আছে তাঁদের ঈমান নেই। আর এই লোকেরাই সবার আগে বলে উঠে, “আমরা যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আ...” এবং এর মাধ্যমে সুক্ষভাবে নিজ দলের সদস্য ছাড়া বাকি সবাইকে দ্বীন থেকে বহিষ্কার করে। তারা দ্বীন ইসলামকে একটা ক্লাব বানিয়ে নিয়েছে। যাদের ভালো লাগে না, তাদেরকে তারা বের করে দেয়, আর নিজেদেরকে দ্বীনের একমাত্র ধারক-বাহক বানিয়ে নেয়।

চার ও পাঁচ নম্বর বৈশিষ্টের উদাহরণ হল সবচাইতে জোরালো। এই বৈশিষ্টগুলোর স্বপক্ষে আমাদের প্রমাণ হল মহান তাবেয়ী আবু মাজলিয রাহিমাহুল্লাহ-র সাথে তাঁর সমসাময়িক খাওয়ারিজের বিতর্ক। এই বিতর্কে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল। এই বিতর্কের ঘটনা নিম্নরূপঃ

যখনই আল-ইবাদিয়্যাহ খাওয়ারিজ (খাওয়ারিজের একটি দল) আবু মাজলিয রাহিমাহুল্লাহ-র কাছে যেতো, তারা বলতো, “আপনি কি আল্লাহ-র এই কালাম দেখেন নি? “...যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির”। (আল-মায়’ইদা, ৪৪) বলুন, এই আয়াত কি সত্য না অসত্য?

আবু মাজলিয জবাব দিলেনঃ “সত্য”

তখন তারা বললোঃ “...যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালেম”। বলুন একথা কি সত্য না অসত্য?

আবু মাজলিয জবাব দিলেনঃ হ্যা, সত্য।

তারা বললোঃ “...যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী”। এ কথা কি সত্য না?

আবু মাজলিয জবাব দিলেনঃ হ্যা, সত্য।

তখন তারা বললোঃ হে আবু মাজলিয, তবে কি তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে শাসন করছে? (এ প্রশ্নের মাধ্যমে তারা তারা সে সময়ের মুসলিম শাসকদের প্রতি ইঙ্গিত করছিল।)

আবু মাজলিয জবাব দিলেনঃ “তারা (সেসময়ের মুসলিম শাসকরা) তাদের দ্বীনের মাধ্যমে বিচার করছে, দ্বীনের ভিত্তিতে কথা বলছে, এবং দ্বীনের দিকে আহবান করছে। যদি তারা দ্বীনের কোন অংশ ছেড়ে দেয় তবে তারা জানে যে এ কাজের মাধ্যমে তারা গুনাহ করেছে।

জবাবে খাওয়ারিজরা বললোঃ না, ওয়াল্লাহী! কিন্তু আপনি তো জানেন! (অর্থাৎ শাসকরা দ্বীনের কিছু অংশ ছেড়ে দিচ্ছে এটা আপনি জানেন)

আবু মাজলিয বললেনঃ এ ব্যাপারে আমার চাইতে তোমাদের অধিকার বেশি। ইবন জারির আত-তাবারি রাহিমাহুল্লাহ-র অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আবু মাজলিয বলেছিলেনঃ

এ ব্যাপারে আমার চাইতে তোমাদের অধিকার বেশি। আমরা জানি না তোমরা কি জানো, কিন্তু তোমরা (দাবি করছো) জানো। (এখানে তিনি শাসকদের কাফির হবার ব্যাপারে খাওয়ারিজদের বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করছেন।) আর তোমরা শাসকদের সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করো না, কারণ তোমাদের তাদেরকে ভয় কর।[1]

আল্লামা শাইখ মাহমুদ শাকির রাহিমাহুল্লাহ এই বর্ণনার ব্যাখ্যায় কিছু মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

"এখানে এটাই পরিষ্কার করা হয়েছে যে, ইবাদিয়্যাহদের মধ্যে থেকে যারা প্রশ্ন করছিল, তারা চাচ্ছিল শাসকদের উপর তাকফির করতে এবং এই জন্য তারা আবু মাজলিযকে প্রশ্ন করছিল, যাতে করে তার উত্তর থেকে তারা তাকফির করার সুস্পষ্ট প্রমাণ পেতে পারে। তাদের এ রকম করার কারণ হল, এই ইবাদিয়্যাহরা শাসকের সেনাবাহিনীর সদস্য ছিল, এবং সম্ভবত তারা অবাধ্য ছিল (তাই নিজেদের অবাধ্যতাকে বৈধতা দেয়ার জন্য তারা প্রশ্ন করছিল)। অথবা তারা আল্লাহ হারাম করেছেন এমন কোন গুনাহর কাজে লিপ্ত ছিল (এবং সেই কাজের বৈধতা প্রমানের চেষ্টা করছিল)। এবং একারণেই আবু মাজলিয খাওয়ারিজ আল ইবাদিয়্যাহদের প্রশ্নের জবাবে প্রথম বর্ণনায় বলেছিলেন, যদি শাসকরা দ্বীনের কোন অংশ ছেড়ে দিয়ে থাকে তবে খাওয়ারিজ ইতিমধ্যে জানে যে শাসকরা গুনাহ করেছে। আর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেছেন, যদি শাসকরা গুনাহ করে থাকে এবং খাওয়ারিজ তা জেনে থাকে, তবে খাওয়ারিজের উচিত ছিল সেই গুনাহতে বাধা দেয়া, কারণ খাওয়ারিজরা জানতো

---

[1] জামি'উল বায়ান, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৫২-২৫৩

যে একাজ গুনাহ। যেহেতু জানা সত্ত্বেও তারা শাসককে গুনাহর কাজে বাধা দেয় নি, অতএব এর মাধ্যমে খাওয়ারিজ নিজেরা গুনাহ করেছে।[1]

সুতরাং এই বর্ণনা এবং তার ব্যাখ্যা থেকে আমরা বুঝতে পারি, শাসক সুস্পষ্ট কুফর করেছে, এটা জানার জন্য কিংবা প্রমাণ করার জন্য খাওয়ারিজ আল-ইবাদিয়্যাহ-রা প্রশ্ন করছিলনা, বরং তারা অবাধ্য হবার জন্য দালীল খুজছিলো যাতে তারা নিজেরা হারামে লিপ্ত হতে পারে। এটি হল আমাদের উল্লেখিত তৃতীয় বৈশিষ্টের প্রমাণ যে খাওয়ারিজ বৈধ এবং উপযুক্ত কারণ ছাড়া শাসকের বিরোধিতা করে। তাদের আচরনের স্বপক্ষে তাদের কাছে কোন যুক্তি বা দালীল ছিল না। এবং এই ঘটনা এবং তার ব্যাখ্যা চতুর্থ বৈশিষ্টের ব্যাখ্যা হিসেবেও প্রযোজ্য। কারণ এক্ষেত্রে তারা শাসকের কোন একটি কাজের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করছিল। আর শুধুমাত্র এই মতভিন্নতার কারণে তারা মুহূর্তের মধ্যে শাসকদের কাফির ঘোষণা উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল যেটাকে তারা কুফর মনে করেছে সেটার ভিত্তিতে তাকফির করার, যা প্রকৃতপক্ষে কুফর তার ভিত্তিতে না। এবং এধরণের মনোভাব ও আচরণ সম্পূর্ণ ভাবে অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন।

একই সাথে এ ঘটনা বিভিন্ন ভাবে খারেজিদের পঞ্চম বৈশিষ্টের প্রমাণ দেয়। তারা আয়াত সঠিক ভাবে উদ্ধৃত করেছে, কিন্তু দেখা যাক তাদের প্রয়োগের কি সঠিক কি না। তারা যেসব আয়াত কুফর আকবর সম্পর্কিত সেগুলোকে এমন কারো উপর প্রয়োগ করতে চাচ্ছিল যে কোন কুফরি করে নি, অথবা সর্বোচ্চ কুফর আকবর করেছে (এমন কুফর যা কাউকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয় না)। তাদের অবস্থানের স্বপক্ষে তারা কোন তাফসির, শার'হ কিংবা অন্য কোন প্রমাণ উপস্থাপন করে নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় তারা যা বলছিলো সে ব্যাপারে তাদের অল্পই জ্ঞান ছিল, আর যেটুকু জ্ঞান ছিল সেটুকু তারা ভয়ঙ্কর, বিকৃতভাবে ব্যবহার করছিল। আরেকটি প্রমাণ হল যে ভাবে তারা আবু মাজলিয রাহিমাহুল্লাহ-র সাথে কথা বলছিল। আবু মাজলিয রাহিমাহুল্লাহ-র প্রতি তাদের আচরণ ও মনোভাব ছিল ঘৃণা, অবজ্ঞা, হিংসা ও বিদ্বেষপূর্ণ। যখন তিনি তাদের চিন্তাধারার সাথে

---

[1] উমদাত উত তাফসির, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৫৭

একমত পোষণ করলেন না, তখন তারা আক্রমনাত্বক হয়ে উঠলো এবং আল্লাহ-র কসম করে নিজেদের অবস্থানকে দৃঢ়তা দানের ব্যর্থ চেষ্টা শুরু করলো। খারেজিরা দল হিসেবে কি রকম অমার্জিত ও উগ্রতা বোঝার জন্য এ উদাহরণই যথেষ্ট। আবু মাজলিয রাহিমাহুল্লাহ-র সাথে তাকে রক্ষা করার মতো লোকজন ছিল। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবন খাব্বাব রাহিমাহুল্লাহ-র সাথে তাকে রক্ষা করার মতো কেউ ছিল না।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের প্রমাণও এখান থেকে পাওয়া যায়। তাদের সাথে একমত পোষণ করেন না, এমন ব্যক্তির সাথে কথোপকথনের সময়, খারেজিরা তাকে কাফির, মুশরিক বা বিপদজনক গোমরাহ ব্যক্তির মতো গণ্য করে। শুধুমাত্র কথোপকথনের জের ধরে খারেজিরা আব্দুল্লাহ ইবন খাব্বার ও তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছিল এবং গর্ভস্থিত সন্তানকে পেট চিরে বের করে হত্যা করেছিল।

আবু মাজলিযের সাথে কথোপকথনের সময় তারা তাকে আক্রমণ করতে ও শারিরিকভাবে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু শাইখের আশেপাশে অন্য অনেক মানুষ থাকায় তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে তারা ব্যর্থ হয়।

তাকফিরের ব্যাপারে খারেজিদের ভুল ধারণাসমূহ

তাকফিরের ব্যাপারে কিছু নিয়মের ভুল প্রয়োগ ও অপব্যবহারের কারণে খারেজিরাসহ অন্য আরো ফিরকা গোমরাহীতে পতিত হয়েছে। তাদের সবচেয়ে মারাত্বক ভুল হল, তারা তাকফির আল মু'আইন (একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর তাকফির), তাকফির আল ইজতিহাদ (ইজতিহাদের ভিত্তিতে করা তাকফির) এবং তাকফির আন-নাস (নাস বা দালীলের ভিত্তিতে তাকফির)– এই তিনটি পৃথক বিষয়কে একত্রিত করে একটি জিনিসে পরিণত করা। তাকফির আন-নাস (সুস্পষ্ট নাস বা দালীলের ভিত্তিতে তাকফির) এর নিয়মটি আহলুস সুন্নাহ-র আক্বীদার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি, যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর সকল কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়া ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ,

"ঈমান ভঙ্গের কারণ সমূহ"-এর (নাওয়াক্বীদ আল ইসলাম) আলোচনায়ও এই নিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন। তাকফির আন-নাস এর এই নিয়মটি হলঃ

"যে মুশরিকদের কাফির ঘোষণা করে না, কিংবা তাদের কুফরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, কিংবা তাদের ধ্যানধারণা, আক্বীদা-বিশ্বাসের কুফর হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, সে নিজেও কাফির"।

খারেজিরা অত্যন্ত জঘন্যভাবে এবং বিদ্বেষপূর্ণ উপায়ে এই মূলনীতির অপপ্রয়োগ করেছিল। তারা এই মূলনীতির অর্থ এই করেছিল যে, খারেজিরা যাদের কাফির মনে করে, কোন ব্যক্তি যদি তাদেরকে কাফির মনে না করে, তবে সেই ব্যক্তিও কাফির। এটা প্রথম প্রকাশ যায় যখন খারেজিরা আলী রাদ্বীয়াল্লাহ আনহু ও মু'আউয়িআ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কাফির ঘোষণা করেছিল এবং একই সাথে আমর ইবনুল 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কাফির ঘোষণা করেছিল, কারণ তিনি প্রথম দুজনকে কাফির বলে ঘোষণা করেন নি। এটি একটি ভ্রান্ত ও বাতিল দৃষ্টিভঙ্গি যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর মূলবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটায় না।

তাকফির আন-নাসের মূলনীতির সঠিক ব্যাখ্য হল, কুর'আনে যাদেরকে কুফফার বলা হয়েছে (ইহুদি, নাসারা ও মুশরিকীন), কুর'আনের বক্তব্য জানা থাকার পরও যে ব্যক্তি তাদেরকে কুফফার বলতে অস্বীকার করবে, কিংবা তাদেরকে (কুফফারকে) মুসলিম বলে ঘোষণা করবে – সে ব্যক্তি নিজেও কাফির। যারা ফিরাউন, আবু লাহাব, ইহুদী, নাসারাদের মতো লোকদের মুসলিম বলবে তাদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য (অর্থাৎ তারাও কাফির)।

এমন ব্যক্তি যাকে কুফরের অভি্যোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে, এবং যার কুফরের ব্যাপারে নাস থেকে, কুর'আন-হাদীস থেকে সরাসরি কোন প্রমাণ আপনার কাছে নেই – সেক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য না। কারণ সেটা একটা ভিন্ন প্রেক্ষাপট। কোন ব্যক্তির কাফির হবার ব্যাপারে যদি প্রমাণ না থাকে, অথবা প্রমাণ কারো জানা না থাকে, তাহলে তার কোন অধিকার নেই উক্ত ব্যক্তিকে কাফির ঘোষণা করার জন্য একজন মুসলিমের উপর জোর খাটানোর। এমনকি মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ এবং তাঁর পূর্ববর্তী উলেমা যখন কোন কাজকে কুফর বলতেন, তখন ঐ কাজ যারা করতো তাদের সবাইকে কাফির ঘোষনা করতেন না। একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির ঘোষণা করাকে তাকফির আল-মু'আইন

বলা হয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর মতে তাকফির আর মু'আইনের কিছু অবশ্য অনুসরনীয় নির্দিষ্ট নিয়মাবলী, পদ্ধতি ও ধাপ আছে। যেমন সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ওয়া ইজমাইন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে 'দ্বাত আনওয়াত'[1] নির্দিষ্ট করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের কুফফার বলেন নি।[2] বরং তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, এরকম বলা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ-র কাছে প্রার্থনা করার শামিল। যদিও কাজ হিসেবে এটা ছিল কুফর, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তাঁদেরকে কুফফার বলেননি। কারণ সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ওয়া ইজমাইন এক্ষেত্রে শুধু এই ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু এর উপর আমল করেন নি। আরেকটি উদাহরণ হল, যখন মু'আয ইবন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শাম থেকে ফেরত আসেন।

'আবদুল্লাহ্ ইবনু আবূ আওফা রাদ্বিয়ায়ল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয রাদ্বিয়ায়ল্লাহু আনহু সিরিয়া থেকে ফিরে এসে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সিজদাহ করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"হে মু'আয! এ কী? তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গিয়ে দেখতে পাই যে, তথাকার লোকেরা তাদের ধর্মীয় নেতা ও শাসকদেরকে সাজদাহ করে। তাই আমি মনে মনে আশা পোষণ করলাম যে, আমি আপনার সামনে তাই করবো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তোমরা তা করো না। কেননা আমি যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাউকে সাজদাহ করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সাজদাহ করতে।

---

[1] দ্বাত আনওয়াত - জাহিলিয়্যাতের সময় মুশরিকদের একটি নিদিষ্ট গাছ ছিল, যার কাছে গিয়ে তারা আশীর্বাদ চাইতো এবং সেই গাছের ডালে তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে মক্কা থেকে হুনাইন যাবার সময়, একটি বড় সবুজ গাছ অতিক্রম করার সময় সাহাবারা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ওয়া ইজমাইন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম –কে অনুরোধ করেছিলেনঃ "হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমাদের জন্য একটি দ্বাত আনওয়াত স্থির করে দিন।

[2] হাদিস নং ২১৮০ তিরমিযী শরীফ এবং হাদিস নং ২১৮, মুসনাদ আহমাদ, ৫ম খন্ড দ্রষ্টব্য।

সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! স্ত্রী তার স্বামীর প্রাপ্য অধিকার আদায় না করা পর্যন্ত তার প্রভুর প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে না। স্ত্রী শিবিকার মধ্যে থাকা অবস্থায় স্বামী তার সাথে জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে চাইলে স্ত্রীর তা প্রত্যাখ্যান করা অনুচিত"।[1,2]

তাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর নীতি অনুসরণের করার জন্য তাকফির আল-মু'আইনের ক্ষেত্রে প্রেক্ষাপট ও অবস্থার সূক্ষ পার্থক্যের দিকে খেয়াল করা এবং সঠিকভাবে অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোন ব্যক্তি কবরস্থান বসে আল্লাহ-র কাছে দু'আ করে, এই মনে করে যে কবরস্থান একটি পবিত্র জায়গা, তবে তার এই কাজ হারাম এবং বিদ'আ, কিন্তু তার এই কাজ তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। কিন্তু এই একই ব্যক্তি যদি কবরে থাকা লোকদের কাছে দু'আ করে, তবে সেটা কুফর আকবর (যে কুফর ব্যক্তিকে কাফিরে

---

[1] সুনান ইবন মাজাহ, কিতাব উন-নিকা'আহ, হাদিস নং ১৮৫৩, হাদিসটি হাসান।

[2] মুয়ায রাঃ শামে দেখেছিলেন, সেখানকার লোকেরা সম্মানবশত তাদের পুরোহিত ও পাদ্রীদের প্রতি সিজদাহ করতে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি মনে করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সম্মানের অধিক যোগ্য। তাই এই সিজদাহ ইবাদাতের উদ্দেশ্যে নয়, বরং সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ছিল। এটা সেই একই ধরণের সুজুদ যা ইউসুফ আলাইহিস সালামের পিতা-মাতা এবং ভাইয়েরা নাবীর প্রতি করেছিলেন, সম্মানবশত। নিঃসন্দেহে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে কারো প্রতি সিজদাহ করা শিরক আকবর এবং কুফর যার জন্য কোন অজুহাত বা ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে বিদ'আতের এবং অজ্ঞতার কারণে কিছু করা আর আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সিজদাহ করার মধ্য পার্থক্য আছে। (এছাড়া সম্মানবশত সিজদাহ করা আগের নাবীদের আলাইহিমুস সালাম শারীয়াহতে জায়েজ হলেও, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট প্রেরিত শারীয়াহতে একে জায়েজ রাখা হয় নি। যে কারণে আলোচ্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন "...তোমরা তা করো না। কেননা আমি যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাউকে সিজদাহ করার নির্দেশ দিতাম..."। এখানে মানা করা হয়েছে, ""...তোমরা তা করো না।" এবং বলা হয়েছে "যদি দিতাম" অর্থাৎ দেওয়া হয় নি। যদি আল্লাহ-র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেই সম্মানবশত সাজদাহ করা জায়জে না হয়, তাহলে আর কার উপলক্ষে তা জায়েজ হতে পারে? আল্লাহ-র বান্দাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা অধিক সম্মানিত? তাই ইবাদাতের জন্য তো বটেই সম্মান প্রদর্শনের জন্যও কাউকে সিজদাহ করা হারাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ বিধানই বলবৎ থাকবে।)

পরিনত করে), এবং এই কাজের জন্য কোন অজুহাত অবশিষ্ট থাকে না। একইভাবে কোন জায়গাকে পবিত্র মনে করে সেখানে আল্লাহ-র প্রতি সিজদাহ করা হারাম এবং বিদ'আ। কিন্তু যদি সে জায়গায় অবস্থিত বা থাকা মানুষদের (ওলী-আউলিয়া-পীরবুজুর্গ) প্রতি সিজদাহ করা তবে সেটা কুফর আকবর।

একই কথা সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যে আল্লাহ-র অজ্ঞতাবশত কিংবা ভুলবশত ব্যাপারে কোন কুফর উক্তি (blasphemy) করে। এরকম ব্যক্তিকে ইসলামের গন্ডির থেকে বেরিয়ে যাওয়া কাফির হিসেবে গণ্য করা হবে না। নিম্নোক্ত হাদীস কুদসি থেকে আমরা এর স্বপক্ষে প্রমাণ পাই। আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেনঃ

"বান্দা যখন আল্লাহর নিকট তাওবা করে তখন তিনি ঐ ব্যক্তি থেকেও অধিক খুশী হন যে মরু-বিয়াবানে নিজ সাওয়ারীর উপর আরোহিত ছিল। তারপর সাওয়ারিটি তার থেকে পালিয়ে গেল। আর তার উপর ছিল তার খাদ্য ও পানীয়। এরপর নিরাশ হয়ে সে একটি বৃক্ষের ছায়ায় এসে শুয়ে পড়ে এবং তার সাওয়ারী সমন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় হঠাৎ সাওয়ারীটি তার সামনে এসে দাড়ায়। তখন (অমনিই) সে উহার লাগাম ধরে ফেলে। তারপর সে আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠে, "হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব"। আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করে ফেলেছে।"[1]

হে আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব – এরকম বলা নিঃসন্দেহ কুফর। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ব্যক্তি এই উক্তির মাধ্যমে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় নি। কেন? কারণ সে একথা উত্তেজনার সময় ভুলবশত বলে ফেলেছিল। ইসলামে একে বলা হয় 'কুফর আল আখতাআ' (ভুলবশত করা কুফর)। অনেক সময় মানুষ তীব্র দুঃখ, রাগ কিংবা আনন্দের বশবর্তী হয়ে ভুলবশত এরকম অনেক কথা বলে ফেলে। যদি এরকম কোন পরিস্থিতিতে ভুলবশত কোন ব্যক্তি এরকম কিছু বলে ফেলে তবে সেটা তাকে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় না এবং এ কথার জন্য তাঁকে কাফির গণ্য করা হয় না।

---

[1] সাহিহ মুসলিম, কিতাব উত-তাওবাহ, হাদিস ৪৯৩২

এরকম অসংখ্য দালীল এবং প্রমাণের ভিত্তিতে উলেমায়ে ইসলাম কোন কাজকে কুফর বলা আর যে সে কাজটি করছে, তাকে কাফির বলার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এরকম আরেকটি উদাহরণ হল, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেই হাদীস যেখানে বারবার মদ্যপানকারী একজন ব্যক্তির কথা এসেছে। এই ব্যক্তিকে তৃতীয় বা চতুর্থবারের মতো মদ্যপানের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। এসময় একজন সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উক্ত ব্যক্তিকে অভিশাপ দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সেই সাহাবাকে মানা করেন এবং বলেনঃ তাকে এরকম বলো না। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে"।[1] অথচ আমরা জানি 'আমভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদের সাথে সম্পর্কিত দশটি কাজের উপর অভিশাপ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে একজন ব্যক্তি যে এই দশটি অভিশপ্ত কাজের একটিতে লিপ্ত ছিল, খাস ভাবে তাঁকে অভিশাপ দিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানা করেছেন। এটি এবং এর মতো কুর'আন ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত আরো অনেক দালীল এবং এ বিষয়ে সাহাবাদের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা ইজমাইন এই আয়াত এবং হাদীস গুলোকে কিভাবে বুঝেছিলেন, তার উপর ভিত্তি করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আ তাকফিরের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধক বা অন্তরায় স্থির করেছে।

উক্ত উৎসসমূহের প্রমাণের আলোকে প্রাপ্ত এই প্রতিবন্ধকগুলো একজন মুসলিমকে কাফির ঘোষণা করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের কুফরের ব্যাপারে হুজ্জাহ (সুস্পষ্ট প্রমাণ) প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর কারণ হল, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর দৃস্টিভঙ্গি হলে খারেজিদের বিপরীত। খারেজিরা ধরে নেয়, সকলেই (এমনকি মুসলিমরাও) কাফির যতোক্ষন না বিপরীত (অর্থাৎ মুসলিম হবার) প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ খারেজিদের চিন্তার সূচনা হয়, সবাই কাফির এটা ধরে নিয়ে। আহলুস সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গি হল, যারা নিজেদের মুসলিম দাবি করে, আমরা তাদের মুসলিম বলে ধরে নেই, যতক্ষন না বিপরীত (অর্থাৎ কাফির হবার) প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, তার সাথে এ অবস্থানই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

---

[1] সাহিহ আল বুখারি, খন্ড ৮, হাদিস ৭৭১

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর উলেমা তাকফিরের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রতিবন্ধকগূলোর ব্যাপারে একমত হয়েছেনঃ

১। যে কাজের জন্য ব্যক্তিকে কাফির বলা হচ্ছে, সে কাজটিকে সন্দেহাতীতভাবে কুফর বলে প্রমাণিত হতে হবে। শুধুমাত্র মানুষ কাজটাকে কুফর মনে করলে হবে না।

২। ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্যের অধিকারী হতে হবে। (অর্থাৎ মানসিক ভারসাম্যহীন, পাগল ব্যক্তিকে তাকফির করা যাবে না)

৩। যে কুফর ব্যক্তিটি করছে সেই কাজের কুফর হওয়া সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকতে হবে, অথবা জ্ঞান অর্জনের উপায় থাকতে হবে। (অর্থাৎ, ব্যক্তি যদি কুফর করে, কিন্তু সেই কাজের কুফর হওয়া সম্পর্কে সে জানতো না, এবং জানার কোন উপায়ই তার কিছু ছিল না, এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার অজ্ঞানতা এবং জ্ঞান লাভের উপায় না থাকা, তার উপর তাকফির করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে।)

৪। শুধুমাত্র ইচ্ছাকৃত কাজের জন্য তাকফির করা যাবে।

৫। যদি ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে থাকে তবে সেটা প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে।

৬। শুধুমাত্র ব্যক্তির স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, তার উপর অপর কারো জোর খাটানো ব্যতীত করা কাজের উপর তাকফির করা যাবে।

৭। এছাড়া ব্যাক্তি যদি কোন আয়াত বা হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা অনুসরণের কারণে কোন কুফর কাজ করে থাকে, এই ভেবে যে এর মাধ্যমে আল্লাহকে খুশি করছে, তবে সে ক্ষেত্রে এটি তার উপর তাকফিরের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট, কারণ যারা এরকম করছে তারা তা করছে তাউয়ীল বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে। একারণে, এরকম ক্ষেত্রে কাজটি কুফর হলেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আ ব্যক্তির উপর তাকফির করে না। এরকম বেশ কিছু কারণ আছে। অনেক মানুষই ভন্ড পীর এবং অসৎ 'আলেমদের কারণে সঠিক ব্যাখ্যা জানা এবং তা অনুযায়ী আমল করা থেকে দূরে সরে যায়। অনেক ক্ষেত্রে এসব ভন্ড পীর এবং আলেমরা এমনি এসব ভুল ব্যাখ্যা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আরোপ করে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

এ কারনেই আমাদের সময়ে এই নীতিকে পুনরুজ্জীবিতকারী মুহাম্মাহ ইবন আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সমসাময়িক সেসব লোককে কুফফার বলেন নি যারা 'ক্বুবলাত আল কাওওয়াজ' নামক স্থানে আল্লাহ-র কাছে দু'আ করতো (অর্থাৎ তারা এ জায়গাকে বিশেষ ভাবে পবিত্র এবং দু'আ করার স্থান মনে করতো)। তিনি এই সত্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে সে সময়ের অনেক পীর ও 'আলেম জাল হাদীস তৈরি করে মানুষের কাছে এধরণের বিদ'আকে হালাল এবং সওয়াবের কাজ হিসেবে প্রচার করেছিল।

তাকফিরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে যেমন ৭টি নিয়ম আছে, ঠিক তেমনি এর বিপরীত ৭টি শর্তও আছে।

১। যে কাজের জন্য তাকফির করা হচ্ছে তা সন্দেহাতীতভাবে কুফর,

২। ব্যক্তি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ,

৩। সে তার এই কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখে ও সে সজ্ঞানে এই কাজ করেছে,

৪। সে স্বেচ্ছায় এই কাজ করেছে, ভুলবশত না,

৫। ব্যক্তি সজাগ আছে। সে নিদ্রা কিংবা বা তন্দ্রামগ্ন অথবা ঘুমত অবস্থায় এ কাজ করে নি,

৬। কোন প্রকার জোড় জবরদস্তির বশবর্তী হয়ে না, বরং সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় সে এই কাজ করেছে,

৭। নিজের কুফর আমলের পক্ষে তার কোন গ্রহণযোগ্য তাউয়ীল[1] নেই।[2]

---

[1] তাউয়ীল অর্থ কুর'আন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ব্যাখ্যা

[2] এ বিষয়ে আরো জানার জন্য শায়খের "Allah's governance on earth" – "দুনিয়াতে আল্লাহ-র শাসন" শীর্ষক বই বা অডিও দেখতে পারেন।

যদি এইসবগুলো শর্ত পূরণ হয় শুধুমাত্র তখনই তাকফির আল মু'আয়্যিন (কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির ঘোষণা করা) করা যাবে।

সুস্পষ্ট কুফর এবং সুস্পষ্ট কাফিরের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তাই এরকম বলা যেতে পারে যে, সুস্পষ্ট কুফর করা সকল ব্যক্তিই কাফির না। তবে সকল কাফির নিঃসন্দেহে স্পষ্ট কুফর সংঘটনকারী।

সংক্ষেপে এই হল তাকফিরের মূলনীতি।

যা কিছু এই নির্ধারিত সীমার বাইরে যাবে সেটা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর পক্ষ থেকে না, এবং আহলুস সুন্নাহ তা থেকে মুক্ত। খারেজিদের বিধ্বংসী আচরণ ও পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য আমাদের উচিৎ উপরোক্ত আলোচনা গভীরভাবে অধ্যায়ন করা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

তাকফিরের ব্যাপারে সঠিক ধারণা ও ব্যাখ্যাঃ

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ও দলের নিজেদের মুসলিম দাবি করা এবং ইসলাম নিয়ে করা বিভিন্ন দাবির প্রেক্ষিতে অসংখ্য উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। এসব বিতর্ক, যুক্তি-পাল্টা যুক্তি এবং অনান্য আরো কিছু প্রেক্ষাপটের ফলশ্রুতিতে কেউ কেউ, যথোপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপন ছাড়াই অনেককে কাফির ঘোষণা করেছে। যার ফলে আরেক দল বিভ্রান্ত হয়ে সবাইকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবং যেসব ব্যক্তি এবং দলের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, তাদের যে আদৌ ভুল-ত্রুটি হয়েছে এবং এসব ভুলত্রুটির প্রভাব যে তাদের ঈমানের উপর পড়তে পারে, তাই এই দ্বিতীয় দলের লোকজন মানতে রাজি না। এরকম বিভ্রান্তি ও বিহ্বলতা মূলত সৃষ্টি হয়েছে তাকফিরকে ঘিরে।

তাকফির অর্থ হল, কাউকে কুফর আকবর (এমন কুফর যা কাউকে কাফিরে পরিণত করে) সংঘটনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা। তাকফির কোন মুসলিম ব্যক্তির উপর করা যেতে পারে, কোন অমুসলিমের উপর করা যেতে পারে, আবার এক দলের লোকের উপর (সম্মিলিত

ভাবে) করা যেতে পারে। অমুসলিমদের উপর তাকফিরের উদাহরণ হল, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই কথাঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ

"আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম"। (সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, আয়াত ৬)

এখানে আমরা এমন একটি আয়াত পাচ্ছি যেখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইহুদী, নাসারা এবং মুশরিকদের কুফফার[1] বলেছেন।

তবে মুসলিমের উপর তাকফিরের ব্যাপারটা ভিন্ন। এটা তখন ঘটে যখন একজন মুসলিম কোন কুফর আমলের মাধ্যমে মুরতাদে পরিণত হয়। এর উদাহরণ হল এই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই কালামঃ

[1] এই আয়াতে আধুনিক যুগে প্রচারিত আরেকটি বিদ'আর উত্তরও আছে। এই বিদ'আর প্রচারকরা দাবি করে ইহুদী ও নাসারারা মুসলিম। আমাদের সময়ে এই বিদ'আকে পুনরোজ্জীবিত করার জন্য দায়ী অ্যামেরিকান মুসলিমদের একটি দল যাদের নেতৃত্ব দিয়েছে ওয়ালিস দ্বীন মুহাম্মাদ নামে একজন ব্যক্তি। ওয়ালিস দ্বীন হল নেশান অফ ইসলামের নেতা এলাইজাহ মুহাম্মাদের ছেলে। এই ধারণা এবং এরকম আরো কিছু ধারণা ব্যবহার করে ওয়ালিস দ্বীন "আন্তঃধর্মীয় আন্দোলন" বা Interfaith Movement শুরু করে যার একটি দর্শন হল ইহুদী ও নাসারারা আমাদের ভাই মনে করে তাদের সাথে একত্রিত হয়ে তাদের বিভিন্ন বিশ্বাস ও ধারণা নিয়ে কাজ করা। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সে কুর'আনের কিছু আয়াতকে গোপন এবং অন্যান্য কিছু আয়াতের নিজের সুবিধামতো ব্যাখ্যা করেছিল। এভাবে সে তার অজ্ঞ ও অন্ধ অনুসারীদের বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, এবং মনমতো নানা ধারণা প্রচার করেছিল।

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَـٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ () لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ

"..তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, তোমরা তো কাফির হয়ে গিয়েছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার"। (আত তাওবাহ, ৬৫,৬৬)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেছেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ ...

"হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে (ইরতাদ), অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে..." (আল মায়'ইদা, ৫৪)

তবে এটি শুধুমাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এমন না। সমষ্টিগত ভাবে এক দল মানুষ ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদে পরিণত হতে পারে, যেমন নিম্নোক্ত হাদিসে আমরা দেখতে পাইঃ

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ক্রন্দন করছিলেন এবং বলছিলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয় মানুষ দলে দলে আল্লাহ-র দ্বীনে (ইসলামে) প্রবেশ করবে এবং দলে দলে বের হয়ে যাবে।[1]

---

[1] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ১৪,৩৩৪

তাকফিরের প্রকারভেদ এবং তাদের মধ্যকার পার্থক্যঃ

তাকফিরের ব্যাপারে খারেজিদের বিচ্যুতি এবং বাড়াবাড়ির প্রধান কারণ হল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তাকফিরকে একত্রিত করে, একটি নিয়ম বানিয়ে নেয়া। উম্মাহ যাতে এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির স্বীকার না হয় সেজন্য এই ভুলের উত্তর দেয়া এবং সংশোধন করা অত্যন্ত জরুরি। এ কারণে এ পরিচ্ছেদে আমরা তাকফিরের বিভিন্ন প্রকার নিয়ে আলোচনা করবো।[1]

১। তাকফির আন-নাস (সুস্পষ্ট দালীলের ভিত্তিতে তাকফির)- এ রকম তাকফির করা হয় সুস্পষ্ট দালীলিক প্রমানের ভিত্তিতে, তাকফিরের নিয়মাবলী প্রয়োগ করার পর। এর একটি উদাহরণ হল, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই বক্তব্যঃ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ

"আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে" (সূরা লাহাব, আয়াত ১)

এই আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা, ইসলামবিদ্বেষী আবু লাহাবকে সন্দেহাতীত ভাবে কাফির ঘোষণা করেছেন। যদি কেউ দাবি করে, আবু লাহাব কাফির না বরং সে মুসলিম, তবে এই ব্যক্তিকে কাফির ঘোষণা করা যাবে। তবে, এই ব্যক্তিকে তাকফির করার আগে তাকফিরের প্রতিবন্ধক ও নিয়মাবলী তার উপর প্রয়োগ করতে হবে। হতে পারে যে সে একজন নও মুসলিম এবং সূরা লাহাবের এই আয়াতটির ব্যাপারে সে জানে না। কিংবা হতে পারে সে পাগল বা মানসিক ভারসাম্যহীন। যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে তার উপর তাকফির করা যাবে না। তবে যদি কোন প্রতিবন্ধক তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয় এবং তাকফিরের শর্তসমূহ তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তবে তাকে কাফির ঘোষণা করতে হবে। এবং কেউ এর বিরোধিতা করতে পারবে না। এধরনের তাকফির দুইজন ব্যক্তির মধ্যে হয় না, অর্থাৎ একজন ব্যক্তি

[1] তাকফিরের বিভিন্ন প্রকারভেদ নিয়ে আরো জানার জন্য পড়ুন "তাকফিরের ব্যাপারে সতর্ক হোন"

আরেকজনের উপর তাকফির করছে, ব্যাপারটা এমন না। বরং ব্যাপারটা যে ব্যক্তি কুফর করেছে তার এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মধ্যে। কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর কিতাবে, আবু লাহাবকে নাম ধরে কাফির ঘোষণা করেছেন।

২। তাকফির আল ইজতিহাদ (ব্যক্তিগত বিবেচনার উপর ভিত্তি করে কাউকে কাফির ঘোষণা করা)- এরকম তাকফির করা হয়, কুর'আন থেকে এমন কোন একটি বা একাধিক আয়াত নেয়া হয়, যেগুলোর দ্বারা কোন কুফর কাজকে নির্দেশ করা হয়।

যেমন, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেনঃ

وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَـٰفِرُونَ

"...যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের"। (আল মায়'ইদা, ৪৪)

এক্ষেত্রে তাকফির আল ইজতিহাদের জন্য প্রথমে এই আয়াতকে গভীরভাবে অধ্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা হয়। সতর্কতার সাথে এই বিষয়ক সকল আয়াত অধ্যায়ন ও বিশ্লেষণের একজন ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনঃ "বর্তমান সময়ে যেসকল শাসক আল্লাহ্ যা নাযিল করেছে তদানুযায়ী শাসন করে না, তারা কাফির।"

এই ধরণের তাকফিরের ব্যাপারে কিছু নিয়ম এবং শর্তের উপস্থিতির কারণে, মানুষ ভিন্ন মত পোষণ করতে পারে। এছাড়া এক্ষেত্রে মানুষের মাঝে এজন্য ভিন্ন মত হতে পারে যে, এই বিষয়ে কুফরের বিভিন্ন ধাপ ও মাত্রা আছে। যেমন এক্ষেত্রে কুফরের একটি ধাপ হল সেই ব্যক্তির কুফর যে মাঝে মধ্যে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা অনুযায়ী শাসন করে না। এরকম ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয় নি, তবে নিঃসন্দেহে সে কবীরা গুনাহ করেছে। তার এই কুফরকে বলা হয় কুফর দুনা কুফর (কুফর, যা কুফরের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের), যেমনটা সাহীহ রেওয়ায়েতে ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে, যদি কোন শাসক সর্বদাই আল্লাহ্ যা নাযিল করেছে তা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসন করে, সে নিঃসন্দেহে

কুফর আকবর করেছে এবং কাফিরে পরিণত হয়েছে – এবং ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও ইবন মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরেকটি বর্ণনা থেকে এটি প্রমাণিত।

৩। তাকফির আল মু'আয়্যিন (নাম ধরে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির ঘোষণা করা)- এরকম তাকফিরের ক্ষেত্রে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে তাকে কাফির ঘোষণা করা হয়। তবে তাকফির আল মু'আয়্যিন করার আগে অবশ্যই তাকফির আল-ইজতিহাদের ধাপ পার হয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে যদি আমরা পূর্বোক্ত, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী শাসন না করার কারণে শাসকের কাফির হবার উদাহরণের দিকে তাকাই, এবং কোন নির্দিষ্ট শাসকের ব্যাপারে তাকফিরের জন্য এটা প্রয়োগ করি, তবে উভয় ক্ষেত্রে একই ইজতিহাদি নীতি অনুসৃত হবে। অর্থাৎ ব্যক্তির উপর তাকফির করার আগে, প্রথমে আয়াতের ভিত্তিতে বিবেচ্য কাজের কুফর আকবর হবার ব্যাপারে ইজতিহাদ করতে হবে। যদি ইজতিহাদ করার পর দেখা যায়, কুফর আকবর সংঘটিত হয়েছে, তবে পুনরায় আবার সতর্কতার সাথে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া শুরু থেকে পরীক্ষা করতে হবে, যাতে করে সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়, আলোচ্য ব্যক্তির ব্যাপারে আয়াত এবং কুফরের অভিযোগ দুটোই প্রযোজ্য।

তারপর তাকফিরকারী উক্ত ব্যক্তির তাকফির করবে, উদাহরণস্বরূপ, সে বলতে পারেঃ প্রেসিডেন্ট "ক", কিংবা বাদশাহ "খ" একজন কাফির, অমুক অমুক আয়াতের আলোকে, কারণ সে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী শাসন করে না। যেহেতু তাকফির মু'আয়্যিন ইজতিহাদের ভিত্তিতে করা হয়, তাই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই 'আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতে পারে। যেমন, তাউয়ীলের ভিত্তিতে একজন 'আলেম হয়তো কোন ব্যক্তিকে তাকফির না করতে পারেন, উক্ত ব্যক্তির অজ্ঞতা এবং দালীল-প্রমাণ বোঝার অক্ষমতার কারণে। আবার আরেকজন 'আলেম হয়তো উক্ত ব্যক্তিকে ছাড়া দেবেন না। যেমনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগকারীর ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ-র মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল। ইচ্ছাকৃত ভাবে সালাত ত্যাগকারীকে ইমাম আহমাদ সম্পূর্ণভাবে কাফির আখ্যায়িত করেছিলেন, কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ভিন্ন মত দিয়েছিলেন। এধরণের তাকফিরের ক্ষেত্রে অন্য কেউ ইজতিহাদ গ্রহণ করতে পারেন, এবং তার ভিত্তিতে তাকফির

করতে পারেন, আবার কেউ চাইলে এই ইজতিহাদ অনুযায়ী তাকফির করা থেকে বিরত থাকতে পারেন, এবং যে ব্যক্তির কুফর নিয়ে বিবেচিত হচ্ছে তাকে ছাড় দিতে পারেন।

তাকফিরের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর নীতিঃ

সাম্প্রতিককালে, আমরা এমন অনেক বিতর্ক এবং আলোচনা দেখেছি, যেখানে মতপার্থক্যের কারণে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে কুফফার ঘোষণা করছে। যখনই এরকম কোন আলোচনা বা বিতর্ক আয়োজন করা হয়েছে তা শেষ পর্যন্ত তাকফির অথবা ফিতনার মাধ্যমে শেষ হয়েছে। এটা এমন এক ব্যাধি যার দ্বারা যুগে যুগে খারেজিরা আক্রান্ত হয়েছে। দ্বীনের কোন মূলনীতির ব্যাপারে যখনই কোন মতপার্থক্য দেখা গেছে, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের সাথে আলোচনার বদলে খারেজিরা তখন তাকফির করাকে বেছে নিয়েছে। এ কারণে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর মতানুযায়ী, বিতর্ক ও মতবিরোধের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় সঠিক পদ্ধতি আমরা এখানে তুলে ধরতে চাই। এ ব্যাপারে আমরা ইমাম আল 'আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন ইদ্রিস আশ-শাফে'য়ী রাহিমাহুলাহ ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ-র মধ্যে যে বিতর্ক হয়েছিল সেটাকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করবো।

এ বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ ভাবে সালাত ত্যাগ করেছে তার ব্যাপারে কি হুকুম হবে। এটা উম্মাহর ইতিহাসের বিখ্যাত বিতর্কগুলোর একটি। বিতর্কে ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ, নিম্নোক্ত হাদিসটির আলোকে অবস্থান গ্রহণ করেন, এই হাদিসটি তিনি তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেনঃ

"যে সালাত ত্যাগ করে সে কাফির"।

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ এরই সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আরেকটি হাদিস পেশ করেন যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

'যে সালাত ত্যাগ করে, সে মুশরিক"।

এই দালীলসমূহের আলোকে তিনি এই অবস্থান গ্রহণ করেন যে, কোন ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ ভাবে সালাত ত্যাগ করে, তবে সে কাফির। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ-র এই বক্তব্যের জবাবে ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইদ্রিস আশ-শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ "যদি এরূপ ব্যক্তি কাফির হয়, তবে পুনরায় ইসলামে ফেরত আসার জন্য তার কি করতে হবে?"

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সে ব্যাক্তির পুনরায় শাহাদাহ গ্রহণ করতে হবে"

তখন ইমাম শাফে'য়ী এই যুক্তি উথাপন করেন যে, উক্ত ব্যক্তি তো কখনো শাহাদাহ প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করে নি এবং সে এখনো বিশ্বাস করে আল্লাহ্, লা-শারীক এবং একমাত্র ইল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাসূল। অতএব, সে এখনো মুসলিম (কাফিরে পরিণত হয় নি)। বিতর্ক শেষে ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ তাঁদের নিজ নিজ মতের উপর অটল থাকেন।[1]

---

[1] প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ সঠিক ছিলেন এবং তিনি অধিকতর শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট দালীল উথাপন করে প্রমাণ করেছিলেন যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে সালাত ত্যাগ করে সে কাফির। তবে যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এরকম একজন ব্যক্তি কিভাবে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসবে, তখন তাঁর পক্ষ থেকে সঠিক উত্তরটি দেয়া হয় নি। এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হল, ইসলামের ফেরত আসার জন্য ঐ ব্যক্তিকে প্রথমে তাওবাহ করতে হবে এবং সালাত আদায় করা শুরু করতে হবে। 'আলেমদের মধ্যে এই জ্ঞানটি প্রসিদ্ধ যে, যখন কোন ব্যক্তি একা বা একাধিক কাজের কারণে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, তখন ইসলামে ফেরত আসতে হলে, (তাওবাহ করার পাশাপাশি) এই ব্যক্তিকে ঐ সকল কাজ সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করতে হবে, যেগুলোর কারণে সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে না এবং নিজে আইন প্রণয়ন করে, সে কুফর ও শিরক করেছে। তাই যে এরকম কোন কাজ করেছে সে একজন মুশরিক ও কাফির। যদি সে ইসলামে ফেরত আসতে চায় তাহলে হাজ্জ-উমরাহ করা, কিংবা মাসজিদ বানানো তার কোন কাজে আসবে না। কারণ এসবের কারণে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় নি। বরং তার ঐ কুফর কাজের ব্যাপারে তাওবাহ করতে হবে যা তাকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দিয়েছে, এবং আর কখনো ঐ কাজ না করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এভাবে যে ব্যক্তির যে কুফর কাজ তাকে মুরতাদে পরিণত করেছে তাকে সেটার ব্যাপারে তাওবাহ করতে হবে এবং সেই কাজ থেকে বিরত হতে হবে। সে ইসলাম ত্যাগ করার সময় যে দরজা ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাকে সেই দরজা মেরামত করতে হবে। বিপদের বিষয় হল, আজকের শাসকরা আমাদের বোকা বানাচ্ছে। তারা নানা কুফর এবং শিরকি কাজ করে, এবং যখন সাধারণ মানুষের বাপারে তাদের ঈমান নিয়ে প্রশ্ন জাগে, তখন তারা গিয়ে হাজ্জ বা উমরাহ করে আসে। আর তারপর যেসব

এই বিতর্ক থেকে বেশ কিছু শিক্ষনীয় বিষয় আছেঃ

১। সত্যের বাস্তবতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক শক্তিশালি দালীল, সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার এবং গুরুত্ব পাবার দাবিদার। সবসময় সবচেয়ে শক্তিশালী দালীলের অনুসরণ করতে, তা যে ব্যক্তিই উপস্থাপন করুক না কেন। আলোচ্য বিতর্কের ক্ষেত্রে, ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ সর্বাধিক শক্তিশালী দালীল উপস্থাপন করেছিলেন। তাই, এ ক্ষেত্রে তাঁর অভিমত সত্যের অধিক নিকটবর্তী।

২। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মতবিরোধ হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ, তাঁর পেশকৃত দালীলসমূহেরর সাথে ভিন্নমত পোষণের কারণে একবারও ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহকে কাফির বলেন নি। একইভাবে, তাঁর উত্থাপিত দালীলসমূহের সাথে ভিন্নমত পোষণের কারণে ইমাম শাফে'য়ীও, ইমাম আহমাদকে কাফির ঘোষণা করেন নি। কেন এই বিষয়টি এতোটা গুরুত্বপূর্ণ? কারণ, আজ আমরা ঠিক এই অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছি। আজকে এমন কিছু লোক এবং দলকে দেখা যাচ্ছে যারা, তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণের কারণে, কুর'আনের আয়াতের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে, তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণকারীদের কাফির ঘোষণা করছে। হয়তো তারা কোন একটি 'আম দালীল উপস্থাপন করছে। যদি আপনি এই দল বা ব্যক্তিদের পেশকৃত দালীলের ব্যাখ্যার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন, তবে তারা নির্দ্বিধায় আপনাকে কাফির ঘোষনা করছে।

৩। ইমাম আহমাদ তাকফিরের ব্যপারে তাঁর অবস্থানে অনড় থাকার কারণে, ইমাম শাফে'য়ী তাঁকে খারেজি আখ্যায়িত করেন নি। আর ইমাম আহমাদ, ইমাম শাফে'য়ীকে তাঁর অবস্থানের

সাধারণ মানুষ এই শাসকদের ঈমান নিয়ে সন্দেহ করছিলো, তারা শাসকদের প্রশংসা ভরে আবার গ্রহণ করে নেন। কিন্তু এই হাজ্জ বা উমরাহ তাদের কুফরি বা শিরক থেকে তাদের মুক্ত করে না, কারণ হাজ্জ বা উমরাহ না করার কারণে তারা মুরতাদে পরিণত হয় নি, তারা মুরতাদে পরিণত হয়েছে তাদের কুফর ও শিরকি আমলের জন্য। যতক্ষণ না, যে কারণে তারা মুরতাদে পরিণত হয়েছে, তারা সেটার সংশোধন করছে, ততোক্ষণ তারা মুরতাদ বলেই গণ্য হবে।

জন্য মুরজি'আ[1] আখ্যায়িত করেন নি। ইমাম আহমাদ বলেন নি– যেহেতু আপনি একজন কাফিরকে কাফির বলেন নি, তাই আপনি কাফির। এই বিতর্কে যে বিচক্ষণতা প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে। এই দুজন মহান ইমাম, মতপার্থক্যের কারণে একে অপরকে দোষারোপ করেন নি, এবং বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেন নি। কারণ এখানে যে তাকফির প্রয়োগ করা হচ্ছে তা হল একজন ব্যক্তির ইজতিহাদের ভিত্তিতে করা তাকফির। যে হুকুমের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করা হচ্ছে তা 'আম, কিন্তু দুজন ব্যক্তির ইজতিহাদে পার্থক্য হতেই পারে। যিনি ইজতিহাদ করছেন তাঁর সামনে থাকা শর্ত ও এবং প্রমানের ভিত্তিতে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তাই এক্ষেত্রে পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক।

৪। এক্ষেত্রে দুজন ইমামই তাকফির আল-ইজতিহাদের কথা বিবেচনা করেছেন। তবে ইমাম শাফে'য়ীর কাছে মনে হয়েছে কুর'আন ও হাদিসে উল্লেখিত হুকুম সালাত ত্যাগকারী আলোচ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। ইমাম আহমাদের কাছে মনে হয়েছে এই হুকুম অবশ্যই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ থেকে বোঝা যায় তাকফির আল ইজতিহাদের ক্ষেত্রে দুজন ব্যক্তিরে মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু তার মানে এই না যে তাদের একজন খারেজি, আরেকজন মুরজি'আ অথবা বিদ'আতি, অথবা কাফির। বরং এর অর্থ হল হয়তো একজনের কাছে, অপরজন যে সিদ্ধান্তে পৌছেছে তাতে পৌঁছানোর মতো যথেষ্ট দালীল-প্রমান নেই। কিংবা তাঁদের একজনের অপরজনের চাইতে আলোচ্য বিষয়ে অধিক জ্ঞান রয়েছে যে কারণে তিনি

---

[1] এরা হল ঐসব লোক যারা ঈমান ও আমলের মধ্যে সম্পর্ক স্বীকার করে না। আর তারা বলে যে আমাদের শুধু তাসদীক্ব –এর উপর নির্ভর করতে হবে। তাসদীক্ব অর্থ সংবাদ (অর্থাৎ, মুরজি'আদের বক্তব্য হল, কোন ব্যক্তিকে আপনি যদি স্পষ্ট শিরক বা কুফরে লিপ্ত হতে দেখেন কিন্তু যদি সে মুখে বলে সে মুসলিম, অর্থাৎ তার ব্যাপারে আপনি এই সংবাদ পান যে সে মুসলিম, তবে আপনি তাকে এই সংবাদের উপর ভিত্তি করে মুসলিম গণ্য করবেন। যে সুস্পষ্ট শিরক বা কুফর আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন তা আপনি গণ্য করবেন না।) মুরজি'আরা কুর'আনের ঐ সব আয়াতকে অস্বীকার বা নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করবে, যেসব আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যারা শারীয়াহতে পরিবর্তন সাধন করবে তারা কুফফার। এবং আমলের ক্ষেত্রে এমন অনেক কুফর আছে যেগুলো করার কারণে একজন ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। এ ব্যাপারে আমাদের বিশ্লেষণের জন্য দেখতে পারেন The Murji'a (At-Tibyan)

তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনড় আছেন। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ-র ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছিল। তাঁর মতের পক্ষে অধিক সংখ্যক ও অধিক শক্তিশালী দালীল ছিল, এবং তিনি ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহর চাইতে বাস্তবতাকে সঠিকতর ভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যদিও ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহর শিক্ষক।

৫। দ্বীনের কোন একটি বিষয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের কারণে কাউকে মুরজি'আ, খারেজি বা কাফির বলা যাবে না। কারণ দালীলের ক্ষেত্রে যে নীতিমালা ও নিয়মাবলী প্রয়োগ করে উভয় পক্ষ নিজ নিজ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, সেগুলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর মুলনীতি ও নিয়মাবলী। তাই 'আম আয়াতকে দালীল হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে, সে যে কাজকে কুফর মনে করছে সেটাকে কুফর মনে না করার কারণে, তার অধিকার নেই অপর ব্যক্তিকে কাফির ঘোষণা করার। এরকম করাটাই হল খারেজিদের পদ্ধতি। তাকফির আল-ইজতিহাদ এবং তাকফির আল-মুআ'য়্যিনের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ-র পদ্ধতি হল সব দালীল বিবেচনা করা এবং যদি কোন মতপার্থক্য দেখা দেয়, তবে তা বিশ্লেষণ করা। এবং দুটি অবস্থানের মধ্যে যেটি সত্যের অধিক নিকটবর্তী, সেটাকে গ্রহণ করা এবং প্রয়োগ করা। তবে তাকফির আন-নাসের ক্ষেত্রে কোন মতবিরোধ নেই, কারণ তা সুস্পষ্ট দালীল দ্বারা সুপ্রমাণিত, যেমন; ইহুদী-নাসারারা কুফফার, আবু লাহাব কাফির, ফির'আউন কাফির ইত্যাদি। এক্ষেত্রে ইজতিহাদের কোন সুযোগ নেই। যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, কুর'আনে নাম উল্লেখ করে কোন ব্যক্তি বা দলকে স্পষ্টভাবে কাফির বলেছেন তখন সেক্ষেত্রে দ্বিমত করার কোন সুযোগ নেই। তাই এক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আ কখনো মতবিরোধ করে না।

ঈমানের বৈশিষ্টসমূহের ব্যাপারে খারেজিদের ভ্রান্ত ধারনাঃ

ঈমান ও ঈমানের বৈশিষ্টসমূহের ব্যাপারে খারেজিদের ধারণা সম্পর্কে আলোচনাও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এসব ভ্রান্ত ধারণাসমূহের উপর ভিত্তি করেই তারা ইসলামের ব্যাপারে তাদের ভুল এবং গুলুহ ও গোমরাহিতে পূর্ণ উপসংহারগুলোতে পৌছায়। ঈমানের অত্যাবশ্যকীয়

বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে খারেজিরা এমন কিছু বিদ'আ সংঘটন করেছে যেগুলোর উত্তর দেয়া প্রয়োজন।

একই সাথে ঠিক কোন কোন জায়গায় খারেজি ও তাদের অনুসারীরা ভুল করেছে এবং তাকফিরের ব্যাপারে ভুল ও চরম্পন্থায় পতিত হয়েছে, সেটা ব্যাখ্যা করাও জরুরি। কারণ তারা শুধুমাত্র - এই আয়াতের আলোকে শাসকদের উপর তাকফির করে নি। বরং যেসব শাসকদের উপর তারা নিজেরা তাকফির করেছে, সেসব শাসকদের পক্ষ নেয়ার জন্য তারা সেসব মুসলিমদে উপর তাকফির করেছে, যাদের মুসলিম হওয়া ইজমা' দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তারা এই সিদ্ধান্ত পৌঁছেছে এই যুক্তির ভিত্তিতে যে, এসব মুসলিমরা যেহেতু হাত বা মুখের দ্বারা এসব শাসকদের অন্যায়ের (মুনকার) বিরোধিতা করে নি, তাই তারা কাফির। কারণ এগুলো ঈমানের বাহ্যিকে চিহ্নসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের এই মত সঠিক না। একথা সত্য হাত বা মুখ দিয়ে অন্যায়ের (মুনকার) প্রতিবাদ করা ঈমানের তিনটি বাহ্যিক চিহ্নের অন্তর্গত। কিন্তু এর অর্থ এই না যে, আল্লাহ আযযা ওয়া-জাল এর শারীয়াহকে প্রতিস্থাপিত করেছে, এমন শাসকের অন্যায়ে কেউ যদি হাত বা মুখের মাধ্যমে বাঁধা না দেয়, তাহলে সে কাফির। এর কারণ হল, সবাই হাত ও মুখের দ্বারা অন্যায়ের বিরোধিতা করতে সক্ষম না। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব করেছেন (আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশ অনুযায়ী), তাঁর সাধ্যমত অন্যায়ের বিরোধিতা করতে এবং অন্যায়কে প্রত্যাখ্যান করতে। আবু সাইদের হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

"...তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখলে এবং তার দৈহিক শক্তি দিয়ে প্রতিহত করার সামর্থ্য থাকলে সে যেন তা সেভাবেই প্রতিহত করে। তার সেউ সামর্থ্য না থাকলে সে যেন মুখের কথা দ্বারা তা প্রতিহত করে। তার সেই সামর্থ্যও নাথাকলে সে যেন মনে মনে তাকে ঘৃণা করে। তা হলো সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।"[1]

---

[1] সহীহুল বুখারী ৯৫৬, মুসলিম ৪৯, তিরমিযী ২১৭২, নাসায়ী ৫০০৮, ৫০০৯, আবূ দাউদ ১১৪০, ৪৩৪০, আহমাদ ১০৬৮৯, ১০৭৬৬, ১১০৬৮, ১১১০০, ১১১২২, ১১৪৬৬। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

অন্যত্র কুফর, অন্যায় ও আলাহ-র অবাধ্যতাকে ঘৃণা করাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদ বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

“আল্লাহ তায়াআলা আমার পুর্বে যখনই কোন জাতির মাঝে নাবী প্রেরণ করেছেন তখনই উম্মাতের মধ্যে তাঁর এমন হাওয়ারী ও সাথী দিয়েছেন, যারা তাঁর পদাংক অনুসরণ করে চলতেন, তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। অনন্তর তাদের পরে এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, যারা মুখে যা বলে বেড়াত কাজে তা পরিণত করত না, আর সেসব কর্ম সম্পাদন করত যেগুলোর জন্য তারা আদিষ্ট ছিল না। এদের বিরুদ্ধে যারা হাত দ্বারা জিহাদ করবে, তারা মুমিন; যারা এদের বিরুদ্ধে মুখের কথা দ্বারা জিহাদ করবে, তারাও মুমিন এবং যারা এদের বিরুদ্ধে অন্তরের (ঘৃণা পোষণ) দ্বারা জিহাদ করবে তাঁরা মুমিন, এর বাইরে সরিষার দানার পরিমাণেও ঈমান নেই”।[1]
সূরা তাওবাহ-র ৩১ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আদী ইবন হাতেম তাই রাদ্বিয়ালাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করে বলেছেনঃ

ইহুদী ও নাসারাগণ তাদের ধর্মযাজক (আহবারাহুম) এবং সংসারবিরাগীদের (রূহবানাহুম) রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। (তারা এটা করেছিল) আল্লাহ্ যা হারাম করেছিল তা হালাল করা এবং আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা হালাল করায়, তাদের অনুসরণের মাধ্যমে। এরকম ঘটনার ক্ষেত্রে আনুগত্যকারীদের দুটো অবস্থা হতে পারেঃ

১। প্রথম অবস্থা হল এই যে তারা (আনুগত্যকারীরা) জানে যে শাসকরা আল্লাহ-র দ্বীনকে প্রতিস্থাপিত করছে। এবং তা জানা সত্ত্বেও তারা দ্বীন পরিবর্তনকারী শাসকদের অনুসরণ করছে। দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে তারা এইসব শাসকদের অনুরসরণ করছে, যারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করছে, আর আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা হারাম করছে – এটা জেনেবুঝে যে এই কাজে শাসকের প্রতি আনুগত্য তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

---

[1] সাহীহ মুসলিম, কিতাব আল ইমান, হাদিস নং ৫০, সাহিহ আল জা’আমি, দ্বিতীয় খন্ড, ১০০৮ পৃষ্ঠা, হাদিস নং ৫৭৯০

ওয়া সাল্লাম যে দ্বীনসহ প্রেরিত হয়েছিলেন তা থেকে বের করে দিচ্ছে। যদি এরকম অবস্থা হয়, তবে তাদের এরকম কাজ কুফর।

এবং আল্লাহ্ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরকম একে শিরক বলেছেন। (এর মাধ্যমে শাসকদের অনুসারীরা, শাসকের আল্লাহ্-র সাথে শরীক করেছে) যদিও তারা এই শাসকদের সিজদা করেন নি। সুতরাং জ্ঞাতসারে যদি কেউ আল্লাহ-র দ্বীন ব্যতীত অন্য কিছুর অনুসরণ করে, আল্লাহ-র এই দ্বীনের বিরোধিতা করে, এবং আল্লাহ-র দ্বীন ব্যতীত সে যা অনুসরণ করছে সেটার (উত্তম বা অধিক গ্রহণযোগ্যতার) ব্যাপারে তার দৃঢ় প্রত্যয় থাকে, তাহলে সে মুশরিক।

২। দ্বিতীয় অবস্থা হল সেইসব ব্যক্তিদের যারা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করে যে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এই ব্যাপারে শাসকদের অনুসরণ করেছে এবং আল্লাহ-র অবাধ্যতা করেছে। যেরকম একজন মুসলিম, কোন কাজ হারাম জানা সত্ত্বেও অবাধ্যতার কারণে সেই হারাম কাজে লিপ্ত হয়। তবে সে একথা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে য ঐ কাজ হারাম। এরকম ব্যক্তির ব্যাপারে ফাসেক ব্যক্তির (গুনাহর কাজে লিপ্ত ব্যক্তির) হুকুম প্রযোজ্য হবে।[1]

এই উদাহরণ থেকে আমরা দেখতে পাই খারেজিরা এই ব্যাপারে একটা মারাত্বক ভুল করেছে। তারা হুকুমের ক্ষেত্রে শাসক (হাকিম) এবং শাসিতকে (মাহকুম) একত্রিত করে একটি অভিন্ন সত্ত্বা হিসেবে গণ্য করেছে। এ কারনেই আপনি দেখবেন জামা’আত আত-তাকফির এবং আল-মুকাফফিরার মতো দলগুলো শুধুমাত্র শাসকদের না বরং একটি স্বদেশের সব অধিবাসী এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশুদেরকেও কাফির ঘোষণা করেছে। এসব কিছুর উৎস হল সঠিক ভাবে ঈমান কি তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে এবং সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতা।

---

[1] মাজমু’আ ফাতাওয়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭০

তাই এখানে “ঈমান কি” তা সঠিক ভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। ঈমানের ব্যাপারে সঠিক অবস্থান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাতিজা আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এই বক্তব্যে ফুটে উঠেছে। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ঈমানের তিনটি মাত্রা বা দিক আছে। হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে ঘোষণা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেয়া (অর্থাৎ আমলের মাধ্যমে ঈমানের প্রমাণ)।[1]

এই কথা ঐসব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যায়, যারা মনে করে ঈমানের এমন কিছু বৈশিষ্ট চাইলে বাদ দেয়া যায়, অথবা চাইলে নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করা যায়। এই বিষয়ে আরো জানার জন্য দেখুন “ঈমান কি?” কুফর দুনা কুফর -ইবন আব্বাস রাঃ এই উক্তির আলোচনা।

হুকুম শার’ঈ, ফাতাওয়া এবং বিচারের মধ্যে পার্থক্যঃ

এরকম স্পর্শকাতর বিষয়ের ক্ষেত্রে, আলোচ্য বিষয় নিয়ে আমাদের সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত ধারণা থাকা প্রয়োজন। যেকোন পরিস্থিতিতে নিয়ে পরিস্কার ধারণা থাকার জন্য হুকুম শার’ঈ, ফাতাওয়া এবং বিচারের পার্থক্য নিয়ে আমাদের জানা প্রয়োজন। কেবল মাত্র এ বিষয় সঠিকভাবে অনুধাবন করার পরেই আমরা আলোচ্য বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হতে পারবো।

প্রথমে আমাদের জানতে হবে ‘হুকুম শার’ঈ’ কী? ‘হুকুম শার’ঈ’ হল, কোন একটি নির্দিষ্ট পরিস্থতির ব্যাপারে আল্লাহ্ যা বলেছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর শারীয়া’হ তে বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। (যেমনঃ “...যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের...”)

উদাহরণস্বরূপ, বিষাক্ত বা নেশা উদ্রেককারী তরল সমূহ হারাম – এই নিয়মটিকে আমরা পানি, ভিনেগার কিংবা এরকম অন্য কোন তরলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি না, কারণ এই তরলগুলো হালাল। অর্থাৎ, মদ হারাম এবং মদ পান করা হারাম একারণে আমরা

---

[1] কাশফ আশ-শুবুহাত ফিত-তাওহীদ পৃষ্ঠা ২৫-২৮

লোকেদের পানি খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করতে পারি না, কারণ এ দুটো বিষয় এক নয়, যদিও দুটোই তরল। এ কারণে কোন একটি বিষয়ে ফাতাওয়া প্রদানের জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ বিষয়ে কি বলেছেন শুধুমাত্র সেটা জানা থাকাই যথেষ্ট না। ফাতাওয়ার উদ্দেশ্য হল বিবেচ্য পরিস্থিতি এবং সেই পরিস্থতিতে প্রযোজ্য আয়াতসমূহকে সংযুক্ত করা। একারণে বাস্তব পরিস্থিতিত সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকাও প্রয়োজন। ফাতাওয়া শুধুমাত্র তখনই সঠিক হবে, যখন হুকুম শার'ঈ এবং বাস্তবতা, উভয়ের ব্যাপারে ধারণা এবং পর্যালোচনা স্বচ্ছ ও সঠিক হবে। এ কারণে তার সময়ের লোকদের প্রতি বলা ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এই কথা - "এটা সেই কুফর নয়, যার কথা তোমরা ভাবছো" – অন্য সময়ে প্রযোজ্য না, যদি না দুটো পরিস্থতির মধ্য সাদৃশ্য, একই শর্তাবলী, এবং একই বাস্তবতা না থাকে। এবং ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যে ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষাপটে এই মন্তব্য করে ছিলেন, সে একই রকম ঘটনাপ্রবাহ ও প্রেক্ষাপট পরবর্তী কোন ঘটনার জন্য প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

বিচার –এর ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো এক ধার অগ্রসর হয়।

বিচার হল এটা নিশ্চিত করা যে, হুকুম শার'ঈ এবং বাস্তবতা, উভয়ের ব্যাপারে ধারণা এবং পর্যালোচনা স্বচ্ছ ও সঠিকভাবে করা হয়েছে, এবং তারপর এ দুটির আলোকে বিচার বা বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে। বিচার হল, কতৃপক্ষের পক্ষ হয়ে এটা নিশ্চিত করা যে, হুকুম শার'ঈর আলোকে প্রদত্ত ফাতাওয়া সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে (উদাহরণ স্বরূপঃ যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার করে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড বা অন্য কোন উপযুক্ত দন্ডপ্রয়োগের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া)। উপরোক্ত ধাপসমূহ পার হয়ে আসার পর, কোন বিচার সম্পর্কে একবার নিশ্চিত হবার পর, সেই বিচার বা বিধান প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক। এটাই একজন ক্বাজীর দায়িত্ব। যখন একজন ক্বাজী হুকুম শার'ঈ এবং বিবেচ্য বাস্তব পরিস্তিতির ব্যাপারে পর্যালোচনার সঠিক হবার ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন, তখন তিনি সেই বিধান অনুমোদন করবেন, এবং তা কার্যকর করবেন। ফাতাওয়া হল হুকুম শার'ঈর চেয়ে এক ধাপ অগ্রসর, এবং বিচার বা প্রয়োগ হল ফাতাওয়ার চেয়ে এক ধাপ অগ্রসর।

এ আলোচনায় ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যের অবতারনা করার কারণ হল, ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন হাফিয। এছাড়া তিনি সেই সময় উপস্থিত থাকার কারণে বিবেচ্য বাস্তবতা এবং ঘটনাপ্রবাহ তাঁর চারপাশেই ঘটছিল। এবং এই প্রেক্ষিতে তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর এই বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন " কুফর দুনা কুফর" (কুফর যা কুফরের চাইতে ছোট)। দুঃখজনক ভাবে বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, পরিস্থিতিতে এবং সর্বোপরি ভিন্ন উদ্দেশ্যে এই উক্তিটির যথেচ্ছ প্রয়োগ ও অপব্যবহার করা হয়ে থাকে। "কুফর দুনা কুফর" সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়ার জন্য আমাদের আগে জানতে হবে সুনির্দিষ্টভাবে কি বলা হয়েছিল এবং তাফসির এবং হাদিসের বিভিন্ন 'আলেমদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কি বর্ণিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে যা বলা হয়েছিল তা হলঃ "এটি সে কুফর না যা তোমরা মনে করছো"। এবং এ থেকে বোঝা যায় এ কথাটি বলা হয়েছিল একটি কথোপকথনের সূত্রে। এই কথোপকথনটি ছিল ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লহু আনহু এবং তাঁর সময়কার খারেজিদের মধ্যে। সুতরাং তাঁর রাদ্বিয়াল্লহু আনহু এই মতটি ছিল, তাঁর রাদ্বিয়াল্লহু আনহু সময়কার খারেজিরা যা মনে করছিল সেটার প্রেক্ষিতে। এবং আমরা এই কথা থেকে এও দেখতে পাই তিনি রাদ্বিয়াল্লহু আনহু কাজটিকে কুফরই বলেছিলেন, এবং তিনি রাদ্বিয়াল্লহু আনহু কুফরের পরিবর্তে অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করেন নি, কাজটিকে অনুমোদিত বলেন নি, জায়েজ বলেন নি। তিনি রাদ্বিয়াল্লহু আনহু একে কুফরই বলেছিলেন। এছাড়া তিনি সে সময়ের প্রেক্ষপট, ঘটনাপ্রবাহ এবং শাসকদের ব্যাপারে তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা করে এই মন্তব্য করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি সেই সময়ের কিছু মানুষদের মধ্যে, তাদের নিজেদের পরিস্থিতি নিয়ে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল, তার জবাব দিচ্ছিলেন। "...যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের..." তিনি এই হুকুম শার'ঈ বিবেচনা ও পর্যালোচনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে বাস্তবতে এরকম কোন কুফর সংঘটিত হচ্ছিল না।

এখন আমরা যদি ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সময়কার বাস্তবতার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে সহজেই নিচের কয়েকটি বিষয় দেখতে পারিঃ

১। সর্বপ্রথম যে শাসককে খারেজিরা কাফির ঘোষণা করেছিল, তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি (আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিল।

২। দ্বিতীয় যে ব্যক্তিকে খারেজিরা কাফির আখ্যায়িত করেছিল তিনি ছিলেন মু'আবিআ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, যাকে খুলাফায়ে রাশিদা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় কিন্তু কুর'আন লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৩। বিবাদরত উভয়পক্ষেই সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া ইজমাই'ন বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের মধ্য তীব্র মতবিরোধ হচ্ছিলো এবং তাঁরা নিশ্চিতভাবেই অজ্ঞ খারেজিদের চাইতে অধিক 'ইলমের অধিকারি ছিলেন। কিন্তু কোন সময়ই তাঁরা একে অপরকে কাফির ঘোষণা করেন নি।

৪। আবু মুসা আল-আশা'আরি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করা একজন সাহাবা। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় তিনি কোন রকম ঐচ্ছিক অবাধ্যতা করেন নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রতারিত হয়েছিলেন। কিন্তু খারেজিরা তাঁকেও কাফির ঘোষণা করেছিল। কিভাবে একজন ব্যক্তি যাকে প্রতারিত করে হয়েছে তাঁকে এমন কাজের জন্য কাফির ঘোষণা করা যেতে পারে, যে কাজের উপর তাঁর কোন নিয়ন্ত্রন ছিল না?

৫। 'আমর ইবন আল-'আস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন মহান সাহাবা এবং কুফফারের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহায্যকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসাও করেছিলেন। তাঁর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে তিনি প্রকৃতপক্ষে কাউকে প্রতারিত করতে নয়, বরং অন্যান্য সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া ইজমা'ইনের মতো তিনিও, মুসলিমদের জন্য যে ফলাফল তাঁর কাছে উত্তম মনে হয়েছিল সেটি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছিলেন।

৬। শারীয়াহ একশ ভাগ অবিকৃত ও অক্ষত ছিল এবং সম্পূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল।

তাই, যদি কেউ সে সময় আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছে সেটা ছাড়া অন্য কোন নিয়ম প্রয়োগ করে থাকে, তবে সেটা সেই ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত গুনাহ, যা সে করেছে অজ্ঞতা বা নাফসের অনুসরণের কারণে। ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যের পেছনে এই হল প্রেক্ষাপট। এটি ছিল তাঁর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সময়ের জন্য তাঁর ফাতাওয়া। ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যারা আল্লাহ্‌র নাযিল করা শারীয়াহ ব্যতিত অন্য কিছু দিয়ে বিচার করে তাদের ব্যাপারে 'আম বা সাধারণভাবে হুকুম কি হবে এ ব্যাপারে আরেকটি উক্তি করেছিলেন। তিনি ধরণের শাসকদের ব্যাপারে বলেছিলেন, "এটা কুফর হিসেবে যথেষ্ট।"[1] ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু এই উক্তি দ্বারা কোন কুফর আসগর বা ছোট কুফরকে বোঝাচ্ছিলেন এটা বলা যাবে না। কারণ তিনি বলেছেন "এটা যথেষ্ট..." অর্থাৎ এর দ্বারা শুধুমাত্র কুফর আকবর বা বড় কুফর (যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়) বোঝানো হতে পারে।

ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এই কথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা যারা শাসন করে, যারা শারীয়াহতে পরিবর্তন সাধন করে, অথবা শারীয়াহ পরিপন্থী আইন প্রণয়ন করে তারা কুফর আকবর করে। যদি এমন হয় যে শাসকরা কিছু ক্ষেত্রে শারীয়াহ প্রয়োগ করতে পারছে না বা করছে না, তাহলে সেক্ষেত্রে "কুফর দুনা কুফর" কথাটি প্রযোজ্য হতে পারে। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে এ কাজকে কুফর আসগর বলা যেতে পারে। এর কারণ হল, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর পদ্ধতি হল, সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে বিবেচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল আয়াতের আলোকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা। আর বিদ'আতিদের বৈশিষ্ট হল শুধুমাত্র সে সব আয়াত ব্যাবহার করা যেগুলো তাদের কাজে লাগবে। এবং আমাদের এই বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমান হল, কেউ কখনো ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বা অন্য কারো কাছ থেকে এমন কোন বক্তব্য পেশ করতে সক্ষম হবে না, যেখানে তাঁরা আইন প্রণয়নের (তাশরী')

[1] এই বর্ণনাটি সাহীহ এবং ইমাম ওয়াকি'য়া আখবারুল ক্বাদা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০-৪৫ এ এটি বর্ণনা করেছেন।

ব্যাপারে বলেছেন যে এটা "শিরক দুনা শিরক"/"শিরক যা ছোট শিরক"। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আল কুর'আনে বলেছেনঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"তাদের কি এমন শরীক সত্ত্বা আছে, যারা তাদের জন্যে সে দ্বীন সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালিমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"। (সূরা আশ-শুরা, আয়াত ২১)

আমরা খুব অবাক হই যখন আমরা দেখি নিজেদের সালাফি দাবি করা লোকেরা শাসকদের ব্যাপারে ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর "কুফর দুনা কুফর" কথাটি প্রয়োগ করে, কিন্তু ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যে শাসকরা আল্লাহ্ যা নাযল করেছে তদানুযায়ী শাসন করে না, তাঁদের বিরুদ্ধে যে উক্তি করেছিলেন, সেটা তারা ব্যবহার করে না।

ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যা বলেছেন সেটার পাশাপাশি এ ব্যাপারে ইবন মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যও আছে। ইবন মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে এই একই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কিছু লোক ইবন মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলোঃ "রেশওয়াত (ঘুষ) কি?"

জবাবে ইবন মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ "এটা হল সুহত (অসদুপায়ে অর্জিত সম্পদ)"

তখন তাঁরা বললোঃ "না, আমরা জানতে চাচ্ছি বিচার এবং শাসনের ক্ষেত্রে (রেশওয়াত গ্রহণের) এর অর্থ কি?"

ইবন মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেনঃ “এটা নিঃসন্দেহে কুফর”।[1]

হাফিয ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ, যিনি তাফসিরের ক্ষেত্রে তাঁর সুচিন্তিত ও নিষ্পত্তিমূলক (decisive) মতামতের জন্য প্রসিদ্ধ, এই আয়াতগুলোর তাফসিরের আলোচনায় শুরুতেই তাঁর নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেন নি। কেন ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ নিজের বক্তব্য উপস্থাপন না করে শুধুমাত্র সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য পূর্ববর্তী ইমামদের মত তুলে ধরেছিলেন? অনেক সময় মানুষ যে ব্যাপারটা বিস্মৃত হয়, তা হল ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ একজন যোগ্যতাসম্পন্ন, উচ্চপর্যায়ের ফাক্বিহ[2] এবং হাক্কানী উলেমার প্রধান বৈশিষ্টসমূহের একটি হল, তাঁরা তাঁদের সমসাময়িককালের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতার বিশ্লেষণের পরই কেবল নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। ইমাম ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ এটিই করেছেন। ইবন কাসীর শুরুতেই আল মায়'ইদার ৪৪, ৪৫ আর ৪৭ নম্বর আয়াত দিয়ে আলোচনার সূচনা করেন নি, বরং বিচার শাসনের আলোচনা তিনি শুরু করেছেন আল-মায়'ইদার ৪০ নম্বর আয়াত থেকে এবং আলোচনা শেষ করেছেন ৫০ নম্বর আয়াতে গিয়ে।

প্রাসঙ্গিক সকল দালীল-প্রমান উপস্থাপনের পরই কেবল শাইখ ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ তাঁর নিজের মতামত পেশ করেছেন, তাঁর সমকালীন অবস্থার বাস্তবতা তুলে ধরেন। ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন মুসলিমদের উপর মঙ্গোলদের শাসনকালের সমকালীন। মঙ্গোলরা শাসনকার্য পরিচালনা করতো, গেঙ্গিস খান রচিত এক কিতাবের (আল-ইয়াসিক) আলোকে। বর্তমান সময়ে এই অবস্থারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। সাধারণত একজন ফাক্বিহ, কোন বিষয়ে নিজের মতামত ও ফাতাওয়া প্রদানের আগে প্রাসঙ্গিক সকল আয়াত ও হাদীসসমূহ

---

[1] সূরা মায়'ইদার ৪৪ নং আয়াতের আলোচনায় তাফসির ইবন কাসির দেখুন আরো দেখুন একই বিষয়ে আল আখবারুল ক্বাদা'র আলোচনা

[2] একজন ইসলামি আইন বিশারদ যিনি কুর'আন ও সুন্নাহ-র সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্য সম্পর্কে অবগত, এবং এসবের আলোকে তিনি তার সমসাময়িক বাস্তবতার জন্য হুকুম ও ফাতাওয়া নির্ধারণ করেন। একজন ফাক্বিহ-র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তিনি কুর'আন হিফয করার পাশাপাশি প্রতিটি আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও অবগত থাকেন।

পর্যালোচনা ও পেশ করেন। তারপর তিনি সেই বিষয়ে সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য ও ফাতাওয়া তুলে ধরেন। তারপর তিনি পূর্ববর্তী উলেমাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। এসব তথ্য-উপাত্ত ও দালীল পেশ করার পর, সব শেষে একজন ফাক্বিহ নিজের মতামত ও ফাতাওয়া পেশ করেন।

সমসাময়িক মঙ্গোলদের আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত গেঙ্গিস খানের কিতাব দিয়ে শাসন করার ক্ষেত্রে ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহ অত্যন্ত শক্ত মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতটি পড়লে, এর যথার্থতা এবং গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহু বলেছেনঃ

"যে রাজকীয় বিধানসমূহের দ্বারা তাতাররা শাসনকার্য পরিচালনা করে, এগুলো গৃহীত হয়েছে তাদের রাজা গেঙ্গিস খানের রচিত কিতাব আল-ইয়াসিক থেকে। গেঙ্গিস খান এই কিতাব রচনা করেছিল বিভিন্ন শারীয়াহ থেকে নানা আইন একত্রিত করে। এখানে ইহুদী, নাসারা, ইসলামী শারীয়াহ সবগুলো থেকেই কিছু কিছু গ্রহণ করা হয়েছে, এবং সাথে আরো অন্যান্য উৎসসমূহ থেকেও। এছাড়া এই কিতাবে গেঙ্গিস খানের নিজের চিন্তাপ্রসূত নানা মনগড়া আইনও আছে। আর এভাবে গেঙ্গিসের উত্তরসূরিরা আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহ অনুযায়ী শাসনের বদলে এই কিতাবের আইনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং অনুসরণ করেছে। যারা এরকম করে তাঁরা কাফির এবং তাদের বিরুদ্দে ততোক্ষণ যুদ্ধ করতে হবে, যতোক্ষন না তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নির্ধারণ করেছেন তদানুযায়ী শাসন করার দিকে ফিরে না আসে। যাতে করে, ছোট বা বড়, কোন বিষয়েই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া আর কারো বিধান না চলে"।[1]

একই সাথে আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহ এই বিষয়ে কি বলেছেন বিবেচনা করুনঃ

[1] তাফসির ইবন কাসির, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৭

"অতএব কেউ যদি খাতুমুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাযিলকৃত শারীয়াহ ছেড়ে, পূর্বে নাযিলকৃত অন্য কোন শারীয়াহ দ্বারা বিচার করে ও শাসনকার্য চালায়, যা রহিত হয়ে গেছে, তবে সে কাফির হয়ে গেছে। তবে (চিন্তা করুন) সেই ব্যক্তির অবস্থা কি রূপ যে আল-ইয়াসিক্কের ভিত্তিতে শাসন করে এবং একে ইসলামী শারীয়াহ'র উপর স্থান দেয়? এরকম যেই করবে সে মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী কাফির"।[1]

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে বলেছেনঃ

"দ্বিতীয় প্রকারের ত্বগুত[2] হল সেই স্বেচ্ছাচারী বিচারক বা শাসক যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বিধানে পরিবর্তন ঘটায়। একথার প্রমাণ হল মহান আল্লাহ-র এই বক্তব্যঃ

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবর্তীণ হয়েছে। তারা হুকুম বা মীমাংসার জন্য ত্বগুতের কাছে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা (ত্বগুতকে) প্রত্যাখ্যান করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়"। (সূরা আন-নিসা, ৬০)

---

[1] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৯

[2] ত্বগুত হল মিথ্যা বিধানদাতা। অর্থাৎ, ত্বগুত সে, যে এমন আইন, বিধান, ইবাদাত প্রণয়ন করে যা আল্লাহ্ বানী আদমের জন্য নির্ধারিত করেন নি, এবং যেগুলো আল্লাহ্- যা নাযিল করেছন সেগুলোর বিরোধী। ত্বগুত শব্দের উৎপত্তি "ত্বাঘইয়্যান" থেকে, যার অর্থ হল "যথাযথ ভাবে নির্ধারিত যে সীমা, তা লঙ্ঘন করা"।
ত্বগুত সিস্টেম হিসেবে তিন ভাবে প্রকাশ পেতে পারে।

ক। আইন প্রনয়ণের ক্ষেত্রে

খ। ইবাদাতের ক্ষেত্রে

গ। আনুগত্যের ক্ষেত্র

তৃতীয় প্রকারের ত্বগুত[1] হল সে যে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছে তদানুযায়ী শাসন না করে, অন্য কিছু দিয়ে শাসন করে। আর এর পক্ষে দালীল হল আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল এর এই বক্তব্যঃ

وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَـٰفِرُونَ

"...যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির"। (সূরা আল মায়'ইদা, আয়াত ৪৪)

উপসংহারঃ

অতএব এটি সুপ্রমাণিত যে যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আইন প্রতিস্থাপিত করে, শুধু তারাই না, বরং যারা শারীয়াহ দিয়ে বিচার করে না, শাসন করে না তারাও কুফফার। শারীয়াহ দিয়ে শাসন না করাই একটি কুফর আকবর। তবে যারা আল্লাহ-র শারীয়াহকে বাদ দিয়ে নিজে কোন শারীয়াহ উদ্ভাবন করে এবং তা দিয়ে শাসন করে (যেমন মঙ্গোলরা আল ইয়াসিক দিয়ে করেছিল) তারা কুফরের পরে আরো কুফর করছে। একটি কুফর আকবরের উপর তারা আরেকটি কুফর আকবর করছে। আর যারা তলোয়ারের মাধ্যমে (বলপ্রয়োগের মাধ্যমে) মানুষের উপর তাদের স্বরচিত শারীয়াহ চাপিয়ে দিচ্ছে, একটি কুফর আকবরের উপর আরেকটি, এবং তার উপর আরেকটি কুফর আকবর করছে।

---

[1] ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর মতে ত্বগুতের পাঁচটি প্রধান প্রকার আছে।

ক। ইবলিস

খ। আল্লাহ্ ব্যতীত যার ইবাদাত করা হয়, এবং সে এতে সন্তুষ্ট

গ। যে মানুষকে আহবান জানায় তার ইবাদাত করার জন্য

ঘ। যে দাবি করে তার কাছে গাইবের 'ইলম আছে

ঙ। যে আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী শাসন না করে, অন্য কিছুর ভিত্তিতে শাসন করে।

আর যারা এই ধরণের কুফরকে হালাল করছে, জায়েজ বলছে তারা সবচেয়ে বেশি কুফর করছে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দ্বীনকে সম্পূর্ণভাবে বিকৃত করছে। কারণ তারা কুফরের দিকে আহবান করছে আর একে জায়েজ বলছে। আর এটা পরিষ্কার যে এধরণের লোকেদের মধ্যে যারা মুসলিমদের হত্যা করছে, তারা তা করছে তাদের স্বরচিত শারীয়াহ-র আলোকে, এবং তারাও একপ্রকারের খারেজি।

অধ্যায় ৩

বর্তমান বিশ্বের আধুনিক খাওয়ারিজ[1]

আধুনিক খাওয়ারিজঃ

এখন প্রশ্ন হল, “আজকের যুগের আধুনিক খারেজি কারা?” “তারা কোথায় এবং কিভাবে আমরা তাদের সম্পর্কে জানতে পারবো যাতে করে আমরা তাদের বিপদজনক ধ্যানধারণা ও কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সতর্ক হতে পারবো?” উম্মাহরা নিরাপত্তার জন্য এই খারেজি জামা’আ এবং ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাতে করে সব মুসলিম এই সব খারেজিদের চিনতে সক্ষম হয় এবং খারেজিদের থেকে এবং তাদের ‘আলেমদের কিতাবাদি থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি যেসব জায়গায় খারেজিদের এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো দাওয়াহ করে সেগুলো এড়িয়ে চলতে পারে।

মিশরে খারেজিদের আবির্ভাবঃ

আধুনিক খারেজিদের আবির্ভাব প্রথম ঘটে মিশরের আসইউত নামক স্থানে। খারেজিদের এই জামা’আর নাম ছিল “আত-তাকফির ওয়াল হিজরাহ”[1]। শুকরি মুস্তফা আবদুল ‘আল নামে

---

[1] এ বইটি লিখিত হয়েছিল ১৯৯৯ সালে এবং প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে। একারণে ২০০০ সালের পর যে খাওয়ারিজ জামা’আ আত্বপ্রকাশ করেছে এবং খারেজি আদর্শের আবির্ভাব হয়েছে তা এই বইতে আলোচিত হয়নি। তবে সচেতন পাঠক এই আলোচনা থেকে সাম্প্রতিক সময়ে তাকফিরের ক্ষেত্রে চরমপন্থা এবং মুসলিম রক্ত হালাল করার যে খারেজি আদর্শ আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সাথে এই অধ্যায়ে আলোচিত শুকরী মুস্তাফা, জামাতুল মুসলিমীন এবং বিশেষ করে GIA এর খারেজি আদর্শের মিল খুজে পাবেন এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন ইনশা আল্লাহ্‌। - অনুবাদক

একজন ব্যক্তি এই জামা'আ ঘঠন করে। তার জন্ম মিশরের আসইউতে, ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারী। ১৯৬৫ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের একটি মিলিট্যান্ট (জঙ্গি) সেলের সদস্য হিসেবে কাজ করার সময় তাকে গ্রেফতার এবং বন্দী করা হয়। বন্দী অবস্থায় সে সাইদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহর "মা'আলিম ফিত তারিখ" (Milestones) বইটি দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হয়। তবে এই গ্রন্থটিতে যেসব উত্তম ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছিল শুকরি মুস্তফা সেগুলোর অর্থকে ব্যাপকভাবে অতিরঞ্জিত করে গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত সে সাইদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহর আন্দোলন এবং সাইদ কুতুবের অনুসারিদের থেকে আলাদা হয়ে যায়।

সে একটি নির্দিষ্ট ধারণাকে কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরে। তার এই ধারনাটি ছিল ইয়েমেনে হিজরত করে "ইয়েমেনের পাহাড় ও উপত্যকাসমূহ" নামক অঞ্চলে বসবাস শুরু করা। তার লক্ষ্য ছিল এখানে একটি ইসলামি রাষ্ট্র এবং ইসলামি সেনাবাহিনী গড়ে তোলা, যার কাজ হবে নতুন ভূমি দখল করে মুসলিমদের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সকল মুসলিম ভূখন্ডকে একত্রিত করাও তার উদ্দেশ্য ছিল। সে নিজের দুই ভাতিজাকে এই আদর্শে উজ্জীবিত করতে এবং তার আন্দোলনে যুক্ত করতে সক্ষম হয়। শুকরি মুস্তাফার প্রভাবের কারণে হয়ে এই দুই তরুণ নানা কারণে তাদের মা-কে শারীরিকে ভাবে আঘাত করা শুরু করে। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে তাদের মা, তাদেরকে শুকরি মুস্তাআর সাথে দেখা করে থেকে জোরপূর্বক বিরত রাখে।

অতঃপর শুকরি মুস্তফা আসইউতের বাইরে মিশরের বানী সওইফ, কাফর শাইখ, আল মিনার মত জায়গায় তার দাওয়াহ প্রচার শুরু করে। সে সরকার ও সমাজকে বয়কট করার জন্য মানুষকে আহবান জানানো শুরু করে। মিশরের সকল মসজিদের ইমামগণ কাফির এবং তাদের পেছনে সালাত আদায় করা যাবে না, এই মর্মে সে একটি ফাতাওয়া প্রদান করে। সে আরো একটি ফাতাওয়া প্রদান করে এই মর্মে যে, সরকারের সাথে সহযোগিতা করছে এমন

---

[1] যে দল নিজেদের ছাড়া অন্য সব জামা'আ এবং দলকে কুফফার ঘোষণা করে, এবং আল্লাহ্-র রাস্তার জিহাদ করার জন্য আহবান জানায়, এবং বলে এজন্য এক জন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে তার সমাজ ও পরিবেশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং হিজরত করতে হবে। এই দলটি নিজেদের নাম রাখে 'জামা'তুল মুসলিমীন", তবে আহলুস সুন্নাহর কাছে তারা আত-তাকফির ওয়াল জিহাদ নামেরি অধিক পরিচিতি পায়।

সব মাসজিদ হল হারামের মাসজিদ এবং এসব মাসজিদে সালাত আদায় করা যাবে না। একই সাথে সে কিছু সঠিক দাবি দাওয়াও উত্থাপন করেছিল, যেমন সে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগের দাবি জানিয়েছিল। তবে সে শারীয়াহ প্রয়োগের ব্যাপারে শুধু শাসকদের না, বরং শাসিতদেরও দোষী বলে দাবি করেছিল। তার বক্তব্য ছিল শাসিতরা (সাধারণ মুসলিম জনগণ) চাইলেই অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তা করছে না। এর ভিত্তিতে সে সব মানুষকে তিনটি শ্রেনীতে বিভক্ত করেঃ

ক) একজন কাফির বা মুশরিক

খ) একজন দুর্বৃত্ত এবং অমার্জিত ব্যক্তি, যে দ্বীন নিয়ে তেমন কিছু জানে না, এবং নিজের অবস্থা নিয়ে সে সন্তুষ্ট

গ) একজন ব্যক্তি যে শুধু নামে মুসলিম

শুকরি মুস্তফার মতে এই শেষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের অজ্ঞতার কারণে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ ছিল না। তারপর সে এই তিনটি শ্রেণীর প্রত্যেকটির জন্য (অর্থাৎ কোন শ্রেণীর প্রতি কিরকম আচরণ করা হবে) একটি করে কার্যসূচী গঠন করে। পাশাপাশি যারা তার দল ছেড়ে যাবে তাদের সবাইকে সে কাফির মুরতাদ এবং বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা ও গণ্য করার নীতি গ্রহণ করে। আর তার প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী, যেহেতু সে নিজেই ছিল আমির তাই এ ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। তার পদ্ধতি বা মানহাজ ছিল চারটি পৃথক অক্ষে কাজ করা-

১। কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে আল্লাহ-র শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা।

২। এই মানহাজ বাস্তবায়ন করার জন্য সৈন্যবাহিনী তৈরি করা। তার দলের সকল সদস্য এবং তাদের সাথে যোগদান করা সকল ব্যক্তি এই সৈন্যবাহিনীর সদস্য বলে গণ্য হবে।

৩। এই মানহাজ বাস্তবায়নের পদ্ধতি হবে সমাজের কোন একটি অংশকে নির্দিষ্ট করে তাদের ভেতরে আরেকটি ইসলামী সমাজ গঠন করা। এবং তারপর ইয়েমেনের প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে হিজরত করা এবং সেটাকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে জিহাদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে একত্রিত করা।

৪। এই উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ-র উপর তাওয়াক্কুল করা এবং প্রয়োজনীয় সকল কৌশল, নিমিত্ত ও মাধ্যমকে কাজে লাগানো[1]।

বিস্ময়কর ব্যাপার হল, শুকরি মুস্তফা এবং তার দলের সদস্যরা মনে করতো অতি শীঘ্রই অ্যামেরিকা এবং (তৎকালীন) সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এক মহাযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে এবং এর মাধ্যমে সব প্রযুক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। এই যুদ্ধের পর শুধু অনেক লোহা ও ইস্পাত বাঁচবে যা দিয়ে ডাল, তলোয়ার, তীর এবং বর্শা বানানো যাবে এবং এই সব অস্ত্র দিয়ে মহাযুদ্ধের পরের যুদ্ধগুলো হবে আদিম যুগের মতো করে।

তারা সাউদী আরব এবং অন্যান্য অঞ্চলে ছাত্রদের পাঠায় তাদের দাওয়াহ প্রচার করা এবং আর্থিক সহায়তার জন্য। শুকরি মুস্তফা এবং তার তিনজন অনুসারির মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে যা মূলধারার ইসলামের থেকে আত-তাকফির ওয়াল-হিজরাহর আদর্শিক বিচ্যুতিকে স্থায়ীরূপ দান করে। শুকরি মুস্তফা আর তিনজন অনুসারীকে নির্দেশ দেয় ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিতে যাতে করে সে তাদেরকে একটি মিশনে পাঠাতে পারে। যখন তারা নির্দেশ মেনে নিতে অস্বীকার করে, তখন সে তাদের কাফির মুরতাদ ঘোষণা করে। সে এই তিনজনের একজনের শ্বশুরকে পাঠায় তার মেয়েকে স্বামীর (সেই তিন ছাত্রের একজন) কাছ থেকে নিয়ে আসার জন্য। কারণ শুকরি মুস্তফার ধারণা অনুযায়ী এই তিন ছাত্র কাফিরে পরিণত হয়েছে এবং তাদের স্ত্রীদের সাথে তাদের তালাক হয়ে গেছে।

এসময় মিশরের মুসলিম সমাজের সাথে তাদের দলের দূরত্ব ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। এ পর্যায়ে তারা একটি নীতি গ্রহণ করে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় কোন ব্যক্তিকে তারা মুসলিম হিসেবে গণ্য করবে না, যতক্ষণ না ঐ ব্যক্তি তাদের তৈরি একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। অর্থাৎ তাদের মতে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার আগ পর্যন্ত সকল মুসলিম দাবিদার কাফির বলে গণ্য হবে। আর পরীক্ষায় পাশ করার পর সেই ব্যক্তিকে নতুন সদস্য হিসেবে আত-তাকফির

[1] আপনারা দেখবেন অনেক খারেজি জামা'আই ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ এবং প্রশংসনীয় দাবি এবং উদ্দেশ্য স্থির করে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখন, যখন তারা উম্মাহ-র মধ্য একমাত্র নিজেদেরকেই মুসলিম, এবং তাদের সাথে দ্বিমতপোষণ করে এরকম মুসলিমকে কাফির ঘোষণা দিয়ে হত্যা করে।

ওয়াল হিজরাহকে বাইয়াহ (কোন মুসলিম কতৃক শাসককে প্রদত্ত আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি) দিতে হবে[1]। যারা তৎকালীন মিশরীয় সমাজকে একটি মুশরিক সমাজ হিসেবে সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করতে অথবা হিজরাহ করতে রাজি হবে না, শুকরি মুস্তফার মতে তারা মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে সে দুটি সাহিহ হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করে, যে হাদিসদ্বয়ে বলা হয়েছে, যে মুশরিকদের সাথে বসবাস করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। এসময় মিশরীয় সরকার এই দলের কিছু সদস্যকে গ্রেফতার করে, কারণ তারা সরকারী বাহিনী এবং সাধারণ মানুষকে আক্রমণ করছিল।

আত-তাকফির ওয়াল হিজরাহর ধ্বংস শুরু হয় যখন তারা শাইখ মুহাম্মাদ হাসান আদ্দ-দ্বাহাবি[2] রাহিমাহুল্লাহকে অপহরণের পর হত্যা করে। তারা পুলিশের উর্দি পরে এসে শাইখকে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং শাইখের জন্য নিয়োজিত পুলিশ রক্ষীদের গুলি চালায়[3]। এসময় সরকার শুকরি মুস্তফা সহ এই দলের অধিকাংশ সদস্যকে গ্রেফতার করে। একটি সামরিক আদালতের অধীনে তাদের বিচার করা হয়। বিচারে শুকরি মুস্তফাসহ আর তিন অনুসারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তাদের ধ্যানধারণা পরিবর্তনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কারাগারে অবস্থিত শুকরি মুস্তফার অনুসারীদের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়, যার ফলশ্রুতিতে এক দীর্ঘ বিতর্কের পর ছয় ধরণের ফলাফল পাওয়া যায়।

---

[1] বর্তমানে আমরা এরকম দল দেখতে পাচ্ছি যারা নিজেদের একমাত্র বৈধ মুসলিম জামা'আ মনে করে।এই জামা'আর সদস্য নয় এমন মুসলিমকে জাহিলিয়্যাহর উপর মৃত্যু বরণকারী মনে করে, এবং সকল প্রকৃত মু'মিনের জন্য তাদের জামা'আকে বাইয়াহ দেয়া আবশ্যক মনে করে। "যখনই তাদের একটি শাখাকে কেটে ফেলে হয় তখন আরেকটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে"।

[2] তিনি ছিলেন আল-আযহার এবং আল-আওক্বাফের (ইসলামী বৃত্তি প্রদান সংস্থা) একজন বিশিষ্ট 'আলেম, এবং একজন প্রখ্যাত লেখক। তার সবচেয়ে বিখ্যাত রচনার নাম "তাফসির আল মুফাসসিরুন" (মুফাসসিরদের তাফসির)। আত-তাকফির ওয়াল হিজরাহ তাঁকে হত্যা করে।

[3] এরকম কিছু গুজব সে সময় ছড়িয়ে পরে যে, জিহান সাদাত কতৃক নিয়ন্ত্রিত ইসলামী বৃত্তি সংস্থার তহবিল নিয়ে দুর্নীতি ধামাচাপা দেয়ার জন্য সরকার শাইখকে হত্যা করে এবং আত-তাকফির ওয়াল হিজরাহর উপর এর দায় চাপায়।

১। তাদের কেউ কেউ তাওবাহ করে খারেজিদের আদর্শ ত্যাগ করে এবং কোন সব ধরণের রাজনৈতিক সংগ্রাম ছেড়ে দিয়ে ঘরোয়া জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।

২। কেউ কেউ এই খারেজি আদর্শ ত্যাগ করে বিভিন্ন মিশরীয় জিহাদি দলে (যেমনঃ আল জিহাদ এবং জামা'আ ইসলামিয়্যা) যোগ দেন, যেগুলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর অন্তর্ভুক্ত।

৩। দুঃখজনকভাবে কিছু সদস্যকে সরকারিরা গোয়েন্দারা তাদের দালালে পরিণত করতে সক্ষম হয়।

৪। আর কেউ কেউ তাদের আদর্শের উপর অটল থাকে। তারা ব্যাপকভাবে দাওয়ার মাধ্যমে নতুন সদস্য সংগ্রহের কাজে মনোনিবেশ করে। তারা সমাজ থেকে সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালু রাখে।

৫। এমনকি এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত লোকেরা তাদের অনেক সদস্যকে আফগানিস্তানের মুজাহিদিনের কাছে পাঠাতে এবং এইসব সদস্যদের মাধ্যমে মুজাহিদিনের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়। এবং এর মাধ্যমে জিহাদের ভূমি এবং বৈশ্বিক জিহাদের রাজধানী ও প্রাণকেন্দ্রে খারেজি আদর্শের অনুপ্রবেশের মাধ্যমে তাকফির ও খুরুজের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

৬। তবে আমাদের সময়ে আরো একটি খারেজি আন্দোলনের চিহ্ন আছে যার কথা অনেকেই এড়িয়ে যান। আর তা হল আল-সাউদ রাজ পরিবার। আমি পাঠকদের অনুরোধ করবো এই কিতাবের শেষে সংযুক্ত আর্টিকেল দুটি পড়ার জন্য। তারপর আপনারা নিজেরাই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

শুকরি মুস্তফা আবদুল 'আলের বিচারঃ

১৯৭৭ সালে, মিশরের এক সামরিক আদালতে জামা'তুল মুসলিমীন (আত-তাকফির ওয়াল হিজরাহ) নেতা শুকরি মুস্তফা আবদুল 'আলের বিচার অনুষ্ঠিত হয়। নিচের অংশটুকু এই

বিচারের কাগজপত্র থেকে সংগ্রহীত। আধুনিক সময়ের একটি খারেজি দলের নেতা হিসেবে শুকরি মুস্তফার এই বক্তব্য থেকে আমরা খারেজিদের ধ্যানধারণা ও আদর্শ সম্পর্কে তাদের নিজেদের বক্তব্য জানার সুযোগ পাবো। ইতিপূর্বে এমন কোন সুযোগ আসে নি। শুকরি মুস্তফার বক্তব্য থেকে তাদের চিন্তা সম্পর্কে যা জানতে পাওয়া তা একইসাথে চমকপ্রদ এবং ভয়ঙ্কর[1]।

১৯৭৭ সালের ৬ই জানুয়ারি আদালত প্রশ্ন করেঃ

"তুমি কি তোমার আদর্শ, মতবাদ, তোমার দল এবং জনবিচ্ছিন্ন হওয়া সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সম্পর্কে তোমার বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবে?"

জবাবে শুকরি মুস্তফা বলেঃ

"এখানে আমার বিচার করা হচ্ছে আমার দল এবং জামা'আর অনুপস্থিতিতে, আমি এর প্রতিবাদ জানাই। আমি চাই আমাকে আমার বক্তব্য ব্যাখ্যা করার যথেষ্ট সময় দেয়া হোক, যদি আমাকে তা দেয়া হয় তবে কোন রকম বিকৃতি ছাড়া আমি আমার আদর্শের মূল বক্তব্য তুলে ধরবো। আমি নিজের পক্ষে বক্তব্য এই বলে শুরু করতে চাই যে,

"আমি আমাদের জামা'আর মতবাদ তথা মানহাজ ৪০০০ পৃষ্ঠার এক আলোচনায় তুলে ধরেছি, যা সামরিক আদালত ও সরকারি গোয়েন্দারা জব্দ করেছে। আমি চাই আমাকে তা ফেরত দেয়া হোক। এই ৪০০০ পৃষ্ঠায় আছেঃ

---

[1] আমরা শুরুতেই এই সামরিক আদালতের নিন্দা জানাচ্ছি। এটি ছিল সামরিক বাহিনী কতৃক নিয়ন্ত্রিত আদালত, যা ছিল সম্পূর্ণভাবে অনৈসলামিক। এধরণের আদালত অপসারন করা প্রত্যেক ইসলামী দলের লক্ষ্য। অতএব আমরা যেন এইক্ষেত্রে বিচারক এবং অপরাধী খারেজি কারো প্রতিই সমব্যাথী বা সহমর্মী না হই।

সতর্কতাবাণীঃ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি তাকফিরি দলগুলো 'আম আয়াত এবং আহাদীস গুলোকে ঢালাওভাবে খাস বিষয়ে প্রয়োগ করে। খারেজিদের আদর্শের বাস্তবতা তুলে ধরার জন্য আমরা এখানে বাধ্য হয়ে বিচারচলাকালীন কথোপকথন তুলে ধরছি। এজন্য আমরা সকল ভাইদের সতর্ক করছি যেন তারা কেউ শুকরি মুস্তফার 'আম বক্তব্যগুলো দ্বারা বিভ্রান্ত না হন। এছাড়া এই বইতে আমরা শুকরি মুস্তফার অধিকাংশ বক্তব্য ও অবস্থানের ভুল ও জবাব তুলে ধরেছি।

১। আল ইসরার ("লুকায়িত অর্থ") নামের একটি বৃহৎ বই যাতে যারা নিজেদের আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করে তাদের কথার পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাব দেয়া হয়েছে। ১৯৭৩ সালে গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা আমার কাছ থেকে এই বইটি নিয়ে যায়।

২। কিভাবে মানুষ ও সমাজের বিচার করা উচিৎ, এ বিষয়ে আলোচনা সম্বলিত আরেকটি বই। ২০০ পৃষ্ঠার এই বইটির নাম আত-তাবাইয়্যুন (সুস্পষ্ট করা, প্রতীয়মান হওয়া)[1]। এই বইটিও ১৯৭৩ সালে গোয়েন্দারা আমার কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করে।

৩। তৃতীয় কিতাবটি হলে উসুল আল-ফিক্বহের ব্যাপারে ভূমিকা স্বরূপ লেখা। আমাদের আদর্শের ব্যাপারে উত্থাপিত সন্দেহ ও অপবাদের জবাবও এ কিতাবে দেয়া হয়েছে। ৫০০ পৃষ্ঠার এই বইটি এখনো অসম্পূর্ণ।

৪। ইজতিহাদের[2] ফরয হওয়া এবং তাক্বলীদ (অন্ধ অনুসরণ) হারাম হবার ব্যাপারে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা স্বরূপ আলোচনা। এটি এখনো অসম্পূর্ণ।

৫। ইসলামের ভালো দিকগুলো এবং সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা সম্বলিত ১৫০ পৃষ্ঠার একটি বই। এছাড়া আরী কিছু বই আছে যেগুলো আমার লেখা না, কিন্তু আমরা এসব বইয়ের বক্তব্যে বিশ্বাস করি। যেমন, জনাব মাহের আব্দুল আযিযের একটি বই এবং "আল-হুকুম" নামের আরেকটি বই। বইটিতে আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী শাসন করার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি লিখেছেন আলাউদ্দীন 'আলি রিদা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান এবং আমাদের জামা'আর রাজনৈতিক ও শারীয়াহগত অবস্থান এই বইতে ফুটে উঠেছে। এই লেখকের আল হিজরাহ নামে আরেকটি বই আছে, এবং তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই হল আল-খিলাফাহ[3], যা আমাকে নিয়ে লেখা হয়েছে। এই

---

[1] কে মুসলিম আর কে মুসলিম না তা পরিষ্কার করা, সুস্পষ্ট করা।

[2] যখন একজন ব্যক্তি দ্বীনের কোন ব্যাপারে সব দালীল-প্রমান বিশ্লেষণ করে অন্য কোন 'আলেম বা প্রমানের উপর নির্ভর না করে নিজে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

[3] এই বইটির বক্তব্য ছিল, শুকরি মুস্তফা ছিল তার জামা'আর খালীফাহ। বইটির লেখক খালীফাহ হিসেবে শুকরি মুস্তফাকে সমর্থন করে এই বইটি লিখেছিল।

বইতে শারীয়াহর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের জামা'আর চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কি পদ্ধতি বা মানহাজ অনুসরণ করা উচিৎ তাও এই বইতে আলোচিত হয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আমার জামা'আর অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য এই হল আমার সূচনা বক্তব্য"।

"আমাদের মতাদর্শ ব্যাখ্যা করে আমার সূচনা বক্তব্য দেয়ার কারণ হল, ইসলাম নিয়ে আমাদের বক্তব্য যাতে কতৃপক্ষ শুনতে পারে। আমি ঘোষণা করতে চাই, আমাদের মতাদর্শ অস্বীকার করার ক্ষমতা কোন কতৃপক্ষের থাকা সম্ভব না। এর কারণ হল, আমরা আমাদের নিজেদের জন্য এই শর্ত ধারণ করেছি যে আমাদের প্রমাণ যেন সবসময় অর্থের দিক দিয়ে চূড়ান্ত ও সংশয়হীন হয় এবং যাতে তাদের দ্বিতীয় কোন অর্থ না থেকে, এবং যেন আমাদের ব্যাখ্যাকে অন্য কোন ব্যাখ্যা ছাপিয়ে যেতে না পারে এবং অন্য কোন ব্যাখ্যা দ্বারা যেন আমাদের ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য না করা যায়[1]"।

"অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের একাধিক প্রমানের জবাবে আমরা আমাদের প্রতিপক্ষদের বলি একটি সঠিক দালীল পেশ করতে যা সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন এবং আমাদের প্রমাণকে নাকচ করতে সক্ষম এবং যার সনদ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পর্যন্ত পৌছেছে। এবং তাদের পক্ষে এটা করা সম্ভব না। আমি এখনো ঘোষণা করছি, আমাদের মতাদর্শের জবাব দিতে পারে, বা ভুল তুলে ধরতে পারে এমন একটি স্পষ্ট ও সঠিক দালীল উপস্থাপন করা আমাদের সব

---

[1] এই বক্তব্য হল, নিজেদের কথিত "প্রমাণ" নিয়ে এসব বাতিল জামা'আর চিরাচরিত ঔদ্ধত্যের বহিঃপ্রকাশের আরেকটি উদাহরণ। "চূড়ান্ত প্রমাণ" হিসেবে তারা যা উপস্থাপন করেছে সেগুলো হল 'আম আয়াত। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যেসব আয়াহ এবং দালীল ব্যবহার করে তারা তাদের প্রতিপক্ষকে দোষারোপ করছে, সেগুলো নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে, তাদের আক্বিদা এবং আমলের কারণে, তাদের ব্যাপারেই অধিক প্রযোজ্য। শুকরি মুস্তফার বক্তব্য নিয়ে বর্ণনা করার সময় আমরা এই বিষয়ে আরো আলোচনা করবো। অন্য কেউ যে তার ভুল শুধরে দেবে, এই ব্যক্তি সে জায়গাটুকুও রাখেনি। (কারণ সে আগেই দাবি করে বসে আছে, যে তাদের ব্যাখ্যাই একমাত্র সঠিক ব্যাখ্যা এবং কেউ এই ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করতে পারবে না, কারণ তারা নিজেরা দাবি কছে এটিই সঠিক ব্যাখ্যা)

প্রতিপক্ষেরই সাধ্যাতীত। হাশরের দিন পর্যন্ত আমাদের এই চ্যালেঞ্জ থাকবে এবং এই চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতে পারবে না[1]।

"আর 'ইতিযাল"[2]-এর ব্যাপারে আমার মত হল, এটা সম্পূর্ণ ইসলামী মতাদর্শের একটি অংশ এবং ওয়াহী ভিত্তিক যে আসমানি জীবন বিধান এটা তারই অংশ। এ কারণে যতক্ষণ আমি আমার ইসলামী মতাদর্শকে গোঁড়া থেকে, দালীল-প্রমানসহ উপস্থাপন না করছি, ততোক্ষণ 'ইতিযাল বা অন্যান্য প্রায়োগিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব না"।

এ পর্যায়ে আদালত তাকে থামিয়ে বলেঃ

"তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই বলতে পারো, তবে চেষ্টা করো সংক্ষেপে বলার"।

তারপর শুকরি আবার তার বক্তব্য শুরু করেঃ

১। আমি শুধুমাত্র আল্লাহ-র কাছ থেকে 'ইলম এবং দিক-নির্দেশনা অর্জন এবং 'ইলম বলে প্রচলিত অন্যান্য সকল কিছুকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করার বাধ্যতামূলক হওয়া নিয়ে আলোচনা করবো। কারণ যেই সনদে আল্লাহ্ নেই তা কখনো 'ইলম হতে পারে না।

---

[1] পাঠকের জ্ঞাতার্থে বলে রাখা প্রয়োজন, শুকরি মুস্তফা নিজেকে তার সময়ের মুজাদ্দিদ এবং রক্ষাকর্তা মনে করতো। সে বারবার আদালতে সরকারকে চ্যালেঞ্জ করতো এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কেউ তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং সে কখনোই মারা যাবে না। কিন্তু ১৯৭৭ সালে যখন মিশরীয় সরকার তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়, তখন কুফফারের হাতে তাদের 'রক্ষাকর্তা ও মুজাদ্দিদ' নেতার মৃত্যু দেখে, তার অনেক অনুসারির মোহ ভঙ্গ ঘটে। এ থেকে দেখা যায় কিভাবে এসব বাতিল ফিরকা এবং গোমরাহ দলগুলো শুধু শারীরিকভাবে (মুসলিমদের রক্তপাতের মাধ্যমে) উম্মাহকে ক্ষতিগ্রস্থ করে না, বরং তরুণদের চিন্তাকে কলুষিত করার মাধ্যমে উম্মাহকে মনস্তাত্ত্বিক ভাবেও ক্ষতিগ্রস্থ করে।

[2] 'ইতিযাল হল নিজেকে সমাজ বা কোন দল থেকে বিচ্ছিন বা আলাদা করে নেয়া। 'ইতিযালের একটি উদাহরণ হল, "মু'তাযিলা গঠনের পর ওয়াসিল ইবন 'আত্তার এই কথা "ই'তিযালনা" (আমাদের নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা করে নিলাম)। মু'তাযিলাদের এই আলাদা হওয়া, পরবর্তীতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় রূপ নেয়।

২। 'ইলম ও দিক-নির্দেশনা শুধুমাত্র আল্লাহ-র পক্ষ থেকে – এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করার পর, আমি এই কথাটির নিহিতার্থ ও মর্ম নিয়ে আলোচনা করবো।

৩। তারপর আমরা চূড়ান্ত ইসলামী লক্ষ্যসমুহ এবং সেগুলোতে পৌছানোর শারীয়াহ সম্মত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো। এই তিনটি বিষয় নিয়ে কথা বলার পর, সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে আমাদের কিছু কথা বলতে হবে...[1]

এ পর্যায়ে আদালত তাকে জিজ্ঞেস করেঃ

"তুমি কি বিশ্বাস করো, কুর'আন সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে (অর্থাৎ কোন রকম সন্দেহমুক্ত ভাবে) আল্লাহ্-র কাছ থেকে আগত?"

শুকরি জবাব দিলঃ

"আমি বিশ্বাস করি কুর'আন প্রায়োগিক দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে সন্দেহ মুক্ত। এ কারনে, কুর'আনের নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ্-র ইবাদাত করতে হবে এবং কুর'আনকে সম্মানিত করতে হবে, এবং কুর'আনের একটি অক্ষরকে পরিবর্তন করাও হারাম নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। কুর'আনকে বিচার ও শাসনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। আর আমাদের এই কাজের আদেশ করা হয়েছে"।

কোর্ট তাকে তখন জিজ্ঞেস করেঃ "অর্থাৎ তুমি বিশ্বাস করো তাত্ত্বিক দিক থেকে কুর'আন সম্পূর্ণভাবে সন্দেহমুক্ত নয়?"

শুকরি জবাব দিলঃ

[1] শুকরি মুস্তফা এ বিষয়ে দীর্ঘ বক্তব্য এবং কুর'আনের আয়াত উত্থাপন করে। কিন্তু এই আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য, আমরা শুধুমাত্র খারেজিদের আক্বিদা, বিশ্বাস, উপস্থাপন এবং তাদের প্রায়োগিক অর্থের সাথে জড়িত অংশগুলো বর্ণনা করবো। শুকরি মুস্তফা এ পর্যায়ে, বিভিন্ন 'আম দালীল দিয়ে যারা তাদের ইমামদের অন্ধভাবে অনুসরণ করে, তাদের ব্যাপক সমালোচনা করে। তার এইসব কথা নিয়ে সুন্নী মুসলিমদের কোন আপত্তি নেই। সমস্যা হল কিভাবে সে এবং তার দল তাদের ধারণাগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করছিল, তা নিয়ে।

"হ্যা (অর্থাৎ সে বিশ্বাস করে কুর'আন তাত্ত্বিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চয়তাপূর্ণ না!) এবং কোন রাখঢাক ছাড়াই আমি বলে চাই, কুর'আন কোন উপাস্য মূর্তি বা আকারে পরিণত হবার জন্য আল্লাহ্ একে নাযিল করেন নি। বরং এটা এই জন্য নাযিল করা হয়েছে যাতে মানুষ এটা অনুযায়ী কাজ করতে পারে। এজন্যই আমি বলেছি, আমাদের কুর'আনের নির্দেশ মেনে চলতে হবে এবং এর আদেশ অমান্য করা হারাম। আমি আরো বলি, প্রায়োগিক দিক থেকে, মানবজাতির কাছে যা কিছু আছে তার মধ্যে কুর'আনই হল সর্বাধিক নিশ্চয়তাপূর্ণ..."[1]

---

[1] এটা শুকরির একটি বিকৃত ও গোমরাহিপূর্ণ বক্তব্য। সে বিশ্বাস করে তাত্ত্বিক দিক থেকে কুর'আন সম্পূর্ণ নিশ্চয়তাপূর্ণ বা সংশয়হীন না। সে আসলে ইঙ্গিতে এখানে বলতে চাচ্ছে, কুর'আন কিতাব আকারে সংকলনের সময়ে সূরা আহযাব ও সূরা আত-তাওবাহ-র কিছু আয়াতের ক্ষেত্রে সংকলনকারী ব্যতীত শুধুমাত্র একজন সাহাবা সাক্ষী হিসেবে ছিলেন। কিন্তু সে যা ভুলে গেছে – ইচ্ছে করে বা ভুলবশত – তা হল, কুর'আন সংকলনের অনেক আগে থেকে মানুষ এই আয়াতগুলো তাদের সালাতে পড়ে আসছিল এবং হিফয করার সময় মুখস্থ করে আসছিলেন। যদিও তখনো কিতাব আকারে কুর'আন সংকলিত হয় নি, কিন্তু শিশুরাও সম্পূর্ণ কুর'আন হিফয করে রাখতো। সুতরাং, সম্পূর্ণ কুর'আন বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মুসলিমের দ্বারা, হিফয এবং তিলাওয়াতের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে কোন রকম মতবিরোধ বা বিতর্ক ছাড়াই। কুর'আন যে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক উভয় দিক থেকে সংরক্ষিত হয়েছে এটা তারই প্রমাণ। এমনকি আজো যদি কুর'আন কিতাব আকারে পাওয়া না যায়, তাও কিয়ামত পর্যন্ত সম্পূর্ণ কুর'আন বিশ্বাসীদের অন্তরে সংরক্ষিত থাকবে।

সবরকম বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে কুর'আনকে সংরক্ষণ করার প্রতিশ্রুতি স্বয়ং আল্লাহ্ নিজেই দিয়েছেন। কিতাব আকারে সংকলনের অনেকগুলো উপায়ের মধ্যে একটি উপায় মাত্র, একমাত্র উপায় নয়। আজকে কুর'আন সংরক্ষনের অন্যান্য আরো অনেক পদ্ধতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। হিফয করার পাশাপাশি, অডিও ও ভিডিও ফরম্যাটে এবং টেক্সট ফরম্যাটে কম্পিউটারে এবং মোবাইলে এবং এরকম আরো অনেক পন্থায়, আর সবগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্-ই ভালো জানেন, কুর'আন সংরক্ষণ করা হচ্ছে। শুকরি মুস্তফার এই বিচ্যুতি সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য, একটি উদাহরণ কল্পনা করুন। ধরুন, একজন ব্যক্তি রাস্তায় হাটছে। আপনি আর এই ব্যক্তি কথা বলা শুরু করলেন। কথায় কথায় ব্যক্তিটি আপনাকে বললো সে অ্যামেরিকার সংবিধানের উপর বিশ্বাস করে। কিন্তু সে আপনাকে অদ্ভুত এক হাস্যকর কথা বললো। সে বললো, সে বিশ্বাস করে অ্যামেরিকার সংবিধান অপরিবর্তনীয় এবং শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কখনই এটি পরিবর্তিত হয় নি। কিন্তু অনেক বছর আগে, যখন প্রথমবারের মতো এটা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিলো, তখন তা সঠিকভাবে করা হচ্ছিলো কিনা তা সে জানে না।

শুকরি তারপর বললোঃ

“যারা আজকে ইজতিহাদ করা বন্ধ করে দিয়েছে এবং তিন উৎস থেকে দালীল প্রমাণের ভিত্তিতে (ইজতিহাদ করাকে) বেআইনি বানিয়ে ফেলেছে- অথচ তাদের এই অবস্থান চার ইমামের বক্তব্যের বিরুদ্ধে যায় – আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মাযহাবগুলোকে রক্ষা করতে গিয়ে এই লোকেরা ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এই লোকগুলো কি আসলেই এটা চায়? না। বরং তারা সমগ্র উম্মাহর জন্য ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুধু নিজেদের জন্য তা খোলা রেখেছে। কারণ সরকারী ‘আলেমরা যেকোন সময়, শাসকের মাযহাব (মত) অনুযায়ী যেকোন ফাতাওয়া দিতে পারে, তা যেই মাযহাবই হোক না কেন।

এরা ইসলামের নামে হারামকে হালাল করার জন্য প্রচার চালায়। আমি চাইলে এই ব্যাপারে অতীত ও বর্তমান থেকে অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারি এবং কেউ এই ব্যাপারে আমাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। কারণ এটা আমাদের জীবনের বাস্তবতা। এরা সুদ, যিনা, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা, অশ্লীলতা এমনকি মদকেও ইসলামের নামে হালাল করেছে”।

আদালত এ সময় তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ

“কিভাবে ইসলামের নামে যিনা (বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক), রিবা (টাকা বা পন্যের বিনিময়ে সুদ গ্রহণ), খামর (সকল ধরণের নেশা দ্রব্য, যা চেতনাকে আচ্ছন্ন করে যেমন, গাঁজা, সিগারেট, মদ, হিরোইন, কোকেন, স্পীড (ইয়াবা বা ক্রিস্টালমেথ) ইত্যাদি) এবং অন্যান্য হারাম কাজ বা জিনিসকে হালাল করা হয়েছে?”

শুকরি জবাবে বললঃ

“ব্যাংকগুলো যে মুনাফা বা সুদ দেয় সেটাকে শাইখ আল-আযহার মুহাম্মাদ শালুত বৈধ বলেছেন। নিঃসন্দেহে শাইখ শালুত এই ফাতাওয়া দেয়ার সময় জানতেন, মানুষ তার এই

কি অদ্ভুত কথা! এতো বছর ধরে, এতো মানুষের হাতে এতে কোন পরিবর্তন হয় নি, কিন্তু যারা এটা লিপিবদ্ধ করেছিলেন (বা বর্ণনা করেছিলেন) তাঁরা এতে পরিবর্তন সাধন করেছিলেন?!!

ফাতাওয়ার প্রেক্ষিতে একে (সুদ বা মুনাফা) ইসলামি (হালাল) মনে করবে। এছাড়া শাইখ মুহাম্মাদ মাতুওয়ালি শা'রাউয়ী এই বিষয়ে বিশেষভাবে আল-আযহারের মাসজিদে বলেছেন, “বর্তমানে সরকারি ব্যাংকগুলো যে মুনাফা ব্যবহার করছে সেটা জায়েজ”। এটা ইসলামের নামে সুদকে হালাল করা”।

“খামরের ব্যাপারে আমরা দেখেছি শাইখ সা'দ জালাল বিয়ার পান করাকে কায়েজ বলেছেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “”আমার উম্মাহর কিছু লোক খামরকে অন্য নাম দিয়ে একে হালাল করবে”।[1]

“সরকার মানব রচিত আইনের মাধ্যমে যিনাকে হালাল করেছে। আজকে ইসলামের পক্ষ হয়ে কথা বলছে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশাকে জায়েজ মনে করেন। আমার মতে নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা হল যিনার প্রথম ধাপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “চোখ যিনা করা, কান যিনা করে এবং হাত যিনা করে”। এমনকি আজো আমরা দেখছি মাসজিদের ইমামগণ ইসলামের নামে এমন সব জিনিসের স্লোগান দিচ্ছেন যেগুলোকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন। যেমন, নারী ও পুরুষকে সমান মনে করা, আহলে কিতাব আর মুসলিমদের সমান মনে করা, জন্মবিরতিকরণ পিল এবং এরকম আরো জিনিসকে হালাল মনে করা যেগুলো ইসলামি শারীয়াহ অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে হারাম বলে প্রমাণিত। ইসলামের নামে শাইখরা এসব কিছুকে জায়েজ করছে”।[2]

---

[1] সাহীহ বুখারি, কিতাব আল-আশরাব (পানীয় সম্পর্কিত কিতাব)

[2] এই বিষয়গুলোতে, হারাম কাজগুলোকে চিহ্নিত করা এবং ঘৃণা করার ব্যাপারে প্রতিটি আন্তরিক মুসলিম শুকরি মুস্তফার সাথে একমত হবে। আমরা সবসময় বলি, আমাদের সময় খারেজিদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল, আমাদের দেশগুলোর শাসকরা শারীয়াহ পরিবর্তন করে নিয়েছে, মুসলিম বন্দীদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে অবিচার ও অপরাধ ছড়াচ্ছে। এরকম পরিতিস্থিতে, নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নতুন উদ্যমী ও উদগ্রীব সদস্য সংগ্রহ করা খারেজিদের জন্য অত্যন্ত সহজ। এ কারণে কিছু নীতির ক্ষেত্রে একমত পোষণ করার সময় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, এগুলো খারেজি নীতি না বরং এগুলো ইসলামি নীতিরই অংশ। এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর সদস্য হবার কারণে, আমাদের মধ্যে সত্য যে উৎস থেকেই আসুক, তা গ্রহণ করার মানসিকতা আমাদের থাকা

এভাবে শুকরি মুস্তফা এই বিষয়ে তার বক্তব্য চালিয়ে যেতে থাকে। এক পর্যায়ে আদালত তাকে থামিয়ে বললোঃ

"তুমি তোমার ভূমিকা বক্তব্য পেশ করেছো। এখন সমাজ থেকে নিজেকে এবং তোমার জামা'আকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে তোমাকে যে প্রশ্ন করা হয়েছে তার উত্তর দাও"।

শুকরি উত্তরে বললোঃ

"আমাদের এই মতাদর্শটিকে উপস্থাপনের জন্য আমি তিনটি বিষয় তুলে ধরতে চাইঃ

১। প্রথম বিষয়টি আমি ইতিমধ্যে তুলে ধরেছি, আলহামদুলিল্লাহ, আর তা হল আল্লাহ-র কাছ থেকে না, এমন সব বক্তব্য-প্রমাণ উপেক্ষা করা।

২। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, ইসলাম ও ইসলামি শারীয়াহর নিয়মাবলী..."

এই পর্যায়ে আদালত সেই দিনের জন্য কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করে এবং পরবর্তী তারিখ হিসেবে, পরের দিন ৭ই নভেম্বর ১৯৭৭ কে ধার্য করে।

পরের দিনের শুনানি শুরুর পর আদালত তাকে উদ্দেশ্য করে বলেঃ

"কাল আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম, সেখান থেকে শুরু কর"।

"যেহেতু আমি যে বিষয়ে কথা বলছি তা সরাসরি ইসলামি শারীয়াহর সাথে সম্পর্কিত, তাই উসুল আল ফিক্বহ- এর সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। যার মধ্যে প্রথম হল, নাম-সমূহের আলোচনা। আমি মনে করি কোন কিছুকে কোন নামে ডাকা বা কোন নাম দেয়া সে বিষয়ের মূল ধারণা বা নির্যাসের সাথে সম্পর্কিত। যখন আমরা বলি "অমুক এসেছে" বা "আমরা গাড়ি নিয়ে বের হলাম", তখন বোঝা যায় যে আমরা এমন কোন কিছু নিয়ে কথা বলছি যা হল বাস্তব অস্তিত্ব সম্পন্ন বিষয় বা বস্তু, যা মানুষের মধ্যে অবস্থান করছে।

উচিৎ। যেমন হাদিসের কিছু কিতাবে এমন হাদিস আছে যেগুলোর সনদে খারেজি বর্ণনাকারী আছে। এটা প্রমাণ করে এই ক্ষেত্রে পূর্বের খারেজিরা বিশ্বাসযোগ্য ছিল।

যদি "গাড়ি" শব্দের দ্বারা আমি প্রচলিত গাড়ি না বোঝাই তাহলে আসলে এই শব্দটি আমার মনের ভাব প্রকাশে, বা আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি তা প্রকাশ করতে সক্ষম হবে না। তাই আমি এভাবে বললে, আমি বাস্তবিক কি বোঝাতে চাচ্ছি এটা বোঝা সম্ভব হবে না। বস্তু সমূহের নাম সম্পর্কে এই ধারণাটা পরিষ্কার করার পর আমি এই বলে শুরু করতে চাই যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদম এবং তার সন্তানাদিকে এই পৃথিবীতে তাঁর খালিফাহ হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদমকে সকল কিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। সকল সৃষ্টি, যার মধ্যে ছিল অন্যান্য জীবজন্তু এবং মালাইকাবৃন্দ, তাঁদের সকলের মধ্যে থেকে আদম ছিলেন পৃথিবীতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত একমাত্র সৃষ্টি। আর যেসব নাম আদম সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে শিখেছিলেন, সেগুলো ছিল প্রকৃত, বিশুদ্ধ সঠিক নাম। আর এই নামগুলো শিখা ছিল শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে আদমের দায়িত্ব।

"পৃথিবীতে আল্লাহ-র মনোনীত খালিফাহ (ইসলামি শাসক যে আল্লাহ্-র কাছে গ্রহণযোগ্য) হওয়াও ছিল আদমের দায়িত্ব। যার অর্থ, আল্লাহ্ আদমকে ইবাদাত, ইসলাম, বাধ্যতা, ঈমান, কুফর, ওয়াহী সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁর (আদমের) খিলাফাহর সাথে সম্পর্কিত সকল কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ্ আদমকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এ নামগুলো বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। যার অর্থ হল, যদি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন 'একজন মুসলিম', তখন তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একজন প্রকৃত মুসলিমকেই বোঝাচ্ছেন যার মধ্যে একজন প্রকৃত মুসলিমের সেসব বৈশিষ্ট্য আছে যা আল্লাহ্ আদমকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কোন কিছুকে 'ভালো' বা 'মন্দ', 'সুন্দর' বা 'অসুন্দর' বলে বর্ণিত করেছেন তখন অবশ্যই এই শব্দ বা নামগুলোর দ্বারা সেই বস্তুর বাস্তবিক সুন্দর হওয়া বা কুৎসিত হওয়া, ভালো হওয়া বা মন্দ হওয়া প্রকাশ পেতে হবে।

অতএব এটা পরিষ্কার যে, কোন কিছুকে তার শার'ঈ নামে ডাকা হল হেদায়েতের মানাত (চিহ্ন বা প্রমাণ)। যখন এই নামগুলো বাস্তব অবস্থা থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন সম্পূর্ণভাবে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে আপনি মন্দকে 'ভালো' আর অসুন্দরকে 'সুন্দর' বলে ডাকতে শুরু করবেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মালাইকাদেরকেও এই

জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন, যখন তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁদেরকে বস্তুসমূহের নাম শিখিয়েছিলেন (এখানে শুকরি একটি আয়াত পেশ করে)। এখন সরাসরি এই সুচনা আলোচনার মূলে প্রবেশ করার জন্য, আমি এই সত্যটি তুলে ধরতে চাই যে ইসলামে ফিক্বহের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। ফিক্বহের কিতাবগুলোতে এখন এমন সব শব্দ খুজে পাওয়া যায়, যেগুলো শারীয়াহ নির্ধারিত নাম এবং বাক্যসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক...

আগে "ফাসিক" শব্দটির দ্বারা আমরা এই পরিবর্তনের একটি উদাহরণ দিয়েছিলাম। এখন দেখা যাক ফিক্বহে একজন "ফাসিক মুসলিম" – দ্বারা কী বোঝানো হয়। যখন ফিক্বহের কিতাবে "ফাসিক" ও "ফিসক্ব" শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়, তখন এর দ্বারা বোঝানো হয় "অবাধ্য" এবং "অবাধ্যতা"। কিন্তু শারীয়াতে ফাসিক্ব এবং ফিসক্ব দ্বারা বোঝানো হয় "কাফির" এবং "কুফর"। একইভাবে ফিক্বহের কিতাবে আপনি দেখবেন লেখা আছে "যালিম মুসলিম"। কিন্তু শারীয়াহতে যালিমের অর্থ অন্যভাবে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলছেনঃ

وَٱلۡكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

"আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম"।[1] (সূরা আল-বাক্বারা, ২৫৪)

---

[1] এবার শুকরির এই কথাগুলোর মাধ্যমে খারেজি আক্বীদার মূল বিপদজনক সমস্যা আমাদের সামনে তুলে ধরলো। খারেজিদের পদ্ধতি হল বিভিন্ন আয়াতকে একত্রে সংযুক্ত করে কুর'আন থেকে নিজের পছন্দ মতো হুকুম তৈরি করে নেয়া, আর তা হল গুনাহগার বান্দাদের কুফফার বলা। তার উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, সে এবং তার জামা'আ গুনাহগার (ফাসিক) মুসলিমদের কুফফার গণ্য করে, এই একটি (উপরে যে যুক্তিটি উত্থাপিত হয়েছে) যুক্তির দ্বারা। তারা এক্ষেত্রে মুসলিমদের কোন রকম ওযরের সুযোগ দেয় না। এখানে এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সে এখানে নিজের আগের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক একটি কথা বলেছে। কারণ ইতিপূর্বে সে বলেছিলো "আমাদের সব আয়াত ও হাদীস নিয়ে কাজ করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত দুটোর (আয়াত ও হাদীস) অর্থকেই গ্রহণ করা যাবে তারা একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া ছাড়া। কিন্তু সে নিজে এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই হাদিসটি অস্বীকার করেছে, যা বুখারি, তিরমিযী, আবু দাউদ এবং মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে - "আমি আমার উম্মাহর কবিরা গুনাহ করা ব্যক্তিদের জন্য শাফা'আত চাইবো"। এবং এরকম আরো অনেক হাদিস আছে। এছাড়া যে আয়াতে, যারা কোন সতী নারীর

ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেয় তাদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ফাসিকুন বলেছেন, শুকরি সেই আয়াতও অস্বীকার করেছে। এছাড়া সূরা হুজুরাতের ৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একজন ফাসিক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। "মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি (ফাসিকুন) তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে..."। এই ফাসিক ব্যক্তিটি ছিল একজন ব্যক্তি যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু মানুষের কাছ থেকে যাকাত আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই ব্যক্তিটি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলে যে, তাকে যে লোকদের কাছে পাঠানো হয়েছিল, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই আয়াতে এই ব্যক্তিতে ফাসিক বলেছেন। কিন্তু সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া ইজমা'ইন কখনো এই ব্যক্তিকে কাফির আখ্যায়িত করেন নি বা তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করতে বলেন নি। তাই এটা স্পষ্ট যে তাকফিরিদের কথার মতো ফিসক্ব শুধু এক প্রকারের হয় না। বরং ফিসক্ব দুই প্রকারের হয়ে থাকে। আর এটাই হল সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর মাযহাব বা মত।

একইভাবে সে যে আয়াতটি পেশ করেছে যেখানে বলা হয়েছে যারা যালিম তারা কাফির, এই আয়াতটিরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কুর'আন এবং সুন্নাহতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এমন অনেক লোক আছে যারা যুলুম করে এবং সে কারণে যালিম হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু তারা বড় যুলুম যা হল এমন কুফর বা শিরক, যা ব্যক্তিকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয়, তা করে না। শুকরি যে আয়াতটি ব্যবহার করেছে, সেটাকে এধরণের বড় যুলুমের জন্য ব্যবহার করা সঠিক। এছাড়া সূরা লুকমানের আরেকটি আয়াত আছে, যেখানে বলা হয়েছে শিরক হল বড় যুলুম। কিন্তু অন্যান্য আয়াত এবং হাদিসে অন্য ধরণের যুলুমের কথাও বর্ণিত হয়েছে। যেমন এই আয়াতে ছোট যুলুমের (যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না) কথা আলোচিত হয়েছেঃ

"আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অতঃপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও অথবা সহানুভুতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। আর যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই উপর যুলুম করবে।..." (সূরা বাক্বারা, আয়াত ২৩১)

নিশ্চয় যে ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর উপর অবিচার করবে আমরা তাকে কাফির বলবো না। এছাড়া আমরা জানি, যদি কোন ব্যক্তি ঝগড়ার কারণে বা রাগের মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে কারো হাড় ভেঙ্গে দেয়, তবে তাকে বলা হবে যালিম। শুকরি মুস্তফা আর তার দলের মতে, এতোক্ষন ধরে সে যে বক্তব্য রেখেছে সেটা অনুযায়ী এই ব্যক্তি কাফির (যালিম) হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে, শুকরির বক্তব্য কোন সামঞ্জস্য নেই। শুকরির যুক্তি অনুযায়ী কোন লোক যদি কোন বাচ্চার কাছ থেকে একটি ললিপপ ছিনিয়ে নিয়ে তা রাস্তায় ফেলে দেয়, তাহলে সে যুলুম করার কারণে যালিম হয়েছে এবং তাই একটি ললিপপের কারণে সেই ব্যক্তি কাফির হয়ে গেছে। এই হল – এ ধরণের গোমরাহি পূর্ণ মতাদর্শের ফলাফল। এধরণের চিন্তা ভাবনা মানুষকে ব্যাপক কঠোরতা এবং ঔদ্ধত্যের দিকে নিয়ে যায়। এবং শুকরির সুচনা বক্তব্যে এই কঠোরতা ও ঔদ্ধত্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

সে আরো বললোঃ

“এছাড়া কাল আমরা “তাউয়ীল” শব্দটি নিয়েও আলোচনা করছিলাম। ফিক্বহে এই শব্দটির অর্থ ধরা হয়, যে কোন কিছুর প্রকাশ্য অর্থ ত্যাগ করে অন্য কিছুর অর্থ গ্রহণ করা। কিন্তু শারীয়াহতে তাউয়ীল শব্দের দ্বারা কোন কিছু শেষ পর্যন্ত যে অবস্থা বা ফলাফলে উপনীত হবে, সেটাকে বোঝানো হয়।[1,1] এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ এটি একটি

যদিও তার যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল এবং সামঞ্জস্যতাহীন, কিন্তু তবুও সে মনে করছে কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম না। এ দলগুলো যা বুঝতে ব্যর্থ হয় তা হল, সকল কাফিরই যালিম এবং ফাসিক, কিন্তু এর বিপরীতটা সত্য না। কারণ, ঠিক যেমনি ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, একই রকমভাবে কুফরেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। এ ব্যাপারে আরো জানার জন্য “ঈমান” শীর্ষক বয়ান ১ ও ২ শুনুন (শাইখ আবু হামযা এখানে উনার একটি লেকচার সিরিযের কথা বলছেন)। এ ব্যাপারে আরেকটি উল্লেখযোগ্য হাদিস যা কাজে লাগতে পারে, তা হল এই হাদিসটি যেখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেছেনঃ “আজকে থেকে আমি আমার বান্দার উপর যুলুম নিজের উপর হারাম করেছি”। এখন বলুন কোন হতভাগা ব্যক্তি বলবে, এই বক্তব্যের আগে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা কাফির ছিলেন?! আমরা আল্লাহ-র কাছে এরকম কথা বলা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমাদের তাই বোঝা উচিৎ শুকরি যেসব দালীল প্রমাণ পেশ করছে সেগুলো আসলে তার বিরুদ্ধেই যাচ্ছে, তার পক্ষে না। কারণ এই আয়াতের মাধ্যমে তাই বোঝান হয়েছে যা আহলুস সুন্নাহ বিশ্বাস করে, আর তা হল সকল কাফিরই যালিম, কিন্তু সকল যালিমই কাফির না। আমরা এরকম আয়াত খুঁজে পাই যেখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা কুফফারকে অত্যাচারী বলেছেন, কিন্তু সকল অত্যাচারীদের কুফফার বলেছেন এরকম কোন আয়াত আমরা পাই না।

[1] সে এ বিষয়ে সঠিক মতটি ব্যক্ত করে নি। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আর কিতাবসমুহ থেকে আমরা দেখতে পাই, উলেমাগণ অনেক সময় তাউয়ীল শব্দটির দ্বারা তাফসিরকে বুঝিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে কোন কিছু শেষ পর্যন্ত যে অবস্থা বা ফলাফলে উপনীত হবে, সেটাকে। তাউয়ীলের যে সংজ্ঞা সে দিয়েছে “ কোন কিছুর প্রকাশ্য অর্থ ত্যাগ করে অন্য কিছুর বা অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করা”, এত শুধুমাত্র মু’তাযিলা (চরমপন্থি যুক্তিবাদী), আশা’ইরা (যারা আল্লাহ্ যা নিজের ব্যাপারে বলেছেন তার বাইরে গিয়ে আল্লাহ-র সিফাতসমূহকে ব্যাখ্যা করতে চায়) এবং জাহমিয়্যাহদের (যারা আল্লাহ-র সিফাত অস্বীকার করে) রচিত ফিক্বহের কিতাবে দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবত এখানে শুকরি আল-আযহারে পঠিত ফিক্বহের কিতাব সমূহের দিকে ইঙ্গিত করছে। কারণ আল-আজহার আজো আশ’আরি মাযহাবের অনুসরণ করছে এবং একে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামা’আর মাযহাব বয়লে দাবি করছে। কিন্তু আশ’আরি আক্বিদা আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আর আক্বীদা এক না।

বিপদজনক বিষয়। অতএব কেউ যদি কোন কিছুর ব্যাপারে এমন নাম উদ্ভাবন করে নেয় যা শারীয়াহতে নেই, তাদেরকে আমরা শুধু এই আয়াতের মাধ্যমেই জবাব দিতে পারিঃ

إِنۡ هِيَ إِلَّآ أَسۡمَآءٞ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى ٱلۡأَنفُسُۖ وَلَقَدۡ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلۡهُدَىٰٓ

"এগুলো কতগুলো নাম বৈ আর কিছু নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের রেখেছ। এর সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল নাযিল করেননি। তারা অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে"। (সূরা আন-নাজম, আয়াত ২৩)

আর এই মুহূর্তে আমি আপনাদের এটাই বলছি। আমার বিরুদ্ধে আল্লাহ-র শারীয়াহ ছাড়া আর কোন কতৃপক্ষের কর্তৃত্ব আমি স্বীকার করি না। যেমন আমরা চাই আল্লাহ-র মাসজিদ – এই কথাটির সঠিক ও প্রকৃত অর্থ সবাই জানুক। কারণ আল্লাহ্ আদমকে যা শিক্ষা দিয়েছেন এটা তার অন্তর্ভুক্ত। আমি ইতিপূর্বে যে দালীলিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছি তার ভিত্তিতেও

---

[1] সম্ভবত এই ব্যক্তি 'তাউয়ীল' শব্দটির ব্যাপারে ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। একজন নাবী-র মুখে এই শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে, যেমন সূরা ইউসুফে ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছেন, "হে পিতা এই হল তাউয়ীল"। একজন সাধারণ মানুষের মুখে এই শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে, যেমন আবু বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন, এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা করাকে তারা স্বপ্নের তাউয়ীল করা বলতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ স্বপ্নগুলো সম্পর্কে বলেছেন "Interpret it by its names within the visions." – এ থেকে বোঝা যায়, অনেক সময় আয়াতের তাফসিরে কিংবা ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমতিতেই তাউয়ীল শব্দটি ব্যবহার করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে একজন মালাইকাও তাউয়ীল শব্দটি ব্যবহার করেছেন এমন আয়াতের ব্যাপারে, যেটার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাঁকে কিছু গাইবের জ্ঞান দান করেছেন। এখানে এও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বয়ং সূরা আলে ইমরানের ৭ নম্বর আয়াতে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেনঃ "...আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না"। অবশ্যই এই অর্থ আর একজন 'আলেম যখন বলেন - "অমুক অমুক আয়াতের তাউয়ীল হল এই..." – তখন তার মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন ইমাম তাবারি রাহিমাহুল্লাহ যখন তার তাফসীর গ্রন্থে বলেনঃ "এই আয়াতের তাউয়িল হল এই এবং অমুক আয়াতের তাউয়ীল হল এই" – তখন তিনি "তাউয়ীল" শব্দটি দ্বারা বোঝাচ্ছেন ঐ আয়াতের প্রতিটি শব্দের বিশ্লেষণের পর তার সাধ্যানুযায়ী যে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা তিনি পেয়েছেন সেটাকে। এই ব্যক্তি (শুকরি মুস্তফা) এই সবগুলো অর্থের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে।

আপনারা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে আজ কোন মাসজিদে আপনি হয়তো এমন কোন সাইনবোর্ড বা নোটিশ ঝুলতে দেখবেন, যা আল্লাহ্ মাসজিদের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার সাথে সাংঘর্ষিক। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কেন অমুক মাসজিদে সালাত পড়ো না", তখন আমিই তাঁকে বলব আমার কাছে প্রমাণ করতে যে, আল্লাহ্ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং শারীয়াহ যেসব শর্ত দিয়েছেন, সেগুলো অনুযায়ী, ঐ মাসজিদকে আসলে আল্লাহ-র মাসজিদ বলা যাবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ

وَأَنَّ ٱلْمَسَـٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا

"এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে ডেকো না"। (সূরা জ্বিন, আয়াত ১৮)

এ থেকে প্রমাণ হয় মাসজিদ শুধুমাত্র আল্লাহ-র উদ্দেশ্য হতে হবে। মাসজিদে শুধুমাত্র আল্লাহ-র স্মরণ এবং আল্লাহকেই মহিমান্বিত করতে হবে। মাসজিদে আল্লাহ-র কোন সৃষ্টিকে স্মরণ করা যাবে না, আল্লাহ-র কোন সৃষ্টিকে, তাঁর কোন শত্রুকে মহিমান্বিত করা যাবে না, তাঁর দ্বীনের পাশপাশি অন্য কোন দ্বীনের প্রশংসা করা যাবে না। শুধুমাত্র তাঁর দ্বীনের জন্যই মাসজিদ। আল্লাহ্ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ

فِى بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْـَٔاصَالِ

"আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে"। (সূরা নূর, আয়াত ৩৬)

এবং এই আয়াতের মাধ্যমেও বোঝা যায় মাসজিদ শুধুমাত্র আল্লাহ-র জন্য হতে হবে, এবং মাসজিদে আল্লাহ-কে মহিমান্বিত করতে হবে। আল্লাহ আরো বলেছেনঃ

لَا تَقُمۡ فِيهِ أَبَدٗاۚ لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ فِيهِ رِجَالٞ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ

"...তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান"। (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ১০৮)

সুতরাং এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারছি, যে মাসজিদ শুধুমাত্র আল্লাহ-র ইবাদাত এবং তাকওয়া ব্যাতীত অন্য কিছুর ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে, সেটি আল্লাহ-র ইবাদাত করার জন্য যোগ্য স্থান না। আল্লাহ্ আমাদের বলেছেনঃ

أَجَعَلۡتُمۡ سِقَايَةَ ٱلۡحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ كَمَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَجَٰهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ لَا يَسۡتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না"। (সূরা তাওবাহ, আয়াত ১৯)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় হাজ্জীদের পানি পান করানো এবং বায়তুল্লাহতে অবস্থান করা অনেক বড় একটি 'আমল। কিন্তু তার মানে এই না যে যার আল্লাহ, আখিরাত এবং আল্লাহ-র কালামকে সর্বোচ্চ করার জন্য জিহাদ করার ব্যাপারে সঠিক বিশ্বাস নেই তার জন্য অজুহাত হিসেবে এটা কাজে আসবে। তাই শুধুমাত্র মাসজিদ বানানোর মধ্যে বৃহৎ কোন ফযিলাত নেই, যদি সেটা খোদ ক্বাবা হয়, তাও।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেছেনঃ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَۖ فَعَسَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ

“নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায ও আদায় করে যাকাত; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ১৯)

এগুলো হল আল্লাহ্‌র মাসজিদে অবস্থান করা এবং মাসজিদের কাজকর্মের কতৃত্ব গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত যা আল্লাহ্ সুবহানহু ওয়া তা’আ নিজে উল্লেখ করেছেনঃ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِۚ أُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ

“মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে”। (সূরা আত তাওবাহ, আয়াত ১৭)

তারপর শুকরি বললোঃ

“এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যদি কেউ এমন কোন কুফরি কাজ করে যা তার অবস্থা প্রকাশ করে দেয়, তখন সেটা তার কুফরীর সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে বিবেচিত হবে। কারণ সে তার এই কাজের মাধ্যমে তার নিজের কুফরের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে। এ কারণে এমন একজন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ-র মাসজিদ সমূহের দায়িত্বে থাকা কিংবা মাসজিদ পাহারা দেয়া কিংবা মাসজিদে অবস্থান করা বৈধ না, যদিও সে মাসজিদগুলোকে সম্মান করে তাও না। মক্কার মুশরিকরা তো ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীনের চিহ্ন হিসেবে বায়তুল্লাহকে সম্মান করতো, কিন্তু তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا۟ أَوْلِيَآءَهُۥٓ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"আর তাদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাদের উপর আযাব দান করবেন না। অথচ তারা মসজিদে-হারামে যেতে বাধাদান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এ অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা পরহেযগার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়"। (সূরা আল-আনফাল, আয়াত ৩৪)

তারপর শুকরি বললোঃ

"আমি এই আয়াতগুলো ব্যবহার এবং বিশ্লেষণ করছি যাতে করে আল্লাহ-র মাসজিদের শারীয়াহগত সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য উওস্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় যে আজকের মাসজিদগুলোতে কুর'আনে যেসব বৈশিষ্টের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো অনুপস্থিত।

তাই এই বিশ্লেষণের আলোকে এটা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, এই মাসজিদগুলোকে আমি কেন বর্জন ও ত্যাগ করেছি এই ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করার মতো এবং আমার বিরুদ্ধে উত্থাপন করার মতো কোন প্রমাণ বা যোগ্যতা কারো নেই। বরং এই ব্যাপারে আপনাদের বিরুদ্ধে আমার যুক্তি ও দালীল সুস্পষ্ট এবং এর বিরোধিতা করার মতো কোন কিছু আপনাদের কাছ নেই, কারণ রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ

"সমগ্র পৃথিবিকে আমার জন্য মাসজিদ বানানো হয়েছে এবং পবিত্র করা হয়েছে"।[1]

এবং আল্লাহ্ সুবহানহু ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ

"পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ"।[2]

---

[1] সাহীহ বুখারি

[2] সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত ১১৫

আদালত তখন তাকে প্রশ্ন করলোঃ

“মরহুম শাইখ আদ্ব-দ্বাহাবি[1] সম্পর্কে তোমার মত কি? উনি কি মুসলিম ছিলেন, নাকি কাফির?”

শুকরি জবাবে বললোঃ

“সে একজন কাফির ছিল”।

আদালত যখন শুকরিকে তার এই বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমানের ব্যাপারে প্রশ্ন করে, তখন শুকরি মুস্তফা বললোঃ

“আমার এই বক্তব্যের স্বপক্ষে আমার প্রমাণ হল, তিনি সরকারি ধর্মীয় বৃত্তিপ্রদান মন্ত্রণালয়ে কাজ করেছেন, তিনি একজন মন্ত্রী ছিলেন এবং মাসজিদে যিরারের একজন উচ্চপদস্থ ডাইরেক্টর ছিলেন। এছাড়া মন্ত্রনালয়ের শপথ নেয়ার সময় তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো বিচারের উপর কসম করেছেন। তাই এটি বলা সম্ভব না যে এটি উনি অজ্ঞানতাবশত

[1] এই শাইখ মুহাম্মাদ আদ্ব-দ্বাহাবি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর ছাত্র, পূর্বযুগের বিখ্যাত ‘আলেম ইমাম মুহাম্মাদ উসমান আদ্ব-দ্বাহাবী রাহিমাহুল্লাহ নন। এখানে যার ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তিনি ছিলেন আল-আযহারের ইমাম এবং ধর্মীয় বৃত্তি প্রদান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল মন্ত্রী। এছাড়া তিনি তাফসির আল-মুফাসসিরিন নামের তিন খন্ডের একটি প্রখ্যাত কিতাবের রচয়িতা। শুকরি মুস্তফার দলের আদর্শ ও নীতিসমূহকে আক্রমণ করার কারণে, ১৯৭০ সালে তারা তাঁকে অপহরণ ও হত্যা করে। তারা তাঁকে হত্যা করার অজুহাত আগে থেকেই খুজছিলো। জামাত আত-তাকফির যখন তাঁকে অপহরন করতে আসে তখন তাদের পরনে ছিল পুলিশের উর্দি। তারা তাঁকে তাঁর বাসভবন থেকে উঠিয়ে নিয়ে একটি গোপন স্থানে হত্যা করে। পরে মিশরীয় পুলিশ তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পায় এবং এই ঘটনা সরকারের জন্য সমগ্র দলটিকে গ্রেফতার করার এবং নিজেদের কুফর ও শিরক গোপন করার একটি সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এবং সরকার নিজেদের খারেজিদের বিপদজনক ধ্যানধারণা থেকে সাধারণ মুসলিম জনগণের হেফাযতকারী হিসেবে নিজেদের চিত্রিত করতে সক্ষম হয়। এবং এই অজুহাতে, যারাই শারীয়াহকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাঁদের সবাইকে সরকার “খারেজি” বলে প্রচার করা শুরু করে, এবং এর মাধ্যমে সাধারণ মুসলিম জনগণের মধ্যে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা এবং সুরক্ষায় অগ্রগামী হবার ব্যাপারে ভীতির সৃষ্টি করে।

করেছেন এবং রাষ্ট্র ও সমাজে আল্লাহ-র আইন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা সম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন।[1]

আধুনিক অন্যান্য খারেজি দলসমূহঃ

আধুনিক যুগে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে খারেজি দলের গঠনের ফলে চার ধরণের ফলাফল দেখা দেয়ঃ

১। কিছু তাকফিরি দল ইয়েমেনে পাড়ি জমায়।

২। কিছু সদস্য মিশর ও ইয়েমেন থেকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে চলে যায়। এদের মধ্যে এমন কিছু সদস্য ছিল যারা বন্দী অবস্থায় দীর্ঘ আলোচনার (অন্যান্য মুসলিম ও জিহাদি দলের সদস্যদের সাথে) প্রেক্ষিতে তাদের পূর্বের বিশ্বাস ও কাজের জন্য তাওবাহ করে।

৩। কেউ কেউ সরকারের চরে পরিণত হয়।

৪। কিছু লোক এমন ছিল যারা আগে চরমপন্থি তাকফিরি আদর্শের ছিল না, কিন্তু সরকারের হয়ে কাজ করার জন্য তারা এই আদর্শ গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে আফগানিস্তানে ও অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন মাজলিসে ও মুজাহিদিনের মধ্যে এই আদর্শ ছড়িয়ে দিতে থাকে। এছাড়া জিহাদের (আফগান জিহাদ) প্রস্তুতি গ্রহণের ছুতোয় এরা মুজাহিদিনের সংস্পর্শে আসতে সক্ষম হয়।

---

[1] আদালতে যা কিছু বলা হয়েছিল এবং এই দলের মাধ্যমে যে রক্তপাত হয়েছিল তার সবকিছু সম্পর্কে জানার পর আমরা অনুধাবন করতে পারি কেন আবু উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বানু উমাইয়্যাদের সময়ের খারেজিদের কাঁটা মাথা মাসজিদের সিড়িতে দেখে কাঁদছিলেন। কারণ যদিও আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতেন যে হাদীস অনুসারে পৃথিবীতে যাদের হত্যা করা হবে খারেজিরা তাঁদের মধ্য সর্বনিকৃষ্ট, কিন্তু একই সাথে তিনি খারেজিদের করুণা করেছিলেন, কারণ শয়তান তাদের তাক্বওয়া এবং দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতাকে বিকৃত করতে সক্ষম হয়েছিল।

আফগানিস্তানে যাবার প্রাক্কালে, অপেক্ষমাণ অবস্থায় দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে এরা অনেক মানুষের মধ্যে তাদের এই আদর্শ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। সে সময় এই আদর্শ ও ধারণাগুলোকে চ্যালেঞ্জ না করার কারণে তাকফিরি এবং খারেজিদের ফিতনা পাকিস্তানেও দেখা দেয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, এই লোকগুলো জামা'আ হিসেবে সংঘবদ্ধ ছিল না, কিন্তু তাদের আদর্শ ও ধারনাগুলো সুসজ্ঘবদ্ধ। এছাড়া তারা কিছু নির্দিষ্ট বই পড়া এবং সেগুলোকে একটি নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে নিজেদের উপর বাধ্যতামূলক করে নেয়।

যারা এই ধারনাগুলো গ্রহণ করে তারা একসময় আফগান জিহাদ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়, কারণ তাদের দৃষ্টিতে আফগানিস্তানের জিহাদ পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামি ছিল না। কিন্তু তাদের আর্থিক সহায়তার দরকার ছিল, তাই তারা ঐসব অনুদান এবং বৃত্তি গ্রহনে সচেষ্ট হয়, যেগুলো ফ্রন্টলাইনের যোদ্ধাদের প্রদান করা হতো। কিন্তু যেহেতু তারা যুদ্ধ করছিল না, তাই এই টাকা পাবার জন্য তারা মিথ্যা এবং প্রতারণার আশ্রয় নিতো। এর ফলে উম্মাহতে নতুন এক ধরণের খারেজিদের উদ্ভব ঘটে যারা ছিল পূর্বের খারেজিদের চাইতে আলাদা। কারণ পূর্বের খারেজিরা সত্যবাদী ছিল এবং তারা ইবাদাতের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিল এবং তাদের মধ্যে কিছু ভালো আচরণও লক্ষ্য করা যেতো। কিন্তু এই নতুন খারেজিরা কোন রকম ভয় ছাড়াই এবং অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনে অবলীলায় মিথ্যা বলতো, তাদের আচরণ এবং ব্যবহার ছিল অত্যন্ত নিচু মানের এবং তারা ইবাদাতের ব্যাপারেও সচেষ্ট ছিল না।

হাদিসের বেশ কিছু গ্রহণযোগ্য কিতাবে এমন কিছু হাদিস আছে যেগুলোর সনদে এমন বর্ণনাকারী আছে যারা ছিল খারেজিদের অন্তর্ভুক্ত। এই হাদিসগুলো গ্রহণ করা হয়েছিল, কারণ এই খারেজিরা মিথ্যা বলতো না এবং এই ব্যাপারে তারা ছিল কঠোর। আর এই নব্য খারেজিরা আফগানিস্তানের জিহাদ থেকে বিরত ছিল কারণ তারা মনে করতো শারীয়াহ ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা শাসক কাফির আসলি বয়লে গণ্য হবে, কাফির মুরতাদ হিসেবে না। কারণ এই শাসকদের কখনোই ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না।[1]

---

[1] এই বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য কিছুটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কাফির আসলি আর কাফির মুরতাদের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাফির আসলি হল এমন এক ব্যক্তি যে মুসলিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে (কারণ

এরা শাসকদের কাফির মুরতাদ মনে না করলেও মুজাহিদিনকে মুরতাদদীন মনে করে, কারণ মুজাহিদিনগণ শাসকদের কাফির আসলি মনে করেন না (বরং কাফির মুরতাদ মনে করেন)। এবং নব্য খারেজিদের এই চিন্তাগত অসুস্থতার কারনে তাদের কাছে মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয মনে হয় এবং তাদের ভাষ্যমতে "কাফির আসলি" শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগে, তারা মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে বাধ্যতামূলক মনে করে। তাদের এই ধরণের কাজের কারণে তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই হাদীস প্রযোজ্য "...তা মু'মিনদের হত্যা করবে এবং মুশরিকদের ছেড়ে দিবে"।

এরপর আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে তারা শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ, শাইখ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ সহ জিহাদি আন্দোলনের আরো অনেক নেতাকে মুরতাদ বলে ঘোষণা করে। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয়টি হল, প্রত্যেক বিদ'আর অস্তিত্ব টিকে থাকার জন্য ঔদ্ধত্য এবং অজ্ঞতা অপরিহার্য। তবে খারেজিদের বিদ'আর ক্ষেত্রে আলাদা আরো দুটি বৈশিষ্ট অপরিহার্য আর সেগুলো হল, ক্বাসওয়া (কঠিন হৃদয় এবং নিষ্ঠুরতা) এবং ঘিল (ঘৃণা ও বিদ্বেষ)। অবশ্য মুসলিমদের মধ্যেও ঘিল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু একজন মু'মিনের মধ্যে ক্বাসওয়া কখনোই থাকতে পারে না। ক্বাসওয়া হল এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা শুধুমাত্র কুফফার এবং বিদ'আতিদের মধ্য পরিলক্ষিত হয়।

সব শিশুই মুসলিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করে), কিন্তু পরিবার এবং পরিবেশের কারণে জ্ঞান হবার পর তারা কুফফারে পরিণত হয়। জ্ঞান হবার পর থেকে মুসলিম না, এমন কাফিরের উদাহরণ হলঃ মাদার তেরেসা, মহাত্মা গান্ধী, পোপ দ্বিতীয় জন পল ইত্যাদি। আর কাফির মুরতাদ হল এমন ব্যক্তি যে সব শিশুর মতোই মুসলিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিল, এবং তার মুসলিম পিতামাতা তাকে ইসলামি পরিবেশ, মুসলিম হিসেবেই বড় করেছিল। কিন্তু নিজের খেয়ালখুশি আর প্রবৃত্তির বশবর্তী হয় এই ব্যক্তি পরবর্তীতে মুরতাদ হয়ে যায়, কোন কুফরি বা শিরকি, বিশ্বাস, কাজ বা কথার মাধ্যমে। কিন্তু এই নব্য খারেজিরা কাফির মুরতাদরা রিদ্দা করেছে এটাই মনে করে না। এবং তারা এদের সাথে ইহুদী-নাসারাদের সাথে যেরকম আচরণ করার কথা, সেরকম আচরণ করে। অর্থাৎ যদি সুযোগ পায় তাহলে এই নব্য খারেজিরা কাফির মুরতাদদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করবে, আবার অন্যদিকে এরা এদেরকে দাওয়াহ দেওয়াকেও জরুরি মনে করে না। এই ধরণের অদ্ভুত বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে এসব দলের সদস্যদের বিকৃত মানসিকতারই চিহ্ন।

দুঃখজনকভাবে কিছু মুজাহিদিন, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়েছিলেন, তারা চিকিৎসাকালীন সময়ে অনেক ধরণের আলাপ আলোচনায় জড়িয়ে পরেন এবং নব্য খারেজিদের এই বিকৃত আদর্শ দ্বারা আক্রান্ত হন। এ থেকে দেখা যায়, বিদ'আর একমাত্র কাজই হল মনকে কলুষিত করা। যারা বলে খারেজিরা শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সময় ছিল এবং আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের সবাইকে হত্যা করেছিলেন, আমরা তাদের জন্য আলী ইবন আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর এই বক্তব্যটি বর্ণনা করতে চাই। খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের পর লোকেরা আলি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, এই বলে যে – আল্লাহ্ আপনাদের হাতে খারেজিদের নির্মূল করেছেন। আলি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেনঃ

"না, আল্লাহ-র কসম, তারা এখনো পুরুষদের পৃষ্ঠদেশ এবং নারীদের গর্ভে বিদ্যমান। আর যখন এরা বিদ্যমান থাকে (এদের আবির্ভাব ঘটে), তখন এরা কাউকে ছাড়ে না (অর্থাৎ সবাইকে আক্রমণ করে)।"[1]

খারেজিদের ব্যাপারে মন্তব্য করার সময় শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ

"আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে চিহ্নের কথা বলেছেন এটা হল খারেজিদের প্রথম দলের চিহ্ন। কিন্তু তার অর্থ এই না যে শুধু এরাই (খারেজিদের প্রথম দল) একমাত্র খারেজি দল যাদের কথা হাদিসে বলা হয়েছে, কারণ অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন দাজ্জালের যুগ পর্যন্ত খারেজিদের আবির্ভাব ঘটতে থাকবে। এ কারনে মুসলিমরা একমত যে, আলি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যাদের বিরুদ্ধে নাহরাওয়ানে যুদ্ধ করেছিলেন, তারাই একমাত্র খারেজি দল না"।[2]

---

[1] আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া খন্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৯৫

[2] মাজমু'আ ফাতাওয়া, খন্ড ২৮, পৃষ্ঠা ৪৯৫-৪৯৬

এখন প্রশ্ন হল এই উম্মাহর ‘আলেমদের ফাতাওয়া অনুযায়ী কিভাবে আধুনিক সময়ের খারেজি ও তাদের ফিতনার মোকাবেলা করা উচিৎ?

পশ্চিমা বিশ্বে অবস্থিত খারেজিঃ

এখনো পর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্বে খারেজিদের আবির্ভাব ঘটে নি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমা বিশ্বে আশঙ্কাজনক হারে তাকফিরি ধ্যানধারণার উত্থান ও প্রচার ঘটেছে। যাদের মধ্যে তাকফিরি ধারণার প্রসার ঘটেছে তাদের অধপতন এখনো খারেজি শ্রেণী পর্যন্ত পৌছেনি, কারণ তারা এখনো তাদের ধারণার উপর ভিত্তি করে মুসলিমদের হত্যা করা শুরু করে নি। এখনো পর্যন্ত এদের কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র কথাতেই সীমাবদ্ধ।[1] এবং তাকফিরি এবং খারেজিদের মধ্যে মূল পার্থক্য এটিই (খারেজিরা তাদের তাকফিরি বিশ্বাসের উপর আমল করে, আর তাকফিরিরা তাদের তাকফিরি বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করে না)। তাই আমাদের মনে রাখা উচিৎ সকল খারেজিই তাকফিরি, কিন্তু সকল তাকফিরিই খারেজি না।

আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই হাদিসটি মনে রাখা উচিৎ, যেখানে তিনি বলেছেনঃ “তারা মুসলিমদের হত্যা করবে এবং মুশরিকদের ছেড়ে দিবে”। তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিন্তু বলেন নি - “তারা মুসলিমদের উপর তাকফির করবে আর মুশরিকদের ছেড়ে দিবে”। পশ্চিমা বিশ্বে এখনো পর্যন্ত আমরা যে ছদ্মবেশী খারেজিদের দেখতে পাচ্ছি তাদের কর্মকান্ড এখনো পর্যন্ত শুধু তাকফিরের মধ্যেই সীমিত, এখনো তারা তাদের বিশ্বাসের কারণে মুসলিমদের হত্যা করা শুরু করে নি।

---

[1] শাইখ আবু হামযার এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০০ সালে। তখনো পর্যন্ত শাইখ যে তাকফিরিদের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের কর্মকাণ্ড শুধু কথাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পশ্চিমা বিশ্বে যারা তাকফিরি আদর্শের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছে তারা এবং তাদের অনেক অনুসারীরা এখন কথা থেকে তাদের বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করা শুরু করেছে। এই তাকফিরিরা এমনকি সমগ্র সিরিয়ার সকল মুজাহিদিন দলকে এবং সাধারণ মুসলিমদের তাকফির করেছে এবং অনেক মুসলিম তাদের হাতে নিহত হয়েছে। - অনুবাদক

খারেজি এবং তাদের শাখা তাকফিরিদের মূলত চার ভাগে বিভক্ত করা সম্ভবঃ

১। ক্ষমতাসীন খারেজি। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং এদেরকে কখনোই মুসলিমদের জান, মাল ও সম্মানের উপর কতৃত্ব করতে দেয়া যাবে না।[1] *"ক্ষমতাসীন খারেজি"* শীর্ষক অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

২। সেসব খারেজি যারা মুরতাদ এবং বিদ'আতি শাসকগোষ্ঠী যেমন শি'আদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এসব খারেজিদের একা ছেড়ে দেয়া হবে এবং আমরা আশা করবো এরা একে অপরকে শেষ করে দেবে। কিন্তু যখনই এই খারেজিরা মুসলিমদের রক্তপাত করবে, তৎক্ষণাৎ কোন সন্দেহ ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে হবে। মুসলিমদের খারেজির ধ্যানধারণা এবং সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে অবহিত এবং প্রস্তুত করতে হবে, যাতে করে প্রয়োজন দেখা দিলে মুসলিমরা যেন খারেজিদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে প্রস্তুত থাকে। এ ব্যাপারে *"আলজেরিয়ার খারেজিরা"* অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

৩। সেসব খারেজি যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ তারা হক্কের পথে প্রত্যাবর্তন না করে অথবা নিশ্চিহ্ন না হবে।

৪। তাকফিরিরা, যারা এখনো খারেজি পর্যায়ে উন্নীত হয় নি, এরা কুর'আনের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে মুসলিমদের কুফফার আখ্যায়িত করছে এবং গোপনে তাদের ধারণা প্রচার করছে।[1]

---

[1] *যদিও শাইখ এখানে ক্ষমতাসীন খারেজি বলতে আল-সাউদ শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের মতো অন্যান্যদের বোঝাচ্ছেন, তবে তা সত্ত্বেও এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, যদি খারেজিরা কখনো মুসলিমদের উপর অস্ত্রের জোরে কতৃত্ব অর্জন করে, তবে তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে। যদি যুদ্ধ চলছে এমন কোন অঞ্চলের কিছু অংশে খারেজিরা কতৃত্ব অর্জন করে, তবে তাদের কতৃত্ব মেনে নিতে হবে এমন কোন বিধান নেই। বরং মুসলিমদের প্রতিরক্ষার জন্য এই খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। মুসলিমদের জান-মাল-সম্মানের উপর খারেজিদের কতৃত্ব করতে দেয়া যাবে না, কারণ খারেজিদের হাতে মুসলিমদের জান-মাল-সম্মান কোন কিছুই নিরাপদ না। - অনুবাদক*

দুঃখজনকভাবে চতুর্থ শ্রেণির লোকেরা বর্তমানে আমাদের আশেপাশেই আছে, যারা এই খারেজি আদর্শ ধারণ করে এবং তাকফিরকে তাদের নিজেদের জমিদারি মনে করে। যারা তাদের জমিদারির অংশ হয়, তাদের সাথে প্রথমে খুব ভালো ব্যবহার করা হয়, অভিনন্দন জানানো হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের কাছ থেকে পূর্ণ আনুগত্য দাবি করা হয়। কেউ যদি তাদের এই দল ত্যাগ করতে চায় তখন সেটাকে রিদ্দা বা কমপক্ষে নিফাক্ব বলে গণ্য করা হয়।

কখনো কখনো তাদের মধ্যে ভিন্ন মতালম্বীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জঘন্য কৌশল ব্যবহার করে। যেমন তারা স্ত্রীকে বলে স্বামীকে ছেড়ে আসতে, কিংবা স্বামীকে বলে তার স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে, কারণ সে তাদের দলের পবিত্র শাইখের আদেশ মানতে রাজি হয় নি। অনেকসময় এসব দলের নেতারা, ভিন্ন মতাবলম্বীদের সাথে কোন রকম আলোচনা কিংবা সম্মতি ছাড়াই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। এ ধরণের তাকফিরি দলের বৈশিষ্ট হল এরা কাজের লোক না, কথার লোক। তাই যারা আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী শাসন করে না, যারা মাজারপূজারি এদেরকে এরা কুফফার বলে, কিন্তু নিজের হাতের মাধ্যমে এই অন্যায় অপসারনে তারা সচেষ্ট হয় না।

---

[1] *শাইখের এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, খারেজিরা বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। যদি তারা মুসলিমদের ছেড়ে দিয়ে মুরতাদ ও শি'আ-রাফিদ্বাদের মতো বাতিল ফিরকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে, তাদেরকে বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাহ কিছু করবে না। যেমন ইরাকে, কিংবা ইরানে যদি কোন খারেজি গোষ্ঠী শি'আ-রাফিদ্বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তাদেরকে তাদের মতো ছেড়ে দেয়া হবে। তবে তাদের কর্মকান্ডের সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, কারণ ঐতিহাসিকভাবে খারেজিরা কখনোই আহলুস সুন্নাহকে ছেড়ে দেয় নি। তাই সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ মোকাবেলার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। একথা তাকফিরিদের বেলাতেও প্রযোজ্য। যখনই এরা মুসলিমদের আক্রমণ করবে তখনই তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্বক যুদ্ধ শুরু করতে হবে। যেমন আফগানিস্তানে কিংবা লিবিয়াতে খারেজিরা যদি মুজাহিদিনকে আক্রমণ করে তবে তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্বক যুদ্ধ শুরু করতে হবে। আর কোন অবস্থাতেই খারেজিদের মুসলিমদের উপর কতৃত্ব করতে দেয়া যাবে না। তারা যদি গায়ের জোরে ক্ষমতা অর্জনও করে, তবে অস্ত্রের মাধ্যমেই তাদেরকে উৎখাত করতে হবে, কারণ আহলুস সুন্নাহর জান-মাল-সম্মান তাদের হাতে নিরাপদ না। - অনুবাদক*

এদের মধ্যে যারা তাওহিদুল হাক্কিমিয়্যাহর কথা বলে, হাক্কিমিয়্যাহ প্রতিষ্ঠার জন্য নূন্যতম যে কাজগুলো করা উচিৎ তারা সেগুলো করে না, যেমন- শারীরিক ট্রেনিং, জিহাদে যোগ দেয়া, যারা জিহাদ করছেন তাদের সংশয়পূর্ণ বিষয়ে তাদের ব্যাপারে সুধারণা রাখা ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা মুজাহিদিনকে গোমরাহ বলে থাকে এবং মানুষকে মুজাহিদিনের সাথে যোগ দিতে নিরুৎসাহিত করে। প্রকৃতপক্ষে তারা অন্তরে মুজাহিদিনের প্রতি বিদ্বেষ লালন করে। তারা মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে, যেন মানুষ মুজাহিদিনের অনুসরণ না করে এবং তাঁদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ না করে। বিবেকবান যেকোন মুসলিমের কাছেই এটা স্পষ্ট, যদি আপনি কিছু বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনার উচিৎ শুধু এই ব্যাপারে কথা না বলে, সেটাকে কাজে পরিণত করা। অথচ এই লোকগুলো ইসলামি সশস্ত্র দলে পরিণত হবার পরিবর্তে ইসলামি অপবাদদানকারী দলে পরিণত হয়েছে।

তাকফিরি নেতারা তাকফিরের মেশিন গানে পরিণত হয়েছে। আর এসব দলের সদস্যরা আল্লাহ-র দ্বীন শিক্ষার চেয়ে সামাজিক দিক নিয়ে অধিক চিন্তিত।

খারেজিদের প্রতি আমাদের আচরণ কিরকম হওয়া উচিৎঃ

খারেজিদের এবং রাফিদ্বাদের (ইমামী শি'আ) মধ্যে যারা দুর্বল এবং অসহায় তাদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ

"আলি এবং উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া ইজমা'ইন থেকে বর্ণিত হয়েছে, এবং এই ব্যাপারে ইসলামের 'আলিমগণের ইজমা আছে যে এই দুই ব্যক্তিকেও (অর্থাৎ দুর্বল ও অসহায় খারেজি এবং দুর্বল ও অসহায় রাফিদ্বা ব্যক্তি) হত্যা করতে হবে। যে ব্যক্তি যুদ্ধ করছে না তার ব্যাপারে কিছু কিছু 'উলেমার মধ্যে মতভিন্নতা হয়েছে, কিন্তু তারা সকলে একমত যে দলের মধ্যে থাকলে তাদের হত্যা করা যাবে, কারণ তারা দলকে অস্ত্র দিয়ে

প্রতিরক্ষা করছে। কারণ এখানে হত্যার চেয়ে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুকুমের প্রযোজ্যতা অধিক”।[1]

উপমহাদেশ এবং আলজেরিয়াতে খারেজি চিন্তাধারার উত্থানঃ

উপমহাদেশে খারেজি চিন্তাধারার উত্থান সূত্রপাত ঘটে মূলত পাকিস্তানে। এমনকি এখনো খারেজি চিন্তাধারার সেখানে আছে এবং যারা এই চিন্তাধারা ধারণ করে, সেখানে তাদের কাজ অব্যাহত আছে। পাকিস্তানের এই খাওয়ারিজদের তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১। যারা পাকিস্তান থেকে তাদের পিতৃভূমি, বিভিন্ন মুসলিম ভূমিগুলোতে ফিরে গেছে যাতে তাদের মতাদর্শ এবং মিশন নিয়ে তারা আরোবেশি সংখ্যক মানুষের মধ্যে কাজ করতে পারে।

২। একটি বড় অংশ আলজেরিয়াতে গিয়েছে। এবং আলজেরিয়াতে এদের আগমনের ফলে কয়েক শতাব্দীর পর এই বিকৃত আদর্শ সেখানে স্থান করে নিয়েছে।

৩। যারা এখনো পাকিস্তানে আছে এবং তাদের মতাদর্শ অনুশীলন করছে। এই ব্যাপারটা সেখানকার সরকারী এজেন্টরা জানে এবং তারা এটাকে জিহাদ এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। (অর্থাৎ এই খারেজিদের সরকারী গোয়েন্দারা, ইসলাম ও জিহাদের বিরুদ্ধে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছে)

আলজেরিয়ার খারেজিদের ব্যাপারে আলোচনাঃ

আলজেরিয়াতে আধুনিক যুগে খারেজি মতাদর্শের ব্যাপারে একটি গবেষণা করা হয়েছিল। অদ্ভুত ব্যাপারটা হল, যারা সেই গবেষণাটি করেছিল, তাদেরকেই উম্মাহর অনেকে সেসময় খারেজি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। নিজেদের পরিচয় এবং উদ্দেশ্যের সমর্থনে তারা

[1] মাজমু'আ ফাতাওয়া, খন্ড ২৮, পৃষ্ঠা ৪৭৬-৪৭৯

(যারা খারেজিদের ব্যাপারে গবেষণা করেছিল) তাদের মতাদর্শ একটি বুকলেট আকারে প্রকাশ করে।

পরবর্তীতে, এই দলটি, যারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা’তের পক্ষে খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল এবং উম্মাহকে খাওয়ারিজদের হুমকির ব্যাপারে সতর্ক করছিল, তারাই নিজেদের মূলনীতি পরিত্যাগ করে শতাব্দীর অন্যতম ভয়ংকর খারেজিতে পরিণত হয়েছিল।

(তাদের এই বিবর্তনের পূর্বে সংঘটিত) গবেষণায় দেখা যায় যে, তৎকালীন সময়ে[1] আলজেরিয়াতে খারেজি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল পাকিস্তান থেকে এমন একটি দলের মাধ্যমে, যাদের কুখ্যাত জামাত আত-তাকফির ওয়াল হিজরাহর সাহে সরাসরি সম্পর্ক ছিল। যেটা সরাসরি মিশরের জামা’তুত তাকফির ওয়াল-হিজরাতের সাথে সম্পর্ক ছিল। এই দল যারা আল-মুওয়াহিদীন নামে নিজেদের পরিচিতি দিত। ড. আহমাদ নামক এক অজ্ঞাত ও রহস্যময় লোক তাদের গুরু এবং আধ্যাত্মিক নেতা ছিল।

তারা বিভিন্ন মসজিদে তাদের মতাদর্শের দাওয়াহ শুরু করে, এবং তৎকালীন আলজেরীয় সরকারের (১৯৮৯-৯০) বিরুদ্ধে ওয়াহরা এবং বিল আব্বাস নামক এলাকায় জিহাদের ব্যানারে ছড়াতে থাকে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল আলজেরিয়ার মুরতাদদীন (ধর্মত্যাগী) শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র বাহিনী তৈরী করা এবং জিহাদ শুরু করা। কিছুকাল পর যখন কিছু সালাফি মুজাহিদ এবং সাধারণ উলামাদের কাছে তাদের চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ল, যখন তারা তাদের মসজিদ ছাড়া অন্য সকল মসজিদকে ক্ষতিকর এবং ওইসব মসজিদে সালাত আদায়কারীদের কাফির-মুশরিক বলা শুরু করল।

---

[1] এটা শুকরি মুস্তফার গ্রেফতার এবং মিশরে জামাত আত –তাকফির ওয়াল হিজরা বা জামাতুল মুসলিমীনের ছত্রভঙ্গ হবার পরের ঘটনা। শুকরি মুস্তফার মৃত্যু হয় ১৯৭৮ এ। এ গবেষণা সংঘটিত হয়েছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদের শেষে কিংবা শেষ পর্যায়ে। অর্থাৎ ৮০-র দশকের শেষদিকে। অর্থাৎ আমরা যদি শুকরি মুস্তফা এবং মিশরে যারা তাঁর সমসাময়িক অনুসারী ছিল, তাদের আধুনিক যুগের খারেজিদের প্রথম প্রজন্ম হিসেবে ধরি, তাহলে বলা যায় এই গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল, শুকরি মুস্তফার উত্তরসূরি, আধুনিক খারেজিদের দ্বিতীয় প্রজন্ম।

এই মাত্রাতিরিক্ত রকমের কঠোর এবং অতিরঞ্জিত রায়টি নিম্নোক্ত নীতির ভুল ব্যাখার মাধ্যমে দেয়া হয়েছিলঃ

“যে কাফিরকে কাফির বলে না, সে নিজেও একজন কাফির।”[1]

এই খারেজিরা প্রাথমিকভাবে এটা দ্বারা বোঝাতো, যারা বর্তমান শাসকগোষ্ঠিকে কাফির বলে না, তারাও কাফির। এমনকি একপর্যায়ে তারা FIS (Islamic Salvation Front) এর নেতাদের কাফির বলা শুরু করে, যদিও তখনও তারা FIS এর অনুসারী এবং সমর্থকদের কাফির বলত না। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য শুরু করল। তাদের মদ্যে কেউ কেউ বললো, FIS এর নেতা অথবা অনুসারীদের কাফির না বলেও আমরা মুরতাদ শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারি।

স্বাভাবিকভাবে বিষয়টা নিষ্পত্তি না হওয়ায়, তারা মতপার্থক্য নিরসনের লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে একটি বিতর্ক আয়োজন করে। বিতর্কটি বাব আল-ওয়াদ নামক এলাকায়, মসজিদ আত-তাকওয়াতে অনুষ্ঠিত হয়।

বিতর্কের পর মূল তাকফিরি দলটি FIS এর নেতাদের কাফির বলার ব্যাপারে আরো দৃঢ় হয়, এবং ফাতওয়া দেয় যে, যারা FIS কে কাফির বলবে না, তারা নিজেরাও কাফির-মুশরিক। এর ফলে আল-মুওয়াহিদীন দলটির মধ্যে একটি বিভক্তি দেখা দেয়। তাকফিরি দলটি তাদের মূলদলের নাম ধারণ করে এবং ভাগ হয়ে যাওয়া দলটি নিজেদের আনসার আত-তাওহীদ বলা শুরু করে। মূল দলটির বেশিরভাগ সদস্যই এই ঘটনার আগে আফগানিস্তানে ছিল। দলটির নেতা সাইফ আল-মাগরিবী নামক একজন লোক। সে পরে বাল কুল নামক এলাকায় মসজিদে লাখালে আরো একটি দলকে মূল দলটির সাথে অন্তর্ভূক্ত করে। এই পরের দলটির আমীর হচ্ছে আহমদ হুসাইন, যখন আধুনিক যুগের খারেজিদের নিয়ে গবেষণাটি লেখা হচ্ছিল, তখন সে জিরকাজিরা কারাগারে বন্দী ছিল।

---

[1] নাওয়াকিদ্ব উল-ইসলাম

শোনা যায়, সে পরবর্তীতে তাকফিরের ব্যাপারে বিদ'আত থেকে সরে আসে, তাওবাহ করে এবং কারাগার থেকেই মূল দলের কাছে এই ব্যাপারে উত্তর দিয়ে চিঠি লেখে।

সালাহুদ্দিন আইউবী মসজিদে নুরুদ্দীন সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আরেকটি দলের উত্থান ঘটে। এসময় আবু আমীনা বাব আল-ওয়াদে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। আবু আমিনা আলজেরিয়াতে ফিরে আসার আগে পেশোয়ারে ছিল এবং সে ৫ বছরেরও বেশি সময় আফগানিস্তানে কাটিয়েছিল। ওই গবেষণাটি যখন লিখা হচ্ছিল, সে তখন কারাগারে, এবং তখনো খারেজি আক্বিদা ও মানহাজের উপরই ছিল।

এই উল্লেখিত দলগুলো আলজেরিয়ার সালাফি মুজাহিদদের কাফির-মুশরিক বলে আখ্যায়িত করা শুরু করে। অথচ এই মুজাহিদরা শাসকগোষ্ঠিকে মুরতাদীন এবং গণতন্ত্রকে কুফর বলতেন। কিন্তু তাকফিরিদের জন্য এটা যথেষ্ট ছিল না। যারা FIS এর নেতাদের কাফির ঘোষণা করতো না, তাকফিরি দলগুলো তাদের সবাইকে কাফির ঘোষণা করে।

১৯৯১ সালে রহস্যময় ড. আহমাদ একটি বড় দল নিয়ে পেশোয়ার থেকে আলজেরিয়া আসে এবং তাদের মাধ্যমে আলজেরিয়ার তাকফিরি দলগুলোর আক্বীদা বিশ্বাসে বেশ বড় ধরনের পরিবর্তন আনে। তারাউযর বিল জাহল[1] এবং ব্যাখ্যার (তাউ'য়ীল, যেটার ব্যাপারে উম্মাহ এবং উলামাগণ একমত) গ্রহণযোগ্যতাকে তাকফিরের প্রতিবন্ধক হিসেবে[2] পুরোপুরি পরিত্যাগ করে। ফলে এবার তারা আলেজিয়ার সবাইকে কাফির খেতাব দেয়। এমনকি যারা গণতন্ত্রকে কুফর বলে এবং নেতাদের (FIS) তাকফির করে, তাদেরও!

---

[1] এটা হচ্ছে অজ্ঞতার অজুহাত। কোন ব্যাক্তি হয়ত তার কাজ অথবা কথার মাধ্যমে কুফর করেছে, কিন্তু এই ব্যাপারে, অর্থাৎ ঐ কথা বা কাজের কুফর হবার ব্যাপারে, তার কোন জ্ঞান নেই। এক্ষেত্রেতাকে কাফির বলা যাবে না। নবীজী (সা) এর সময়ে এইরকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে কথা বা কাজের মধ্যে কুফর পাওয়া গিয়েছে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার দরুণ ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

[2] দূর্ভাগ্যবশত বর্তমানে এমন লোকও আছে যারা তাদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তির জন্য এইরকম তাকফিরী মতাদর্শের বিস্তার ঘটায়।

উম্মাহ সাধারণ সদস্যদের পক্ষ থেকে তাদের এ ধরণের ধ্যানধারণার প্রতিবাদ হওয়া সত্ত্বেও এরা এসব মুসলিমদের কুফফার আখ্যায়িত করে। এরপরে তারা ড. আহমাদের লিখিত "হিজর উল-জাললিয়া" ('FIS এবং গণতন্ত্র ধর্মের অনুসারীদের পরিষ্কার কুফরের সুস্পষ্ট প্রমাণ') নামক একটি বই প্রকাশ করে। নূরুদ্দীন সিদ্দিকির লিখিত আরেকটি বই তারা প্রকাশ করে যার নাম, "কাশফুজ জুননুন আন-আকীদাত খাইরুন কারুন" (প্রথম প্রজন্মের আকীদার ব্যাপারে ভ্রান্তির অপনোদন)। যারা পরবর্তীতে GIA এর গঠন ও বিস্তার ঘটায়, শেষোক্ত বইটি তাদের মতাদর্শের মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে।

পরিস্থিতি যখন ব্যাপকভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো, তখন সালাফী মুজাহিদরা বিভিন্ন মাসজিদে এই দুইটি তাকফিরী দল এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দলগুলো থেকে মুক্ত করে ১৯৯২ বিশুদ্ধ জিহাদের ঘোষণা দিলেন। মসজিদ থেকে বিতাড়িত হবার পর, তাকফিরী দল দু'টি একই বছর বানি মুরাদ ইমবালাদা তে একত্রিত হয়ে একজন আমীর নিয়োগ দেয় এবং কিভাবে যুদ্ধ করবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়।

এসময় এই তাকফিরি এবং GIA এর মধ্যে চরম বিরোধিতা ও মতপার্থক্য ছিল। এ সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণের জন্য তারা অনেকগুলো বিতর্কেরও আয়োজন করে। সেগুলো পর্যালোচনা করে আমরা আলজেরিয়ার তাকফিরী দলগুলোর আক্বীদা সম্পর্কে ১০ টি বৈশিষ্টকে চিহ্নিত করতে পারি।

১। তারা সকলে একমত যে, তাকফিরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে উজর-বিল-জাহল (অজ্ঞতার অজুহাত) কিংবা তাউয়ীল (ব্যাখ্যা) গ্রহণযোগ্য নয়।

২। তারা বিশ্বাস করত, কেউ যদি সামান্যতম শিরকও করে ফেলে, তবে সে কাফির; এমনকি যদি সে এই শিরক করার সময় এই কাজের শিরক হবার ব্যাপারে অজ্ঞ হয়ে থাকে, কিংবা সে যদি কোন হাদিসের (ভুল) তাউয়ীলের ভিত্তিতে কাজটি করে থাকে, অথবা সে যদি ছোটখাটো কোন শিরক করে তবে তাদের মতে, সেই ব্যাক্তিটি কাফির।

৩। তারা আরো বাড়িয়ে মনে করে যে, যাদের মধ্যে আংশিক হলেও শিরক আছে, তারা যদি জন্মগতভাবে মুসলিমও (পরিবারের) হয়ে থাকে, তবুও এরা কাফির মুরতাদের বদলে কাফির আসলি বলে গণ্য হবে।[1] কারণ এই তাকফিরিদের মতে, এরা কখনোই মুসলিম ছিল না।

৪। এর ভিত্তিতে কোন সংকোচ, সন্দেহ এবং পার্থক্য করা ছাড়াই তারা অন্য সকল মুসলিমদেরকে কাফির গণ্য করে থাকে।

৫। তারা সঠিকভাবে ইসলাম পালনকারী মুজাহিদদেরও কাফির বলা শুরু করে। কারণ তারা প্রতিটি ব্যাক্তিকেই কাফির মনে করত। এই তাকফিরি জামা'আগুলো তখন একমত হয় যে, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের (কাফির আসলি) আগে তারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই হবে।[1]

---

[1] এই ধারণার ভয়ংকর পরিণতি অনুধাবন করতে হলে, আগে আমাদের ধারণাটি ভালোভাবে বুঝতে হবে। কাফির আল-আসলি (কাফির পরিবারের সন্তান) এবং মুরতাদ কাফির (ধর্মত্যাগী কাফির) মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। কাফির আল-আসলি হচ্ছে, যে জন্মের সময় ফিতরাতের (ইসলাম) উপর ছিল কিন্তু পিতা-মাতা অথবা পরিবার কাফির হওয়ায়, সাবালক হওয়ার আগেই তাকে ফিতরা (ইসলাম) থেকে বের করে তাদের ধর্মে বিশ্বাসী করে ফেলেছে। যেমন: বিল ক্লিনটন, লুইস ফারা খান এবং ওয়ালেস দ্বীন মুহাম্মাদ। এটা হতে পারে যে যুবক বয়সে সে কোন ধর্মের প্রতি ঝুকে গিয়েছে, কিন্তু সাবালক হওয়ার আগেই সে ফিতরা (ইসলাম) হতে বের হয়ে গিয়েছিল।

আর মুরতাদের ব্যাপারটা হল যে, কোন ব্যক্তি ফিতরাতের উপরই জন্মেছে, সাথে সাথে মুসলিম হিসেবেই বড় হয়েছে কিন্তু সাবালক হবার পর সে স্বইচ্ছায় নিজের ধর্ম ত্যাগ করেছে। যেমন: হুসনী মুবারক, মিশরের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি। সে হচ্ছে মুরতাদ কাফিরের উদাহরণ। খারেজিদের মত হচ্ছে যে এরা নাকি কখনোই মুসলিম ছিল না। তাদের এই মতের একটা অর্থ হচ্ছে যে কোন শিশুই ফিতরাতের (ইসলাম) উপর জন্মায় না, সকলেই কাফির হিসেবে জন্মায়। এর পরিপ্রক্ষিতে মুশরিকের সন্তান হচ্ছে মুশরিক এবং সমভাবে জাহান্নামী। সমস্যাটা হচ্ছে, এই রকমের চিন্তাধারা সরাসরি নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার বিরুদ্ধে যায়; তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সকল শিশুই ফিতরাতের (ইসলাম) উপর জন্মায়, কিন্তু তাদের বাবা-মা তাদের ইহুদি-খ্রিষ্টান হিসেবে বড় করে।" (সহীহ আল-বুখারী, খন্ড: ৮, হাদিস ৫৯৭) এটা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা চরম্পন্থী খারেজিদের বিশ্বাস, যা অন্যান্য সাধারণ খারেজিদের মধ্যে পাওয়া যায় না। যেমন GIA এ মূলনীতিতে বিশ্বাসী ছিল না। এই বিকৃত নীতির পরিণতি হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে তারা শিশুদেরও হত্যা করে। এক্ষেত্রে আবারো সেই হাদিসটি বাস্তবে আসে যে, তারা মুশরিকদের ছেড়ে মুসলিমদের হত্যা করবে, কারণ মূর্তিপূজারী মুশরিকদের সাথে তাদের কোন শত্রুতাই নেই।

৬। এর প্রেক্ষিতে তারা অন্য সকল মুসলিমদের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান, সব কিছু নিজেদের জন্য হালাল হিসেবে গ্রহণ করে। এমনকি তারা মুসলিম মহিলাদের যুদ্ধবন্দী করা শুরু করে, তাদের শারীরিকভাবে ভোগ করে এবং তারপর ত্যাগ করে।[2]

৭। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে তাদের সাথে একমত না এমন কোন দলের সাথে তারা সম্পর্ক রাখবে না, শুধুমাত্র তাকিয়্যা করা ছাড়া।[3]

৮। তাদের মতের সাথে বিরোধ করলেই তারা কাফির বলে আখ্যায়িত করত।

৯। তারা কুরআনের ব্যাখ্যা করত তাদের নিজেদের চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী, কোন আয়াতের ব্যাপারে মূল তাফসীর থেকে নয়। কাফিরদের ব্যাপারে আয়াতগুলোকে তারা মুসলিমদের উপর প্রয়োগ করত।

১০। প্রাচীন প্রজন্মের এবং আধুনিক যুগের খারেজিদের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য হচ্ছে যে, প্রাচীন প্রজন্মের খারেজিরা গুনাহগারদের কাফির বলত, কিন্তু প্রাচীন খারেজিরা কখনো এই মূলনীতি গ্রহণ করে নি যে, তাদের সাথে একমত না হবার অর্থ হল এরা কাফির এবং সে কোন কালেই মুসলিম ছিলই না।

আর প্রাচীন খারেজি আর আধুনিক খারেজিদের মধ্যে একটা বড় সাদৃশ্য হল, আধুনিক খারেজিরা এই নীতি গ্রহণ করেছিল যে "মুসলিম প্রমানিত হবার আগে সবাই কাফির"। আদি যুগের 'বায়হাসি খারেজি' নামে খারেজিদের একটি দল এই বিশ্বাস পোষণ করতো।[1]

---

[1] তাগুত প্রশাসনগুলোর এই দলগুলোকে অর্থায়ন করে যেন তাদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার অন্যতম কারণ হল এটা। তাওয়াঘিত এভাবে তাদের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে পারে, এজন্য দরকার শুধু যতগুলো নতুন দল তৈরী হয়, সবগুলোর কার্যক্রমের উপর লক্ষ্য রাখা।

[2] এর মাধ্যমে যমীনে ব্যাপক ফিতনা তৈরী হয় এবং মুখলিস মুজাহিদদের ব্যাপারে একটি খারাপ ধারণা সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

[3] তাকীয়্যা হল অত্যাচারের আশঙ্কায় নিজের আক্বিদা গোপন করা। যখন কেউ যুলুমের আশঙ্কা করে, বিশেষ করে মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে, তখন তারা নিজেদের বিশ্বাস এবং মত লুকিয়ে রাখে যেন তারা যুলুমের শিকার না হয়। শিয়ারা তাকিয়্যার মাধ্যমেই তাদের দলে অনেক লোক ভিড়াতে সক্ষম হয়েছিল।

দ্বিতীয় আরেকটি সাদৃশ্য হল, আলজেরিয়ার আধুনিক খারেজিদের মধ্যে কিছু খারেজি এমন ছিল যারা কোন ব্যক্তির মুসলিম অথবা কাফির হওয়া সম্পর্কে কোন ফাতওয়া পাবার আগে চুপ থাকার নির্দেশ দিত। তাদের এই বৈশিষ্ট 'আকদাসি' নামক খারেজিদের সাথে মিলে যায়।[2]

কিন্তু কেন GIA এরকম হয়ে গেল? ঠিক কি কারণে তারা ইসলামের জন্য লড়তে গিয়ে, নিজেদের খেয়াল-খুশির জন্য লড়াই শুরু করল? এর উত্তর তাদের নিজেদের ইতিহাসেই আছে, যা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলঃ

১৯৯২ তে GIA যখন প্রথম তাদের সংগ্রাম শুরু করে, সালাফি এবং সালাফি মুজাহিদরা তাদের সমর্থন দেন। তবে আলজেরিয়াতে সশস্ত্র ইসলামি দলকেন্দ্রিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল আরো আগে। এসব দলে এবং আন্দোলনের মধ্য সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল বুওয়ালি মুস্তাফার আন্দোলন। তিনি ছিলেন সালাফি চিন্তাধারার এবং ৮০'র দশকের শুরু থেকে তিনি সশস্ত্র আন্দোলনে নামেন। তিনি যথাসম্ভব লোকালয় এড়িয়ে চলতেন এবং মূলত পাহাড়ি এলাকা থেকে নিজের দলের অপারেশান পরিচালনা করতেন। মিডিয়াতে তিনি অতোটা পরিচিত না হলেও, বিশ্বজুড়ে ইসলামি জিহাদি সংগঠনগুলোর কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত

---

[1] বায়হাসি খারেজিদের মত হচ্ছে, যদি ইমাম কাফির হয়ে যায়, তবে তার সকল মুক্তাদিও কাফির। সেই ভূমি তখন হয়ে যায় শিরকের ভূমি আর সেখানকার জনগণ হচ্ছে মুশরিক। তারা তাদের বিশ্বাসের মূলনীতি বানিয়ে নেয় যে এমন কারো পিছনে সালাত পড়া যাবে না, যার বিশ্বাস তাদের মত না। আরো তথ্যের জন্য দেখুন ইমাম আল-আশ'আরীর মাকাল্লাত আল-ইসলামিন, পৃষ্ঠা: ১১৬।

[2] এই খাওয়ারিজরা মূলত কোন ব্যক্তি মুসলিম অথবা কাফির এই নিয়ে সন্দেহ থাকলে, তার ঈমান বা কুফরের অবস্থা নিয়ে চুপ থাকত। কোন গাইর-খারেজি শাসককে কাফির ঘোষণা করলে সেই শাসকের পক্ষ থেকে তাদের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে, তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য, মূলত তারা এই নীতি গ্রহণ করে। তারা কোন মুসলিমকে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফির ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকত, যতক্ষণ না তারা প্রমাণ পায় যে সে ব্যক্তিটি (তাদের শর্ত অনুযায়ী) কাফির। যদি সে তাদের শর্ত অনুযায়ী মুসলিম হত তারা তার অন্তর্ভূক্ত (শাসকের অধীনে) হয়ে যেত, অন্যথায় তারা তার থেকে দূরে থাকত। আরো তথ্যের জন্য দেখুন ইমাম ইব্ন তাইমিয়্যাহর কিতাবুল ঈমান বইয়ের পৃষ্ঠা: ৯৭।

পরিচিত একটি নাম। বুওয়ালি মুস্তাফার সাথে নিজের সম্পর্ক থাকার ব্যাপারে এখনো মুজাহিদিনরা গৌরব বোধ করেন।

তার মৃত্যুর পরে দলটির বেশির ভাগ সদস্যরা সাধারণ জনতার মধ্যে অবস্থিত অন্য বিভিন্ন দলের সাথে মিশে যায়। GIA নিজেদের বুওয়ালি আন্দোলনের সমর্থক হিসেবেই প্রকাশ করে, এমনকি তার মৃত্যুর পরও তারা বেশ কিছুদিন তার মূলনীতি বজায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে যখন ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষদের উপর হামলা এবং মুজাহিদদের হত্যা করা শুরু হয়। GIA এর মধ্যে কোন রকম সংস্কার এবং সংশোধনের পথ সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হতে থাকে। সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে GIA প্রকাশ্যেই কাজ এবং লেখনীর মাধ্যমে (তাদের কাজের ন্যায্যতা দাবী করে) খারেজি নীতি গ্রহণের সাক্ষ্য দেয়া শুরু করল। যে খারেজিদের বিরুদ্ধে তারা এতকাল আলজেরিয়াতে লড়াই করেছিল, সেই খারেজিদের আক্বীদা গ্রহণ এবং 'আমল করার মাধ্যমে শেষপর্যন্ত GIA নিজেরাই খারেজিতে পরিণত হয়। এখন আমরা আলোচনা করবো, GIA এর গঠন এবং বিবর্তন সম্পর্কে।

GIA গঠনের ইতিহাসঃ

আলজেরীয় সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কয়েকটি দল মিলে GIA গঠিত হয়। বুয়ালির দলের কিছু জ্যেষ্ঠ মুজাহিদ এবং পরবর্তিতে অন্যরা এসে তাদের সাথে যোগ দেয়। তাছাড়াও কিছু বিক্ষিপ্ত দল তাদের সাথে যোগ দেয়, যেগুলো এতটা পরিচিত ছিল না, যেমন:

১। ভাই নাসিরুদ্দিন খলিল রাহিমাহুল্লাহ এবং তার দল; যারা ১৯৮৯ তে বিলাদা কোর্টের বিরুদ্ধে বড় একটি অভিযান পরিচালনা করেন।

২। ভাই কারী আব্দুর রহিম গারযুল রাহিমাহুল্লাহ, ভাই তাওফিক বিন তাবিশ রাহিমাহুল্লাহ এবং ভাই ফুরতাস আলী রাহিমাহুল্লাহ যারা একটি দলের অন্তর্ভূক্ত ছিল, এ দলটি ১৯৯০ তে ধারাবাহিক ভাবে বিস্ফোরন হামলা চালান। পরবর্তিতে এই তিন ভাইই নিহত হন। আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুক।

৩। মুহাম্মাদ খাইরের রাহিমাহুল্লাহ নেতৃত্বে একটি দল ছিল, যারা কাসাবা নামক এলাকায়, এবং তৎকালীন আলজেরীয়ার রাজধানীতে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের কাজ করতেন।

৪। আরেকটি দল ভাই আলী যুওয়াবরির রাহিমাহুল্লাহ[1] নেতৃত্বে **১৯৯১** তে বুফারিক নামক এলাকায়, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করত।

৫। এইরকম আরো কিছু ছোট ছোট দল ছিল যারা তাদের সাথে যোগ দেয়, তারা বারাকি নামক শহরে থাকত।

এই দলগুলো **১৯৯১** এর আগস্টে ভাই নুরুদ্দীন সালামানিয়ার রাহিমাহুল্লাহ নেতৃত্বে একত্রিত হয়। **১৯৯২** এর ফেব্রুয়ারীতে তিনি নিহত হবার পর ভাই মুহাম্মাদ আলাল রাহিমাহুল্লাহ দায়িত্ব নেন। তিনি নিহত হবার পর তার জায়গায় আসে আবু আদলান আব্দুল হক লা'ইয়াদা।[2] সে নেতৃত্বে আসার পর GIA এর মূল কাঠামো বা নিউক্লিয়াস গঠিত হয়, যদি তখনও এই জামা'আর নির্দিষ্ট কোন নাম ছিল না।

এই দলটি কিছু কঠিন অভিযান চালিয়ে সরকারের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাড়ায়। এবং এতে অন্যান্য দলগুলোর উপর এই দলের সাথে অথবা ভিন্ন জায়গায় নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার চাপ আরো বেড়ে যায়। এই রকম কিছু দল, যারা পরবর্তিতে GIA এর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়, যেমন:

১। ভাই আব্দুর রহমান দাহহানের রাহিমাহুল্লাহ দলটি, যিনি আবু সিহান এবং ভাই আত-তাইয়িব আল-আফগানি নামে পরিচিত।

---

[1] এই লোকটি ছিল যুওয়াবরি পরিবারের, যাদের আলজেরীয় সরকারের সাথে দীর্ঘ দিনের সংঘাত রয়েছে। GIA এর এখনকার আমীর আমীর আনতার যুয়াবরি (লেখার সময়কালীন, ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে আনতার যুওয়াবরি নিহত হয়) হল আলি যুয়াবরির রাহিমাহুল্লাহ ভাই।

[2] সে **১৯৯২** তে দলটির নেতৃত্ব নেয়, অন্যান্য দলগুলো পর্যায়ক্রমে যোগদান করার পর। সেই GIA এর প্রথম আমীর ছিল। পরবর্তিতে সে মরক্কোতে আটক হয়। এই বইটি লেখা পর্যন্ত সে কারাগারে (সেপ্টেম্বর **১৯৯৯**)। (শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, ২০০৬ সালে সে মুক্তি লাভ করে এবং সে তার জন্মশহর বারাকিতে বসবাস করছে)

২। ভাই মনসূর মালয়ায়ি রাহিমাহুল্লাহ এর দলটি, যারা ১৯৯২ এর ফেব্রুয়ারীতে নৌবাহিনী বিরুদ্ধে বড় ধরণের অভিযান চালান।

যদিও তিনি আটক হবার পর আবু আল-উদ তার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৯২ এর অক্টোবরে, বড় বড় সশস্ত্র দলগুলোর একটা মিটিং অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে ভাই আবু আল-উদ, আব্দুল হক লা'ইয়াদার দলে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেন। এই দিন থেকেই এই পুরো দলটি সম্মিলিতভাবে GIA (Armed Islamic Group) নাম গ্রহণ করে। আব্দুল হক লা'ইয়াদা GIA এর প্রধান নিযুক্ত হন এবং তার পক্ষে থেকে একটি বিবৃতির মাধ্যমে দেশব্যাপী বড় বড় হামলার দায়িত্ব স্বীকার করা হয়। এরপর জামা'আ হিসেবে GIA এর কার্যপরিচালনা নীতি ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকে মূলত বিশ্ব GIA এর ব্যাপারে জানতে শুরু করে, কেননা তারা খুব দ্রুততার সাথে বিস্তৃতি লাভ করছিল এবং রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হচ্ছিল।

মরক্কোতে GIA আমীর আব্দুল হক লা'ইয়াদা আটক হবার পর, ভাই ইসা ইব্ন আম্মার[1] নতুন আমীর নিযুক্ত হন। ১৯৯৩ এর আগস্টে তিনি নিহত হলে ভাই জাফর সাইফুল্লাহ আমীর হন। ১৯৯৪ এর রামাদানে তিনি নিহত হলে আমীর হন আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ।[2]

শাইখ আবু আব্দুলাহ আহমাদ তার উত্তম চরিত্র এবং ভালো ব্যবহারের কারণে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। বড় বড় দলগুলোকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে, যেমন FIS এবং ইসলামি রাষ্ট্র আন্দোলনের GIA এর সাথে অন্তর্ভূক্তির সময়, তার এই চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলো কার্যকর এবং উপকারি সাব্যস্ত হয়েছিল। নতুন সদস্যরা ১৯৯৪ এর মে মাসে তাকে বাই'য়াহ দিয়েছিল। চুক্তিটি হয়েছিল GIA এর ব্যানারের অধীনে এবং তাদের সালাফি আক্বিদা ও মানহাজের[3]

---

[1] ১৯৯৩ এর জুলাইতে, তিনি প্রশাসনের বিরুদ্ধে বড় ধরণের আক্রমণের জন্য পরিচিত হয়ে উঠেন, যে হামলায় ৫৬ জন সৈন্য নিহত হয় এবং GIA অনেক গানীমাহ লাভ করে।

[2] GIA এর আমীরেরা মনোযোগ, আকর্ষণ এবং প্রশংসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। কারণ তারা সর্বদা যুদ্ধের প্রথম সারিতে ছিলেন এবং প্রায় সকলেই নিহত হন। তাদের এই কাজগুলো মানুষের হৃদয়ে সাহাবাদের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়।

[3] যখনই আমরা বলি সালাফি মুজাহিদ, আমরা এর দ্বারা সে মুজাহিদিনকে বুঝাই যারা আক্বিদার দিক দিয়ে সালাফি এবং যারা তাওহীদের সঠিক বুঝ রাখেন। তাওহীদ আর-রুবুবিয়াহ, তাওহীদ আল-উলুহিয়াহ, তাওহীদ

ভিত্তিতে। শাইখ তাদের বাই'য়াহ গ্রহণ করেন একটি শর্তে যে, যারা পূর্বে গণতন্ত্রের সাথে জড়িত ছিল, যেমন FIS, তাদের তাওবাহ করতে হবে এবং গণতন্ত্রের অবিশ্বাস করতে হবে এবং সালাফি মানহাজ গ্রহণ করতে হবে। শাইখ আহমাদ সে সময় একটি বই লেখেন যেটা তাদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয় এবং বলতে গেল এটাই দলের সংবিধানে পরিণত হয়। বইটির নাম, "আল-ক্কাওয়ায়িদ আল-আসাসিয়্যা মুফলিহ ফী আল-জামা'হ আল-ইসলামিয়্যাহ আল-মুসাল্লাহ" (GIA এর ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত সফল মূলনীতিসমূহ বা 'The Successful Rules for the Basis of the GIA').

নতুনদের মাধ্যমে ভিন্ন মতবাদ আর আদর্শের লোকেরা GIA তে যোগ দিতে থাকে। স্বাভাবিকভাবে দলটি খুব বড় হয়ে যায়। পরিবেশগত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং প্রচুর গুপ্তচরের অনুপ্রবেশের ফলে, GIA এর ভেতরেই প্রচুর হত্যাকান্ড এবং ভাঙ্গন শুরু হয়। এভাবে GIA এর খারেজি মতাদর্শ গ্রহণের পূর্বেই তাদের সম্পর্কে একটি মন্দ ধারণা প্রসার পেতে শুরু করে।

১৯৯৪ এর সেপ্টেম্বের ৬ তারিখে যখন শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ নিহত হন, আবু আব্দুর রহমান আমিন GIA এর নতুন আমীর হন। কিন্তু তার জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ সহজ হয় নি, কারণ তিনি নেতৃত্ব লাভ করার আগেই FIS অনুপ্রবেশের মাধ্যমে GIA নেতৃত্ব নেয়ার চেষ্টা করেছিল। তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা মাহফুজ আবু খলিল নামে তাদের পূর্বের একজন নেতাকে আমীর নিয়োগ করে। শাইখ মুহাম্মাদ সা'দি[1] সহ অন্য আরো

আল-আসমা ওয়াস-সিফাত এবং তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ- প্রতিটির উপর যাদের সঠিক বিশ্বাস আছে। তাওহীদের সম্পূর্ণ বুঝ তাদের আছে। সালাফি আক্কিদা বলতে এও বুঝায় যে ফিতনা নিরসন পর্যন্ত মুরতাদদের সাথে লড়াই করা, যেমনটা আল্লাহ বলে, "ফিতনা নির্মূলের আগ পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই কর।" (বাকারা: ১৯৩) (আনফাল: ৩৯) এবং তারা সবক্ষেত্রে আল-ওয়াল আল-বারার প্রয়োগ ঘটায়, কথা দিয়ে অন্তর দিয়ে এবং অস্ত্র দিয়ে। এটা হচ্ছে পূর্ণ সালাফি মানহাজ, আংশিক নয়; যেমনটা আজ আমরা দেখি যে অনেকে নিজেদের সালাফি দাবী করে অথচ আল্লাহর শত্রুদের সাথে নৃত্যও করে।

[1] তিনি FIS এর একজন জনপ্রিয় নেতা। তিনি গণতান্ত্রিক পথ ছেড়ে আবু আব্দুল্লাহকে বা'য়াহ দেন। কিন্তু আবু আব্দুর রহমানের সময় তাকে GIA ইসলামী কোর্টে মৃত্যুদন্ড দেয় হয়। যদিও তার হত্যার ব্যাপারে তারা যথেষ্ট

অনেক নবাগত সদস্যের মাধ্যমে মাহফুজ আবু খালিলকে ক্ষমতায় বসানো হয়। কিন্তু GIA এর অন্যান্য জ্যেষ্ঠ নেতারা এর বিরোধিতা করে এবং বিভিন্ন পাল্টা কৌশল গ্রহণ করে। এর মধ্যে একটি কৌশল ছিল তারা মাহফুজকে তিন দিনও নেতৃত্বে থাকতে দেয় নি, তার আগেই তাকে তারা ইসলামি আদালতে নিয়ে আসে। একদিকে FIS সদস্যদের শূরা পরিষদ থেকে সরানো হয়, অপরদিকে আবু আব্দুর রহমান আমিন রাহিমাহুল্লাহ কে নিয়োগ দেয়ার পাশাপাশি, GIA সিনিয়র সদস্যদের নিয়ে শূরা গঠন করা হল। তারা একটি ভিডিও টেপও বের করল যেখানে FIS এর সদস্য (ইবরাহিম লামারা) যে GIA তে যোগ দিয়েছিল, তার বিচার দেখানো হয়। সেখানে সে একটি স্বীকারোক্তি দেয় যে তারা (FIS) GIA এর নেতৃত্ব দখল করার চেষ্টা করেছিল এবং নেতৃত্ব নেয়ার জন্যই তারা যোগদান করে। এবং এও স্বীকার করেছিল যে, তারা প্রায় সফল হয়েছিল এবং এর মাধ্যমে তারা সরকারকে আবার গণতান্ত্রিক সমাধানের দিকে আহবান জানাত। এই টেপের শেষে দেখা যায় যে, সে পুনরায় তাওবা করেছে এবং বলছে যে সে বিশ্বাস করে যে তাকে হত্যা করা উচিত, কারণ সে মুজাহিদদের সাথে প্রতারণা করেছে। GIA এর অভ্যন্তরীণ এই বিচারের পর তাকে হত্যা করা হয় এবং GIA এর সদস্যরা তার জানাযা আদায় করে এবং বলে তাওবাহর পর তাকে হত্যা করা হয়েছে তার অপরাধের শাস্তি হিসেবে, সে মুরতাদ নয়।[1]

এরপর GIA নিজেদের এবং নতুন যোগ দেয়া FIS এর সদস্যদের সাথে একটি দীর্ঘ মেয়াদী অন্তর্ঘাতমূলক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কারণ তখনও FIS এর কিছু সদস্য গণতান্ত্রিক পন্থাবলম্বনের পক্ষে ছিল। GIA একই সাথে সাথে কট্টর খারেজি জামা'আ আহলুত তাওহীদের বিরুদ্ধেও লড়াই করছিল। এই সময় কিছু দল বিভিন্ন কারণে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। এসব দলের আলাদা হবার পেছনে ক্রমাগত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ধকলও একটি কারণ ছিল।

কারন দেখায় নি। তাকে ছাড়াও তার সাথে যোগ দেয়া আরো অনেককে সেই কোর্টে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। এর কারণে GIA এর মধ্যে অনেক গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল।

[1] অনেকের দাবী যে ভিডিওটি নির্যাতনের মুখে করা হয়েছিল। আল্লাহই ভালো জানেন।

প্রতীয়মান হয় যে, আবু আব্দুর রহমান আমীনের রাহিমাহুল্লাহ কঠোর পদ্ধতির কারণে অনেক মানুষ এই আন্দোলন ত্যাগ করে এবং সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। অনেক মুজাহিদ বলেছে যে, তারা এই জন্যে GIA ছেড়েছে যে তারা তাদের জীবনের আশঙ্কা (GIA এর পক্ষ থেকে) এবং তাদের উপর বাড়াবাড়ি শাস্তি আরোপ করার কারণে। তাছাড়া সেখানে সরকারের গুপ্তচরেরা ছিল, যারা নিজেরাই GIA কে সরকারের গুপ্তচর বলে গুজব ছড়াতো।

সরকার গ্রামাঞ্চলের অনেক মানুষকে অস্ত্র দিয়ে GIA এবং তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করতে তৈরী করে, GIA এর সমর্থকদের সাথে নির্মম ব্যবহার করতে উৎসাহ দিত। এই ব্যাপারটা যুদ্ধে আরো আগুন লাগিয়ে দিল এবং সাধারণ জনগণকে ইসলামি দলগুলো বিশেষ করে GIA এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে দিল। এটি ধাপে ধাপে হচ্ছিল। আলজেরিয় সরকারে ফাঁদ পেতে জনগণ আর GIA এর মধ্যেযুদ্ধ বাঁধাতে সক্ষম হল। প্রথমবারের মত জনগণ অস্ত্র ধারণ করে সরকারের জন্য কাজ শুরু করল। GIA এর সদস্যদের পরিবারের সদস্যদের নির্যাতন, অপহরণ এমনকি হত্যা করা শুরু হল।

তাদের কারারুদ্ধ করে রাখা হত, যতক্ষণ না GIA সদস্যরা সরকারের হয় কাজ করতে সম্মতি দিত। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে GIA সরকারের গুপ্তচর, সমর্থক এদের উপর প্রতিশোধ নেয়া শুরু করল। দূর্ভাগ্যবশত, একপর্যায়ে তারা অপরাধী এবং নির্যাতিত পরিবারের পার্থক্য না করে, তাদের দিকেও আঙ্গুল তোলা শুরু করল। কিন্তু তখনও তাদের লেখনী বা বিবৃতির মাধ্যমে তাদের এই কর্মপদ্ধতিগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় নি। তাদের লেখায় অনেক দ্ব্যর্থক বক্তব্য ছিল, যেগুলোকে সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যাচ্ছিলো না।

আবু আব্দুর রাহমান আমীনের রাহিমাহুল্লাহ নেতৃত্বকালীন সময়ে তিনি একটি জনপ্রিয় বই রচনা করেন, “হিদায়াদুর রাব্বিল আ’লামিন” (The guidance of the Lords of Creation) নামে। এই বইতে যেখানে অনেক অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্য ছিল। এই বইয়ের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কী বোঝানো হচ্ছিলো তা সে সময় জরুরী ভিত্তিতে ব্যাখ্যা এবং স্পষ্ট করা দরকার ছিল। কেননা এই বইয়ের বক্তব্য বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা এবং বিকৃত করার সুযোগ ছিল এবং জিহাদের ব্যাপারে শত্রুদের অপপ্রচারের ক্ষেত্রে এটি একটি অস্ত্র হিসেবে কাজ করে।

আবু আব্দুর রহমানের রাহিমাহুল্লাহ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ফ্রান্স এবং আলজেরীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ণদমে যুদ্ধ শুরু করেন। এ কারণে আলজেরীয় জনগণ জন্য GIA এর অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি সেসময় উপেক্ষা করেছিল। তিনিই ছিলেন প্রথম কোন ইসলামি সশস্ত্র বাহিনীর নেতা, যিনি ফ্রান্সের মাটিতে কার্যক্রম শুরু করে তাদের মাটিতে হামলা করেন এবং সরাসরি তাদেরকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানান। তিনি ফ্রান্সের ভেতরে বোমা হামলা চালান এবং তাঁর নির্দেশে একটি প্লেন ছিনতাই করে আলজেরিয়া থেকে ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।[1]

তিনি একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি বলেন যে ফ্রান্স থেকে কোন গাড়ি কেনা যাবে না। এই বক্তব্য জনমনে খুব প্রভাব ফেলে। তিনি শপথ করেন যে, ফ্রান্স থেকে কোন গাড়ি কেনা হলে তা তিনি পুড়িয়ে ফেলবেন। এমনকি সেসব মিশনারীদের অপহরণ ও হত্যা করা শুরু করেন, যারা ফ্রান্স থেকে আলজেরিয়াতে এসে মুসলিমদের খ্রিষ্টান বানানোর চেষ্টা করত[2,3]। আলজেরিয় সরকারের বিরুদ্ধে তার একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী অভিযান হচ্ছে বাটান শহরের হাই সিকিউরিটি কারাগার থেকে ৯০০ বন্দীকে মুক্ত করা। এই নায়কোচিত বিজয়ের পর অনেক লোক GIA তে যোগদান করা শুরু করে।

[1] একটি শক্তিশালি মত আছে যে, এটা GIA এর সদস্যদের একটি ফিদায়ি হামলা ছিল। যারা প্লেন ছিনতাই করেছিল তাদের প্ল্যান ছিল প্লেনটিকে প্যারিস শহরের মাঝামাঝি আছড়ে ফেলবার। কিন্তু প্লেনটি জ্বালানী সংকটের জন্য মার্সেই-এ অবতরন করতে বাধ্য হয় এবং তখন ফ্রেঞ্চ মিলিটারীর GIGN তাদের থামাতে সমর্থ হয়। যদিও এর জন্য GIGN কে চরম মূল্য দিতে হয় এবং তাদের অনেক সদস্য মারা পড়ে। GIA এর সদস্যরা শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করে। এই লড়াই চলাকালীন সময়ে আলজেরিয় কতৃপক্ষ হামলাকারীদের মা-দেরকে সেখানে নিয়ে আসে, তাদেরকে বলে মাইকের মাধ্যমে তাঁদের সন্তান্দের আত্বসমর্পণ করার আহবান জানাতে। সকল হামলাকারীই আত্বসমর্পণের আহবানে সাড়া না দিয়ে, মৃত্যু পযন্ত লড়াই চালিয়ে যান।

[2] সম্ভবত এ ধরণের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ছিল ৯ ফ্রেঞ্চ যাজকের অপহরণ, যারা মুসলিমদের খ্রিষ্টান বানানোর চেষ্টা করত। তাদের অপহরণ করার পর ফ্রেঞ্চ অ্যাম্বেসিতে GIA একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে, থেকে বন্দী মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য। ফ্রেঞ্চ কতৃপক্ষ সময় ক্ষেপনের চেষ্টা করছিল, তাই তারা অনেক মনযোগের সাথে দাবি দাওয়া শোনার ভান করছিল, কিন্ত কোন পদক্ষেপ নিচ্ছিলো না। শেষ পর্যন্ত সেই ৯ জন যাজককে হত্যা করা হয় এবং পরবর্তিতে আরো অপারেশনের হুমকি দেয়া হয়।

[3] এই ব্যাপার গুলো স্পষ্টভাবে ইসলাম সম্মত এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরই একটি অংশ।

মুহাম্মাদ সা'ইদের রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যু এবং বেশ কিছু অন্তর্ঘাতমূলক সংঘাতের পর বেশ কিছু গুজব আলজেরিয়ার বাইরে অবস্থিত GIA এর সদস্যদের ভেতর ছড়িয়ে পরে। তারা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে তাদের নিজ ভূমিতেই যুদ্ধ শুরু করতে বা তীব্রতর করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। তাদের কিছু সমর্থক GIA এ হতে নিজেদের সরিয়ে আনা এবং দূরত্ব বজায় রাখাকে সঠিক বলে প্রমাণে এই গুজবগুলোকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে। কেউ কেউ পত্রিকা এবং মিডিয়ার মাধ্যমে বিবৃতি দান করে GIA এর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেন।

যদিও তখন GIA এর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারের ইসলাম সম্মত কোন গ্রহণযোগ্য কারণই ছিল না। যারা একসময় তারা প্রবল সমর্থক ছিল তারা সমর্থন প্রত্যাহারের সময় ওয়াদা করেন GIA কে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্তের পক্ষে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ তুলে ধরার। যদিও এইরকম শপথ তারা কখনোই পূরণ করে না। যখন GIA নিজেরাই প্রকাশিত বিবৃতির মাধ্যমে তাদের আক্বিদা প্রকাশ করে এবং ইসলাম বহির্ভূত নির্মম কাজের দায় স্বীকার করে, তখনই GIA যে পূর্ণ খারেজিতে পরিণত হয়েছে তা প্রমাণিত হয়। তবে এটা ঘটে আবু আব্দুর রহমানের রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুর পর। তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কিছু লোকের অতর্কিত হামলার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়।

এরপর আমীর হল আন্তার যুয়াবরি। সে আমিনের মজলিশে শূরার একজন সদস্য ছিল, এবং শূরা সদস্যদের মধ্যে সে ছিল কনিষ্ঠতম। তার ভাই আলি ছিলেন GIA গঠনের পূর্বের একটি সশস্ত্র দলের আমীর। এই বইটি লিখিত হবার সময় পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর ১৯৯৯) আন্তার যুওয়াবরি GIA এর যা অবশিষ্ট আছে তার নিয়ন্ত্রন ধরে রেখেছে। সম্ভবত GIA এর সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর বিপর্যয়মূলক সমস্যা ছিল ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ সালে দেয়া আন্তার যুওয়াবরির একটি বিবৃতি। এই বিবৃতিতে আন্তার ঘোষণা করে আলজেরিয় সরকারের বিরুদ্ধে GIA কে সাহায্য না করার কারণে আলজেরিয়ার জনগণ হচ্ছে কুফফার, মুরতাদ ও মুনাফিক। এমনকি তারা হত্যা, জবাই, পোড়ানো, ধ্বংস সহ আরো অনেক কাজের দায়ভার

গ্রহণ করে। এমনকি তারা তাদের বিরোধীদের মহিলাদের অপহরণ, ধর্ষণের এবং সাবী[1] করার দায়ভার গ্রহণ করে।

এই বিবৃতি অনেক নোংরা শব্দ উচ্চারণ করা হয়েছে, যা মুসলিমদের ব্যবহারের অনুপযুক্ত, এবং এতে অশীলতাও ছিল। যদিও সেখানে সেসময় যেসব শিশুদের হত্যা এবং গণহত্যার ঘটনা ঘটছিল সেগুলোর দায় স্বীকার করা হয় নি। এসব ঘটনা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিলো, শতশত লোক আহত ও নিহত হয়েছিল। যাদের বেশির ভাগই ছিলেন সাধারণ মানুষ এবং তাদের মধ্যে নারী-শিশুই সংখ্যাই ছিল বেশি। কেউই তখন বিশ্বাস করতে পারছিল না যে এটা ইসলামী কোন দলের কাজ হতে পারে। এমনকি মুসলিম বিদ্বেষীরাও না। সকলে একমত হয়েছিল যে মানুষদের ইসলাম এবং এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত করার জন্য, এই কাজগুলো আলজেরিয় সরকার করছে। এই বিবৃতির পর সকলের মনে প্রশ্নের উদয় হয়, কেন কোন দল এসব ভয়ঙ্কর ঘৃণ্য কাজের দায় স্বীকার করবে যখন সবাইক এগুলোকে সরকারের কাজ বলে ধরে নিয়েছে কারণ বেশির ভাগ গণহত্যাই ব্যারাকের কাছে ধারেই

---

[1] সাবী হল কোন মহিলাকে যুদ্ধ বন্দী হিসেবে আটক করা এবং তার ডান হাত হিসেবে অধীনস্ত করা, যাদের বিক্রি করা যাবে, দাস হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। তাদের মধ্যে যারা বিবাহিত তাদের স্বামী থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, এবং তারা যার অধীনে থাকবে তার সম্পদ বলে বিবেচিত হবে; সেই মহিলার শরীরের উপর ঐ ব্যক্তির অধিকার থাকবে, সেটা হোক ঐচ্ছিক অথবা অনৈচ্ছিক। এবং তারা উত্তরাধিকার সূত্রপাবে যদি তারা গর্ভবতী হয়, তখন তাদের উম্মুল আওলাদ বলা হয়। এক্ষেত্রে যার অধীনে ছিল, তার মৃত্যুর পরই তারা স্বাধীন হয়ে যায়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল যে মুসলিম নারীদের সাথে কখনোই এটা করা যাবে না। শুধুমাত্র খারেজি বিপগামীরাই এই বিশ্বাস রাখে যে মুসলিম নারীদের সাবায়া বানানো যায়। যদি কোন মুসলিম নারী এমন কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করে যে সরকারের দালাল কিংবা কর্মচারী, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে লোক এখনো ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম পালন করে এবং সে কোন সামরিক কাজের সাথে জড়িত না এবং সামরিক স্থাপনাতে বসবাস করে না, এমন ব্যক্তিকে ইসলাম অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ব্যক্তির স্ত্রীকে মুসলিম নারী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং মুসলিম নারী হিসেবে তার সম্মান রক্ষা করা দায়িত্ব। কারণ সে মুসলিমদের রাজনৈতিক শত্রু এবং ইসলামী আন্দেলন সম্পর্কে জানে না। আরো তথ্যের জন্য পড়ুন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'তের সাবিয়ার ব্যাপারে ফিক্বহের কিতাব। আর যেসব মহিলারা আর্মিদের ব্যারাকে, সামরিক ক্যাম্পাসে থাকে এবং মুসলিমদের থেকে আলাদা থাকে, তবে তারা মুরতাদদীনের নারী বলে গণ্য হবে এবং তাদের ব্যাপারে সাহাবারা মুরতাদদের সাথে যুদ্ধের সময় তাদের যে শাস্তি দিয়েছিলেন, সে শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

ঘটছিল। যারা GIA এর মুজাহিদদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল এবং যেসব এলাকা থেকে অনেক লোক জিহাদে যোগ দিয়েছিল, তারাও এই গণহত্যা থেকে নিস্তার পায় নি। এরকম পরিস্থিতিতে কিছু গুজব বেশ প্রচার লাভ করে। এইরকম পরিস্থিতি মানুষের মনে গুজবের জন্ম দিচ্ছিল। সেই সব গুজবের মূল বক্তব্য ছিল আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ এবং সরকার ১৯৯৪ এ GIA এর ভিতর অনুপ্রবেশ করেছে।

এরপর থেকে GIA এর যেসব সদস্য আলজেরিয়ার ভেতরে ছিলেন এবং যারা আলজেরিয়ার বাইরে অবস্থান করছিলেন, তাদের ভেতর ব্যাপক বিভেদ সৃষ্টি হয়। তারা শুধু GIA-ই নয়, ঢালাওভাবে সকল মুজাহিদদের দোষী সাব্যস্ত করতে থাকে এবং এর মাধ্যমে সেক্যুলার সরকার গুলো ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের কাজগুলোর পক্ষে অনেক অজুহাত পেয়ে যায়। GIA এর এই কাজগুলো ছিল পেছন থেকে ছুরি মারার মতো এবং এতে সামগ্রিক ভাবে উম্মাহ এবং বিশেষ করে আলজেরিয় এবং বিশ্বব্যাপী মুজাহিদরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা ছিল GIA এর শেষ বিবৃতি এবং কেউই এই বিবৃতি প্রচারে আগ্রহী ছিল না।[1]

পুরো ঘটনাপ্রবাহের দিক দিয়ে পরিহাসমূলক ব্যাপার হল, এ বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়েছিল তাদের দুইটি বুকলেট প্রকাশের পর। একটি ছিল GIA কতৃক প্রকাশিত 'আস-সাইফুল বাত্তার' (The Sharp Edged Sword) এবং অন্যটি ছিল তাদের আলজেরিয়ার বাহিরের সমর্থকদের দ্বারা প্রকাশিত 'তালিমুল আনসার'। দুইটি বইতেই স্পষ্টভাবে GIA এর আক্বীদা এবং কাজের ব্যাপারে সব গুজব এবং অস্পষ্টতার বিস্তারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে অপনোদন করা হয়েছিল। এ বুকলেট দুটি প্রকাশের পর এমন অনেকে যারা যারা GIA ছেড়ে দিয়েছিল, তারা আবার ফিরে আসে। এই দুটি বুকলেটে আক্বীদা বা মানহাজের ব্যাপারে এমন কোন ভুল তথ্য ছিল না যেটার সমালোচনা করা যায়। কিন্তু এটা ছিল তাত্ত্বিক পরিবেশনা। বাস্তবে যা ঘটেছিল তার সাথে এই তাত্ত্বিক আলোচনার কোন মিল ছিল না। এবং বাস্তবে যা ঘটেছিল মুসলিম উম্মাহ-র ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। উম্মাহ-র ইতিহাসে এর আগে কখনো এমন হয়নি যে মানুষ কোন একটি মানহাজকে লিপিবদ্ধ করবে এবং একে নিজেদের মানহাজ দাবি

---

[1] এই ব্যাপারে বিস্তারিত "GIA এর সাথে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা" অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

করবে, আর তারপর নিজেরা সেই মানহাজের বিরুদ্ধে ক্রমাগত কাজ করে যাবে। আর GIA ঠিক এই কাজটিই করেছিল।

যদিও এখনো (১৯৯৯ সালে) GIA ই হল আলজেরিয়াতে সরকার বিরোধি সবচেয়ে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী, কিন্তু তবুও তাদের অনেক প্রাক্তন সমর্থকরা তাদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে এবং তারা GIA এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করারও ইচ্ছা পোষণ করে। GIA এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আগ্রহী হবার কারণ হল, সরকারের মতই GIA এর কাছ থেকেও মুসলিমদের ধর্ম, নিরাপত্তা এবং সম্মান নিরাপদ না। হয় আল্লাহ তাদের আবারো সরল পথে ফিরিয়ে আনুক, অন্যথায় তাদের ভালো এবং মুখলিস মুসলিমদের হাতে ধ্বংস করে দিক।

এখানে আমাদের এই বিষয়টি অনুধাবন করা উচিৎ যে, যথাযথভাবে এই ব্যাপারে দৃষ্টিপাত না করা হলে এরকম ভয়ংকর দলগুলো দিনে দিনে আরো শক্তিশালী হতে থাকবে। আর যেহেতু তারা জনগণকে টার্গেট করছে এবং তাদের সম্পদ হরণ করছে, ফলে তারা দিন দিন ধনী হচ্ছে। এমনকি তারা তাদের সদস্যদের কামনা চরিতার্থ করার জন্য মুসলিম নারীদের গানীমাহ হিসেবে গ্রহণ করছে। তারা পাহাড়ি এলাকাগুলোতে তাদের ঘাঁটি গড়ে তুলেছে এবং এভাবে তারা যদি শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, তবে তারা সরকারের চেয়েও বেশি দিন টিকে থাকতে সক্ষম হবে।

এদের একমাত্র তখনই পরাজিত করা সম্ভব হবে, যখন সুন্নী মুজাহিদরা সুসংঘটিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হবেন, তাদের পর্যাপ্ত অর্থ এবং সদস্যদের দেখাশোনার সামর্থ্য থাকবে এবং একই সাথে তাঁরা সরকার এবং এই ধরণের দলগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সক্ষমতা অর্জন করবেন। সত্যিকারের মুজাহিদদের এজন্য অন্ততপক্ষে নূন্যতম সামর্থ অর্জন করতে হবে, যাতে তাঁরা ইসলামের আসল শত্রুদের উপর হামলা চালিয়ে[1], সেখান থেকে গণিমাহ গ্রহণ করে, অর্থের সমস্যা এবং সামজিক অন্যান্য সমস্যা দূর করে বিশুদ্ধ মানহাজের উপর

[1] যখন আমরা ইসলামের শত্রুদের কথা বলি, এর মাধ্যমে কাফির আল-আসলি এবং মুরতাদদের বুঝাই।

জিহাদ চালিয়ে যেতে পারেন, এবং দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে টিকে থাকতে পারেন। আল্লাহ যেন সত্যিকারের মুজাহিদদের সাহায্য করেন।[1]

---

[1] নানা অন্তর্কোন্দলে এবং সদস্যরা একে অপরের হত্যায় মেতে ওঠায়, ২০০৪ সালে GIA সম্পূর্ণ ভাবে শেষ হয়ে যায়। তবে তাঁর জায়গা নেয় আরেকটি দল। বিশুদ্ধ মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই জামা'আ যাত্রা শুরু করে ১৯৯৮ সালে GSPC [The Salafist Group for Preaching and Combat/*al-Jama'ah as-Salafiyyah lid-Da'wah wal-Qital*] নামে। GIA থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া একজন প্রাক্তন সদস্য, হাসান হাত্তাব এই দলটি গঠন করেন। হাত্তাব ছিলেন GIA এর একজন আঞ্চলিক কমান্ডার। GSPC ঘোষণা করে তাঁদের শত্রু হল আলজেরিয় সরকার এবং আলজেরিয় জনগণকে তাঁরা মুসলিম মনে করে এবং তাঁদের মুক্তির জন্যই তাঁরা জিহাদ করছেন। ১৯৯৮ সালে গঠিত হলেও ২০০৩ সাল পর্যন্ত GSPC এর কার্যক্রম অত্যয়টা বিস্তার লাভ করে নি। তাঁরা সীমিত পরিসরে আলজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ২০০৩ এর মধ্যেই GIA কে সরিয়ে GSPC আলজেরিয়ার মূল জিহাদি জামা'আ হিসেবে পরিচয় লাভ করে। ২০০৩ সালে হাসান হাত্তাবকে আমীর পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়, কারণ তিনি মতপ্রকাশ করেন যে GSPC এর গণতান্ত্রিক ধারায় কাজ শুরু করা উচিৎ। নতুন আমীর নিযুক্ত হন শাইখ নাবিল শাহরাউয়ি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি আমীর পদ গ্রহণ করেন ২০০৩ সালের আগস্টে। ২০০৩ সালের অক্টোবরে তিনি শাইখ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ এবং আমীরুল মু'মীনিন মুল্লাহ মুহাম্মাদ উমার রাহিমাহুল্লাহকে বাই'ইয়াহ প্রদান করেন এবং GSPC তাঁদের আগের নাম ত্যাগ করে, নতুন নাম ধারণ করেঃ তানজীম আল-ক্বাইদা ফিল বিলাদ-আল মাগরিব আল ইসলাম [Al Qa'idah in the Islamic Maghrib- AQIM]। ২০০৪ সালে আলজেরিয় সামরিক বাহিনীর সাথে এক শুটআউটে শাইখ নাবিল নিহত হন। নতুন আমীর নিযুক্ত হন, শাইখ আবু মুস'আব আব্দেল ওয়াদুদ আব্দেল মালেক দ্রোকদেল হাফিযাহুল্লাহ। বর্তমানে শুধু আলজেরিয়া নয়, মালি, নাইজার, আযাওয়াদে এবং লিবিয়াতেও (ভিন্ন নামে) AQIM তাঁদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খারেজিদের নির্মূল করেছেন এবং তাঁদের বদলে প্রকৃত মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমানে আবারো পুরনো খারেজিদের ধারনাবাহী বিভিন্ন দলের উত্থান ঘটছে এবং খারেজিদের চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী তাঁরা মুজাহিদিনকে টার্গেট করে আক্রমণ চালাচ্ছে, এবং মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ছড়াচ্ছে, অপবাদ দিচ্ছে এবং তাঁদের হত্যা করছে। আমরা আল্লাহ-র কাছে দু'আ করি আল্লাহ্ যেন এই নব্য খারেজিদের হিদায়েত দেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর মাদঝে ফেরত আসার, অন্যথায় তিনি যেন তাঁদের ধ্বংস করেন, যেভাবে এই নব্য খারেজিদের আদর্শিক পিতা শুকরি মুস্তাফা এবং GIA কে তিনি ধ্বংস করেছেন।

GIA এর সাথে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাঃ

GIA নামের এই বিতর্কিত সংগঠনটি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্যে 'আনসার' ম্যাগাজিনের ('উসরাত আল আনসার' নামে পরিচিত) পরিবেশকদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সাধারণভাবে, এবং GIA এর সম্পর্কিত অন্য আরো কিছু ব্যক্তির অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আহ্লুস সুন্নাহর অন্তর্গত একটি দল হিসেবে শুরু করে ধীরে ধীরে GIA এর একটি গুরুতর এবং বিপদজনক বিদ'আতি দলে পরিণত হবার বিবর্তন প্রক্রিয়াটি 'উসরাত আল আনসার' ম্যাগাজিন এবং এর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা অত্যন্ত সুক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে।

আলজেরিয়ার জিহাদকে সমর্থনকারী এই আনসার দলটি GIA এর প্রতি তাদের সমর্থন প্রদান শুরু করে ১৯৯৩ সালে, আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ নেতৃত্বে আসার আগেই। এই সমর্থনকারী দলটির কার্যক্রম পরিচালিত হতো ইউরোপ, বিশেষ করে ইংল্যান্ড থেকে। মূলত আলজেরিয়ান ভাই-এর আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে এই দলের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। এই ভাইদের মধ্যে অনেক আফগান ফেরত ভাইয়েরাও ছিলেন। 'আল আনসার' ম্যাগাজিনের পূর্বে পাকিস্তান হতে আলজেরিয়ান জিহাদের সমর্থনে 'আস শাহাদাহ' নামে একটি ম্যাগাজিন বের হত। এই ম্যাগাজিনের ব্যাপারে সহায়তা দিত মিসরীয় জিহাদী গ্রুপ (Egyptian Islamic Jihad – শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহর দল)। পরবর্তীতে ইউরোপে অবস্থিত অনেক ভাই, আলজেরিয়ার জিহাদের প্রয়োজনীয়তা, কারণ এবং অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ বিশ্বের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। তাঁরা ফ্রান্স থেকে তাঁদের কার্যক্রম শুরু করেন। যখন ইউরোপের সমর্থকেরা ফ্রান্স হতে ম্যাগাজিন প্রকাশের মাধ্যমে জিহাদ সম্পর্কে ধারণা পেতে শুরু করল এবং ম্যাগাজিনটি পরিচিতি অর্জন করলো, তখন ফ্রান্স সরকার তাদের উপর দমন নিপীড়ন শুরু করল। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁরা সেসময়ে ইউরোপের যেসব জায়গায় বেশি বাকস্বাধীনতার সুযোগ ছিল, যেমন সুইডেন, ইংল্যান্ড সেগুলোতে চলে গেলেন। তখন থেকেই মূলত সাপ্তাহিকভাবে 'আল আনসার' ম্যাগাজিনের প্রকাশনা শুরু হয়। এই ম্যাগাজিন মূলত GIA এর সমর্থনে প্রকাশ করা হত।

প্রকাশনার কিছু দিনের মধ্যেই 'আল আনসার' ইউরোপের অন্যান্য আলজেরিয়ান পক্ষ থেকে ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। বিরোধিতাকারী এই দলগুলো ছিল হয় ধর্মনিরপেক্ষ না হয়

গণতান্ত্রিক যেমন FIS এবং এর বিভিন্ন উপদলসমূহ। কিন্তু শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদকে হত্যার আগ পর্যন্ত আনসার GIA'র প্রতি তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখে। 'আল আনসার' ম্যাগাজিনের কিছু লেখক GIA এর বিভিন্ন কর্মকান্ডের ব্যাপারে সরাসরি তাদের কাছ থেকে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেছিল। আবার কিছু লেখকবৃন্দ প্রশ্ন তোলার ছাড়াই এই পুরো সময় (শাইখ মুহাম্মাদ সাইদের হত্যাকান্ডের আগ পর্যন্ত) তাদের সমর্থন করে যেতে লাগল। এর কিছুদিন পর একদল সমর্থক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে তারা GIA সমর্থন করা বন্ধ করে দিবে এবং মিডিয়ার মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশ করে তারা GIA থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি সবার সামনে তুলে ধরেন। যদিও তারা এসময় বলেছিলেন, এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তারা যথাযথ ইসলামিক ব্যাখ্যা প্রদান করবেন কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি পরবর্তীতে কখনো বাস্তবে রূপ নেয়নি।

এই অযৌক্তিক কাজের ফলে ইউরোপে এবং অন্যত্র GIA'র সমর্থকগোষ্ঠীর মধ্যে ফাটল দেখা দেয়। দেখা গেল যে, কোনো প্রকার তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই GIA'র আক্বীদা নিয়ে লোকজন প্রশ্ন তোলা শুরু করল। দুঃখজনক ব্যাপার হল, পূর্বে কিছু মানুষ ছিল যারা পূর্বে নিজেদের সমস্ত কিছু দিয়ে GIA কে সমর্থন দিয়েছিল, যারা সন্দেহে পতিত ব্যাক্তিদের বলত GIA কে 'বেনিফিট অফ ডাউট' দেয়ার জন্যে, যারা বলতো বিচ্যুতির কোনো পরিষ্কার তথ্যপ্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত GIA কে সমর্থন দিতে, তারাই তাদের নিজেদের সে পদ্ধতির তোয়াক্কা না করে এক সময় GIA কে পরিত্যাগ করল। এই অবিবেচক কাজটির প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এর ফলে GIA'র সমর্থক এবং GIA'র প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষজন প্রবল ধাক্কা খেল ।

শুধু তাই নয়, এ ঘটনাটি ইসলামের শত্রুদের সামনে একটি বিশাল সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, ইসলামের শত্রুদের সুন্নাহ হচ্ছে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে গুজব ছড়িয়ে দেয়া। তারা এটা এ আশায় করে যে, এর ফলে কিছু মানুষ জিহাদী মূলনীতি থেকে সরে পড়বে এবং জিহাদের রাস্তা পরিত্যাগ করবে। তারা তখন অন্যান্য অনৈসলামিক পন্থা যেমন সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবর্তন আনার স্বপ্ন দেখবে। শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদ এবং অন্যান্য সদস্যরা খুন হওয়ার কারণে, মুজাহিদদের অভ্যন্তরে কি ঘটছে

তা নিয়ে গুজব দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। ইসলামিক বিচার-বিশ্লেষণ করে এই ধরণের ঘটনা সম্পর্কে দুই ধরনের ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়।

১। এক হচ্ছে, GIA'র বিরুদ্ধে যেসব গুজব ছড়িয়েছে সেগুলো সত্য এবং তারা যে সকল মানুষদের হত্যা করেছে তা হারাম হয়েছে এবং এর ফলে তারা জুলুম করেছে। এর মানে দাঁড়ায় যে, GIA'র নেতৃত্ব অত্যাচারী এবং পাপাচারী। কারণ তারা তাদের দলীয় সদস্যদের (নেতৃত্ব কুক্ষিগত করার জন্যে) সঠিক কোনো শরীয়াহগত দলীল ছাড়া হত্যা করেছে।

২. দুই, এগুলো শুধুই গুজব এবং GIA'র অবশ্যই এ সংক্রান্ত শরিয়াহগত দলীল রয়েছে। হয়তো তারা দলের ঐক্য রক্ষা করার জন্যে এবং জিহাদকে জাতীয়তাবাদ অথবা এই ধরনের খারাপ প্রভাব থেকে দূরে রাখার জন্যে এ কাজগুলো করেছে।[1]

যদি প্রথম ব্যাখ্যাটি সত্য হয়, তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়ায় যে, তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্যে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও তাদের প্রতি বাই'য়াহ দেয়া থাকলে তার প্রত্যাহার করা এবং তাদের প্রতি সমর্থন প্রদান বন্ধ করে দেয়া শরীয়াহ সম্মত নয়। এটাই হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'র আলেমদের সর্বসম্মত মতামত। এমনকি জিহাদের আমীর যদি ফাসিকও হয় যে কিনা যিনা, মদ্যপানের মত কবীরা গুনায় লিপ্ত তারপরও তার বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না, যদি তিনি জিহাদ চালু রাখেন। সেক্ষেত্রে তাকে এইসব খারাপ কাজ পরিত্যাগ করার জন্যে ক্রমাগত নাসীহা দিতে হবে। সবচেয়ে পরিচিত যে উদাহরণটি এক্ষেত্রে দেয়া যেতে পারে সেটি হচ্ছে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ আল-সাকাফি। হাজ্জাজ তার

---

[1] বিভিন্ন কারণে সে সময়ে এই সম্ভাবনাটিকেই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিলঃ

১. যারা ফ্রন্টলাইনে আছেন তাদের সর্বদা বেনিফিট অফ ডাউট দেয়া উচিৎ (যদি সন্দেহ থাকে)।

২. যাদের হত্য করা হয়েছিল, তাদের অধিকাংশের এমন অডিও ও লেখা ছিল যা জাতীয়তাবাদ ঝোকা ছিল; যেমন শাইখ মুহাম্মাদ সা'ইদ। এমনকি GIA তে যোগদানের পূর্বে, জিহাদকে একটি জাতীয় রূপ দেয়া এবং শুধুমাত্র আলজেরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার মতাদর্শ প্রচারের কারণে শাইখ মুহাম্মাদ সা'ইদ খ্যাত ছিলেন। GIA তে যোগদানের পূর্বে তাদের এসব ধ্যানধারণার কারণে তাদের তাওবাহ করতে বলা হয়েছিল। ৩. তখনো পর্যন্ত এরকম কোন তথ্য ছিল না, যে এই জামা'আ কখনো তাদের কোন সদস্যকে অবৈধভাবে, অনুপযুক্ত কারণে হত্যা করেছে।

মসনদ রক্ষার জন্যে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছিল। এতো কিছুর পরেও সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া ইজমা'ইন এবং তাবিঈরা তাকে সমর্থন দিয়েছিলেন ভারত এবং অন্যান্য কাফিরদের বিরুদ্ধে তার জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার কারণে। তাই হাজ্জাজের ঘটনার সাথে আমরা যদি এই ঘটনাটিকে তুলনা করি তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে শুধুমাত্র উপরে উল্লেখিত কর্মকান্ডের কারণে GIA অথবা তার আমিরকে পরিত্যাগ করার ব্যাপারটি হারাম হয়েছে এবং তা ছিল বিদা'আতের সমতুল্য একটি ব্যাপার।[1]

যদি অপর ব্যাখ্যাটি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়ায় যে, তাদের বিরুদ্ধে উঠা সকল গুজবই মিথ্যা। এর সাথে সাথে এটাও প্রমাণিত হবে যে, তাদের ইজতিহাদটি[2] সঠিক ছিল। সেক্ষেত্রে GIA-এ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়া আরো বড় গুনাহের কাজ বলে বিবেচিত হবে । কারণ তারা যে খারেজি না (তখনো পর্যন্ত) এটা তখন প্রমাণিত হবে।

---

[1] ইমাম ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর কিতাব আল মুহাল্লার, ৯০০ নং মাসআলায় বলেছেনঃ

"কুফরের পর, জিহাদ ত্যাগ করার মতো আর কোন বড় গুনাহ নেই, যদি সে জিহাদ কোন ফাসিক নেতার অধীনে হয় তাও। কারণ এর (জিহাদ ত্যাগের) ফল হল, ইসলামি শারীয়াহ, মুসলিমগণ এবং এমনকি কাফিররাও ক্রমাগত ইসলামের সংস্পর্শ তথা ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে, এবং তাদের (মুসলিমদের) নিরাপত্তা দেয়ার এবং তাদের (কুফফার) ইসলামের দিকে নিয়ে আসার মতো কেউ থাকবে না"। সকল মাযহাবের বক্তব্য, এক্ষেত্রে ইমাম ইবন হাযমের অনুরূপ। আর যারা ইমাম বা নেতার ফিসক্বের কারণে জিহাদ ত্যাগ করে বসে থাকে তাদের প্রতি ইমাম ইবন হাযমের অবস্থান সর্বাপেক্ষা কঠোর। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত ফাতাওয়াতে অকৌশলি, আনাড়ি কিন্তু নেককার নেতার অধীনে জিহাদ করার পরিবর্তে, কৌশলী বিজয় অর্জনকারী নেতার অধীনে জিহাদ করতে বলেছেন, যদিও সে ফাসিক হয়। তাঁর এই অবস্থানের স্বপক্ষে শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, মুসলিম উম্মাহ কৌশলী ও বুদ্ধিমান ফাসিক নেতার বিজয়ের মাধ্যমে উপকৃত হবে, পুণ্যবান, অকৌশলী নেককার নেতার পরাজয়ের কারণে উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই নেককার তাঁর নেক আমলের জন্য পুরস্কৃত হবেন। একারণে উম্মাহর সার্বিক বিজয় এক্ষেত্রে গুরুত্ব এবং অগ্রাধিকার পাবে। আর জিহাদের নেতারা শুধুমাত্র তাদের কাজ অনুযায়ী শাস্তি কিংবা প্রশংসার পাত্র। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন পরিষ্কার কুফর দেখার আগ পর্যন্ত শাসকের আনুগত্য থেকে বের না হয়ে যেতে। আর যদি পরিষ্কার কুফর শাসকের পক্ষ থেকে প্রতীয়মান হয় তবে সেটা আল্লাহ-র পক্ষ থেকে মুসলিমদের জন্য একটি চিহ্ন।

[2] যে পদ্ধতিতে একজন 'আলেম কুর'আন ও সুন্নাহ থেকে একটি হুকুম আহরণ করেন।

এমনকি সে সময় তারা এইসব বিতর্কিত ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা সম্বলিত যে বই প্রকাশ করেছিল তা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'র মতাদর্শের সাথে সম্পূর্ণরুপে মিলে যায়।

এই ব্যাপারগুলো যদি বুঝে আসে তাহলে প্রকৃত নিষ্ঠাবান মানুষ এবং দলের জন্যে GIA কে সমর্থন প্রদান করা সে সময়ে (যখনো তাদের মানহাজ ও আক্বীদা বিচ্যুতির সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় নি এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ ও পাওয়া যায় নি) ওয়াজিব তথা আবশ্যক। এর মাধ্যমে এর মাধ্যমে জিহাদকে দ্বিধাবিভক্ত করে কুফফারদের মনের আশা চূর্ণ করে দেয়া সম্ভব হতো। বাস্তব সত্য হল, এই সমর্থন প্রত্যাহারের ঘটনাটি আলজেরিয়ান জিহাদের জন্যে কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। সমর্থন প্রত্যাহারকারীদের নিকট হতে ব্যাখ্যা পাওয়ার আশায় "উসরাত আর আনসার" প্রায় আট মাস অপেক্ষা করেছিল। এতো দিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও সমর্থন প্রত্যাহার সংক্রান্ত কোনো ব্যাখ্যা বা উত্তর পাওয়া যায়নি। বার বার চেষ্টা করার পরেও যখন সমর্থন প্রত্যাহারকারীদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছিল না তখন উসরাত আল আনসার তাদের আনসার ম্যাগাজিনের প্রচারণা আবার শুরু করে দিল। এর সাথে সাথে যেসব লেখকেরা সমর্থন প্রত্যাহার করার বিষয়টি শরীয়াহসম্মত কিনা তা প্রমাণের আহবানকে বারবার প্রত্যাখান করেছিল তাদের কয়েকজনকে "আনসার ম্যাগাজিন" এড়িয়ে চলা শুরু করল। পাশাপাশি উসরাত আল আনসারের সদস্যরা GIA কে তাদের প্রকাশিত 'হিদায়া উর রাব্বুল আলামিন' (সৃষ্টিকর্তার পথনির্দেশনা) এবং আরো কিছু লিখার ধোঁয়াশাপূর্ণ বিষয়সমূহ ঠিক করার পরামর্শ দেয়। যাতে করে অন্য কেউ GIA'র আক্বীদা এবং মানহাজ নিয়ে কোনো ধরনের ধোঁয়াশা এবং গুজব সৃষ্টি করতে না পারে। কারণ একবার সঠিক চিত্রটি তুলে ধরা হলে, বিভিন্ন গুজব এবং অভিযোগের বিরুদ্ধে তাদের যুক্তিসমূহ তুলে ধরা হলে, আক্বীদার ব্যাপারে অথবা মানহাজের ব্যাপারে GIA কে প্রতিপক্ষের কথার বিরুদ্ধে জবাব দেয়া সহজ হবে।

এ অনুরোধের জবাবে GIA 'উসরাত আল আনসারের' কাছে তাদের 'আস সাইফ উল বাত্তার' (The Sharpedged Sword) নামে বুকলেটটি প্রেরণ করেন ও পরিমার্জন ও সংশোধনের জন্য। এই সংশোধনের ফলে তাদের ভুলগুলোর সংস্কার হয়। এর সাথে সাথে

বিভিন্ন পৃষ্ঠায় দেয়া কিছু সন্দেহমূলক তথ্যও বাদ দিয়ে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নতুন প্রকাশিত এই সংস্করণ নিয়ে পরবর্তীতে আর বিতর্ক সৃষ্টি হয় নি।

'আস সাইফ উল বাত্তার' নামক এই বুকলেটটিতে GIA আলজেরিয়ান জনসাধারণের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে। তারা আন্তরিকতার সাথে অঙ্গীকার করেছে যে, তারা আলজেরিয়ান জনসাধারণের অভিভাবক হিসেবে কাজ করবে এবং তাদের ধর্ম, সম্মান এবং ধনসম্পত্তি রক্ষায় সচেষ্ট হবে। তারা একথাও ঘোষণা করেছে যে, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে তারা ব্যক্তিগতভাবে কাফির মনে করে না, তবে তাদের দলকে কুফুরি দল বলে মনে করে। ইসলামের উন্নতির স্বার্থে তারা এই কুফুরী দলকে ক্ষমতা থেকে সরানোও প্রয়োজন মনে করে। ইসলাম প্রতিরক্ষা করতে গিয়ে যদি কোনো মানুষ বা শিশু অনিচ্ছাকৃতভাবে মারা গিয়ে থাকে সে জন্যে তারা দুঃখ প্রকাশ করেছে। তারা এটাও পরিষ্কার করেছে যে, এই নির্দোষ জনসাধারণ কখনোই তাদের হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

GIA তাদের প্রকৃত আক্বীদা প্রকাশ করলোঃ

আস সাইফ উল বাত্তারের প্রকাশের তিন মাস পর FIS এর সামরিক শাখাটি আলজেরিয়ান আর্মিতে যোগদান করে। তখন FIS'র সামরিক শাখার প্রধান আলজেরিয়ান সরকারের সাথে শান্তিচুক্তি স্থাপনের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করে। ঠিক সেই সময়েই আলজেরিয়ার বহু গ্রামে গণহত্যা এবং বীভৎসতার উৎসব চলছিল, যার শিকার শিশুরাও ছিল। এ ঘটনার জন্যে সবাই আলজেরিয়ান সরকারকে সন্দেহ করে। সরকার এ কাজগুলো করছিল বলে তখন প্রতীয়মান হচ্ছিলো। কারা এ জঘন্য গণহত্যার জন্যে দায়ী, বিশ্বের সামনে এ সত্য তুলে ধরে, GIA এর পক্ষ থেকে পুরাতন মুজাহিদিনকে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য আহবান জানানো জরুরী হয়ে পড়ে। FIS তাদের পরিত্যাগ করার পর এইটাই ছিল GIA'র হাতে একমাত্র বিকল্প।

উসরাত আল আনসার পুনরায় GIA'র সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে যেন সরকারের বিরুদ্ধে GIA যেসব সামরিক অভিযান চালিয়েছে বলে দাবি করেছিল, সেগুলোর দিন তারিখের

ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তবে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল, দেখা গেল তাদের এইসব তথাকথিত অভিযানগুলো কবে সংগঠিত হয়েছিল সে ব্যাপারে GIA'র কাছে কোনো তথ্য নেই। একই সাথে দেখা গেল এর মধ্যে কিছু কিছু অভিযান ছিল এমন, যেগুলোর অনেক আগে সংঘটিত হয়েছে এবং আগেই এ অভিযান গুলোর দায় স্বীকার করা হয়ে গেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল GIA তাদের নিজেদের সমর্থকদের উপরই বিরক্ত, এমনকি যারা আলজেরিয়ার বাইরে আছেন তাদের উপরও। অতঃপর তারা শেষ একটি বক্তব্য প্রকাশ করে যা এতোটাই ভয়াবহ ছিল যে, উসরাত আল আনসার সংশয়ে পড়ে যায় GIA কে নিয়ে। এটা কি আসলেই সেই দল যাকে উসরাত আল আনসার এতদিন ধরে জেনে এসেছে?

১৯৯৭ সালের ৯ আগস্ট ইস্যুকৃত GIA এর ৫২ বিবৃতিতে (এই সংখ্যাটি উসরাত আল আনসারের হাতে পৌছায় প্রকাশের তিন সপ্তাহ পর), তারা দম্ভের সাথে নিজেদের প্রকৃত আক্বীদাহ সবার সামনে প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন গ্রামে চলে আসা ধংসযজ্ঞ, হত্যা, অপহরণ এবং কোনো ধরনের বাছবিচার ছাড়াই (মুসলিম) মহিলাদের দাসী হিসেবে তুলে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব স্বীকার করে। তবে সবচেয়ে জঘন্য যে ব্যাপারটি ছিল, তা হচ্ছে GIA'র ইতিহাসে প্রথমবারের মত তারা আলজেরিয়ান জনগনকে, আলজেরিয়ান সরকারের বিরুদ্ধে GIA কে সাহায্য না করার অজুহাতে কাফির, মুরতাদ এবং মুনাফিক বলে ঘোষণা করে। এই বিবৃতিতে যে অশ্লীল এবং কুরুচিপূর্ণ শব্দচয়ন করা হয় তা ছিল জিহাদের সকল বিরুদ্ধবাদীদের জন্যে জন্যে এক পরম পাওয়া। উসরাত আল আনসারের সাথে জড়িত মানুষজনের মাঝে এই ঘটনা দুঃখ এবং হতাশার এক মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি করে। কারণ এর ফলে হয়ত এই শতকে কুফফারদের প্রতি সবচেয়ে কঠোর একটি ইসলামিক দলের পরিসমাপ্তি ঘটল, তারা শেষমেশ মুসলিমদের বিরুদ্ধে গেনগিস খানের মতো এক দলে পরিণত হল। তবে অন্যদিকে স্বস্তির যে ব্যাপারটি ছিল তা হচ্ছে তাদের অজ্ঞতা এবং ঔদ্ধত্যের মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে এমনভাবে প্রকাশ করে দিলেন যাতে করে সন্দেহের কোনো অবকাশই আর রইলনা। সার্বিকভাবে এই উম্মাহর জন্যে এবং নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে উসরাত আল আনসারের জন্যে এ ঘটনাটি ছিল পেছন দিক হতে ছুরিকাঘাতের মত।

যাই হোক, এই ঘটনার পরও উসরাত আল আনসার GIA এরএই বক্তব্যটি প্রকাশের তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছিল (যাতে করে সত্য সবার সামনে উন্মোচিত হয়), তখনকার প্রেক্ষাপটে এ বিবৃতি প্রকাশ করা ছিল ছিল নিজের মাথায় নিজে গুলি করার মত ব্যাপার। এই বক্তব্য জিহাদের বিরুদ্ধবাদীদের হাতেও এমন সব অস্ত্র তুলে দেয়ার মত ব্যাপার হবে যে অস্ত্রের কথা তারা নিজেরাও কল্পনা করেনি। সে অস্ত্র, গুলিভর্তি অস্ত্র এবং তা আমাদের দিকেই তাক করা। তবে যাই হোক না কেন, এসব কিছু সত্ত্বেও উসরাত আল আনসার GIA'র বক্তব্যটি প্রকাশ করল। কেননা তারা জিহাদের মূলনীতি এবং সত্যকে সংরক্ষণের দায়িত্ববোধকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিল। তবে সিদ্ধান্ত হয় যে কিছু বক্তব্য এবং তথ্যের ব্যাপারে পরিষ্কার হওয়ার জন্যে GIA'র সাথে যোগাযোগ করা হবে, যেমন শিশুদের কারা হত্যা করেছে, এটা জানতে। তাদের নিকট উসরাত আল আনসারের আরেকটি প্রশ্ন ছিল, এই বক্তব্য কি তাদের পুরো দলের বক্তব্য নাকি দলের অন্তর্ভুক্ত কিছু নির্দিষ্ট মানুষের বক্তব্য? কারণ এমন হতে পারে এই বক্তব্য হচ্ছে দলের কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের প্রোপাগান্ডা। এমনও হতে পারে যে সরকারই মুজাহিদদের নাম দিয়ে এই চিঠি পাঠিয়েছে যেন সাধারণ মানুষকে ধোকায় ফেলতে পারে এবং মুজাহিদদের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, GIA'র সাথে উভয়পক্ষের পরিচিত এবং বিশ্বস্ত এমন মানুষের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে, তাঁরা নিশ্চিত করে যে বক্তব্যটি GIA এরই ছিল এবং বিবৃতিতে যা যা আছে, তার প্রতিটি কথাই তারা বিশ্বাস করে। পরবর্তীতে GIA'র সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হয় এবং জিজ্ঞেস করা হয় যে সরকারের বিরদ্ধে চলমান অভিযানগুলো নিয়ে যখন বক্তব্য দেয়া হয়েছিল তখনই কেন এই হত্যাযজ্ঞের কথা বলা হয়নি? জবাবে যার সাথে যোগাযোগ হয় তিনি জানান যে, তিনি নিজেই এই বিষয়ে জানতেন না এবং তাদের মিডিয়ার দায়িত্বে যিনি রয়েছেন তারও ব্যাপারটি জানা ছিল না ।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি করা হয় তা হচ্ছে বাচ্চাদের হত্যার জন্যে কারা দায়ী? কারণ GIA'র পূর্বের বক্তব্যে বাচ্চাদের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। যোগাযোগকারী উত্তর দেন যে, তিনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন না, তবে তিনি জানার চেষ্টা করবেন। তৃতীয় যে প্রশ্নটি করা হয়, সেটি হচ্ছে, এই বক্তব্যটি কেন ইতিপূর্বে প্রকাশিত GIA'র আক্বীদা, বিশ্বাস এবং মুসলিম

জনসাধারণের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত সকল ধরণের বই, বিবৃতি ও বক্তব্যেরবিরুদ্ধে গেল। উত্তরে সে ব্যক্তি বললেন, GIA’র উপর আস্থা রাখতে, এবং জানালেন যে শীঘ্রই সবকিছু ব্যাখ্যা করা হবে।

সমগ্র আলজেরিয়া এবং আলজেরিয়ার বাইরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠল। মানুষ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল এবং দুই পক্ষই দুই পক্ষের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ শুরু করল। GIA’র সমর্থকদের হত্যার হুমকি দেয়া শুরু হল, আর GIA এর সমর্থকরাও হত্যার হুমকি দেয়া শুরু করলো। ফিনসবারি পার্ক মসজিদে প্রচুর তর্ক বিতর্ক চলল, আবশ্যিকভাবে সে সকল লোকদের সাথে যারা ভাবছিল আমরা (শাইখ আবু হামযা এবং উসরাত আল আনসারের সাথে যুক্ত মুসলিম ভাইরা) এই পুরো ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত। অপরদিকে আরেকপক্ষ আমাদের দোষারোপ করতে লাগল এই বক্তব্যটি কেন প্রকাশ করা হল, এজন্যে। তাদের মতে, বক্তব্যটি প্রকাশ না করলে এতো বিশৃংখলা সৃষ্টি হত না। যাদের মধ্যে দূরদর্শীতার অভাব রয়েছে তাদেরকে এটা বুঝানো অসম্ভব হয়ে পড়ল যে সত্যকে প্রকাশ করতেই হবে, যদিও সেটি ব্যক্তিস্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়, সেটি হচ্ছে জিহাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা।

GIA’র বিরুদ্ধে যখন কথা বলা শুরু হল তখন একদল লোক বলাবলি করতে শুরু করল যে উসরাত আল আনসার যেন GIA’র কোনো ব্যাখ্যা না শুনেই, সরাসরি তাদের সাথে সম্পর্কছেদ করে। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, GIA কি তাদের পক্ষ হতে ব্যাখ্যা প্রদান না করা আগ পর্যন্ত কি, এ ধরনের হত্যাযজ্ঞ বন্ধ রাখবে? নাকি চালিয়ে যাবে? এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর এবং তার ফলাফল, দুটোই খুব বিপদজনক ছিল। এই প্রশ্ন উঠার সাথে সাথে উসরাত আল আনসার GIA’র সাথে যোগাযোগ করে এই প্রশ্নের বিষয়ে তাদের মতামত জানতে চায়। উত্তরদাতা সে ব্যক্তি যে উত্তর দেয় তা ছিল ভদ্রোচিত কিন্তু অত্যন্ত বিষাক্ত। সে প্রতিনিধি উত্তর দেয় যে, তিনি কোনো কিছুর নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না, কারণ তিনি শুধুমাত্র একজন মুখপাত্র এবং এখন পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তর তার কাছে নেই। এই আলোচনার পর একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল যে এই মুখপাত্র তাদের বক্তব্যই আমাদের (উসরাত আল আনসার) সরবরাহ করছেন যারা আসলে নিজেরা বক্তব্য দিতে চায় না। তখনই উসরাত আল

আনসার উপলব্ধি করে এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ পূরণ করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ ছিল, যখনই কোনো দলের মাঝে খারিজি কর্মকান্ডের প্রমাণ পাওয়া যাবে তখন অন্যদের উপর এই কর্মকান্ড বন্ধ করার জন্যে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

GIA’র সাথে এই সংলাপের পরপরই উসরাত আল আনসারের পক্ষ থেকে GIA কে পরিত্যাগ করার ঘোষণা সম্বলিত একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। এই বিবৃতিটি আরবি এবং ইংরেজী উভয় ভাষায়ই প্রকাশ করা হয় যেখানে GIA-কে খারেজি হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয় এবং বলা হয় যে GIA তাদের মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এই ঘোষণার পর উসরাত আল আনসারের লোকজনকে হত্যার হুমকি দেয়া হয় এবং বলার অপেক্ষা রাখে না এই হুমকি আসে ফিনসবারি পার্ক মসজিদ হতে। আর যারা ইতিপূর্বেই GIA-কে ত্যাগ করেছিল, তারা “আগেই বলেছিলাম না” এই ধরণের মনোভাব প্রদর্শন করা শুরু করলো। GIA কে একদম শুরুতেই পরিত্যাগ না করার জন্যে উসরাত আল আনসারকে যারা দোষারোপ করেন, এমন দোষারোপকারী মানুষজনকে দুই দলে ভাগ করা যায়।

১. সে সমস্ত লোক যারা জানেই না কিভাবে একটি জামাআ’তে যোগদান করতে হয় এবং ঐ জামাআ হতে বের হয়ে যাবার শর্তসমূহই বা কী

২. যারা কোনো জামাআতে যোগদান এবং তা হতে ত্যাগের শর্তসমূহ জানে কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং মিডিয়ার চাপে পড়ে GIA কে দোষারোপ করছে

এর প্রেক্ষিতে আলমেদের পক্ষ হতে চ্যালেঞ্জ করা হয় সে সমস্ত ব্যক্তিকে এটা প্রমাণ করার জন্যে যে GIA তার সেই বক্তব্য নং ৫২ প্রকাশ করার আগে খারেজি ছিল।[1,2]

---

[1] আমরা (শাইখ আবু হামযা) এই চ্যালেঞ্জ পুনর্ব্যক্ত করছি এবং প্রমাণ উপস্থাপন করার আহবান জানাচ্ছি যে GIA এর ৫২ নাম্বার বক্তব্যের আগে প্রকাশিত কোন কিতাব বা বিবৃতির ভিত্তিতে তাদের খারেজি প্রমাণ করার জন্য। অন্তসারশূন্য ফাঁপা কোন দাবি এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য না।

[2] অর্থাৎ তারা খারিজি ছিল এটা তখন প্রতীয়মান ছিল। নিঃসন্দেহে ৫২ নং বিবৃতি প্রকাশের আগেই তারা মুসলিমদের তাকফির হত্যা এবং মুসলিমদের সম্পদ এবং নারীদের গানীমাহ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এই

আলজেরিয়ার খারেজিদের ব্যাপারে শেষ বক্তব্যঃ

যদিও GIA এর প্রকৃত রূপ যখন প্রকাশিত হয়, তখন তা আমাদের জন্য একটি ধাক্কা এবং দুঃসংবাদ ছিল, তথাপি আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর মানহাজের উপর থাকতে বাধ্য ছিলাম। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর মানহাজ হল এই যখন আমরা কোন দলকে সমর্থন করি, তখন সুস্পষ্টভাবে আমরা দাবি করি এই দল সমর্থন পাবার যোগ্য। আর যখন আমরা কোন কোন দলকে প্রত্যাখ্যান করি, তখনও আমাদের তাদের ত্যাগ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সুস্পষ্ট দাবি করি।

দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেকেই শুরু দিকে এমন সব কারণে GIA কে সমর্থন দিচ্ছিল যেগুলো বিশুদ্ধ ভাবে কোনো ইসলামি কারণ না। যেমনঃ তাদের নিজস্ব শাইখ GIA কে সমর্থন করেছিল, এজন্য অনেকে GIA কে সমর্থন দিয়েছিল। একইভাবে যখন এই লোকেরা GIA কে ত্যাগ করেছিল, তখন তারা করেছিল GIA যে প্রকৃতপক্ষে একটি খারেজি জামা'আ এটি কোন প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হবার আগেই। আবারো তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নিজেদের শাইখের কথা বা মিডিয়ার বক্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। আমরা আশা করি এ ঘটনা থেকে কুর'আনের আয়াতকে মিডিয়া বা শাইখদের কথার নিচে স্থান না দেয়ার ব্যাপারে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করবো।

GIA এর ব্যাপারে করণীয় হল এই যে, প্রকৃত মুজাহিদিন যেন GIA এর বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং একইসাথে আলজেরিয়ার সেক্যুলার সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে, যতক্ষণ না পর্যন্ত

বাস্তবতার কোন প্রমাণ ৫২ নং বিবৃতি প্রকাশের আগে ছিল না। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর নিয়ম হল আমরা দৃশ্যমানের ভিত্তিতে বিচার করি। যেহেতু ৫২ নং ইস্যুর আগে ইউরোপে অবশিত কারো পক্ষে সন্দেহাতীত ভাবে এটা জানা সম্ভব ছিল না যে GIA আসলেই খারিজি আক্বীদা লালন করে এবং এর উপর 'আমল করে, তাই এই বক্তব্য প্রকাশের আগে ইউরোপে অবশিত সমর্থকদের পক্ষে GIA কে প্রমাণসাপেক্ষ ভাবে খারেজি সাব্যস্ত করা সম্ভব ছিল না।

আল্লাহ-র শারীয়াহ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং একমাত্র দ্বীন শুধুমাত্র ইসলাম না হচ্ছে। আলজেরিয়ার মর্মান্তিক এবং দুঃখজনক ঘটনা থেকে উম্মাহ-র জন্য একমাত্র শিক্ষা হল এই যে- নতুন এক ধরণের খারেজির আবির্ভাব ঘটেছে, যারা আদি যুগের খারেজিদের মতো না। এরা মিথ্যা বলে, এবং নিজেদের মিথ্যা বিশ্বাস করে। কেন GIA এর নেতারা সুন্নি থেকে খারেজিতে পরিণত হল, তা ঠিক পরিষ্কার না, তবে এটা পরিষ্কার যে এই পরিবর্তন শাইখ আবু আব্দুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর সময়, কিংবা তাঁর নেতৃত্বের পূর্বে হয় নি। এবং ৫২ নং বিবৃতিটি প্রকাশ না হলে (যদিও এটি প্রকাশ করতে উসরাতের কষ্ট হয়েছে) হয়তো আজো এই ব্যাপারটি অজানা থেকেই যেতো।

আমার একই সাথে এটাও শক্তভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আল্লাহ্-র পথে জিহাদ করছে বলে দাবি করছে, এমন কোন দলে যোগ দেয়ার আগে আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে সে দলটি ইসলাম অনুযায়ী কাজ করছে নাকি। আমাদের যোগদান ইসলামি বিধান মেনেই হতে হবে। একইভাবে আল্লাহ-র রাস্তায় জিহাদ করছে এমন কোন দল ত্যাগ করার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম ও শর্ত আছে এবং কোন দলের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার কিংবা দলত্যাগ করা, এসব নির্দিষ্ট নিয়ম ও শর্ত মেনেই হতে হবে। আমরা কোন স্পষ্ট বিষয়কে ত্যাগ করে সংশয়পূর্ণ কিছুকে গ্রহণ করতে পারি না।

GIA যা করেছে এর পেছনে কারণ যাই হোক না কেন, আলজেরিয় মুসলিমদের এবং উম্মাহকে তাদের কাজের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেয়া এবং গভীর ভাবে অনুতপ্ত বোধ করার সাথে সাথে তাওবাহ করা তাদের দায়িত্ব। পুনরায় তাদেরকে বিশ্বাস করে হয়তো আলজেরিয় মুসলিমদের অনেক সময় লাগবে। আমরা এখন দেখছি আলজেরিয়া ছেড়ে এমন অনেক তরুণ পশ্চিমা বিশ্বে চলে আসছে, যারা আগে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিল। জিহাদের কি ক্ষতি GIA এর মাধ্যমে হয়েছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সরলমনা মুজাহিদ আর কিছু দলের দাম্ভিক ও উদ্ধত নেতাদের মধ্যে যে পারস্পরিক অবিশ্বাস কাজ করছে এটা GIA এর কাজেরই ফল। এ অবস্থাটা আরো গুরুতর রূপ ধারণ করেছে কারণ সম্প্রতি (১৯৯৯ সালে) FIS তাদের সামরিক শাখাকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে আর তাদের অস্ত্র সেক্যুলার সরকারের কাছে জমা দিয়ে দিয়েছে। আজ তারা শারীয়াহর শত্রুদের সাথে কোলাকুলি করছে। যেন

সেক্যুলার সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আল্লাহ-র শারীয়াহকে রক্ষা করার যে শপথ FIS আগে করেছিল তা ভুল ছিল, আর আজ যেন তারা ভুল বুঝতে পেরেছে। এই যুদ্ধজয়ের আনন্দে তাওয়াগীত আর মুরতাদদিন উল্লাস করছে, আর এখন তারা লোকদের বাধ্য করছে দ্বীনের ব্যাপারে ছাড় দিতে। কিন্তু আশার কথা হল, এটাই এই কাহিনীর শেষ না এবং জিহাদেরও শেষ না।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন GIA কে সিরাতুল মুস্তাক্বীমে ফিরিয়ে আনেন অথবা মুত্তাকী মু'মিনদের হাতে GIA কে নির্মূল করেন। হে আল্লাহ্ ! আপনি মুজাহিদিনকে সম্মানিত ও শক্তিশালী করুন।[1]

---

[1] *শাইখের এই দু'আ এবং মুসলিমদের দু'আ কবুল হয়েছে। আল্লাহ্ GIA কে নির্মূল করেছেন এবং তাদের জায়গায় প্রকৃত মুজাহিদিনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ২০০৪ সালে GIA সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর ২০০৩ সালে আলজেরিয়া তথা ইসলামি মাগরিবে উত্থান ঘটে ঘটে তানজীম আল-ক্বা'ইদা ফিল আল মাগরিব আল ইসলামি (AQIM)। আল্লাহ্ যেন তাঁদের সিরাতুল মুস্তাক্বীমের উপর অটল রাখেন এবং তাঁদের সম্মানিত ও শক্তিশালী করেন। বর্তমানে যারা খারেজি মানহাজের উপর আছে, তাঁদের ব্যাপারেও আমাদের শাইখের এই দু'আটিই করা উচিৎ।*

"আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন তাদেরকে সিরাতুল মুস্তাক্বীমে ফিরিয়ে আনেন অথবা মুত্তাকী মু'মিনদের হাতে তাদের নিশ্চিহ্ন করেন। হে আল্লাহ্ ! আপনি মুজাহিদিনকে সম্মানিত ও শক্তিশালী করুন। - অনুবাদক

অধ্যায় ৪

ক্ষমতাসীন খারেজি

বর্তমান শাসকদের বৈধতা কতটুকু?

শরীয়াহ আইনের অবস্থান হল, জনগণ আর শাসক চুক্তিবদ্ধ। ইসলামে যেকোন চুক্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই দুটি পক্ষ থাকতে হবে যারা চুক্তিবদ্ধ হবে এবং আরেকটি পক্ষ থাকতে হবে যে বা যারা এই চুক্তির সাক্ষী হিসেবে থাকবে। এক্ষেত্রে এই তিনটি পক্ষ হল, জনগণ, শাসক এবং সাক্ষী হিসেবে স্বয়ং আল্লাহ্ সুবহানহু ওয়া তা'আলা। চুক্তিতে অবশ্যই একটি বিষয়বস্তু থাকবে, অর্থাৎ সেসব শর্ত যেগুলো মেনে নিয়ে চুক্তি সংঘটিত হয়েছে। ইসলামে এই চুক্তির এর মূল শর্ত তথা ভিত্তি হল শারীয়াহ (অর্থাৎ শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা)। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল নিজে এই চুক্তির সাক্ষী। এই চুক্তির মাধ্যমে শাসককে আল্লাহর পবিত্র বিধান এবং নির্দেশিকা যথাসম্ভব কায়েমের দায়িত্ব দেয়া হয়। আল্লাহ হচ্ছেন এক্ষেত্রে জনগণ এবং শাসক ও শরীয়াহর মধ্যে সেতুবন্ধন স্বরূপ; (অর্থাৎ আল্লাহ-র প্রতি দায়িত্ব তথা জবাবদিহিতা এবং আনুগত্যের মাধ্যমে শাসক ও জনগণ একে অপরের সাথে যুক্ত) কারণ তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই এভাবে তাঁর দ্বীন এবং শারীয়াহকে সাজিয়েছেন, আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন, এবং তিনি এটা আনুগত্যের শপথের (সেই শাসকের প্রতি যে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করে) বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছেন এবং যেটার জন্য তাঁর কাছ থেকে প্রতিদান আছে।

তিনি জনগণদের অনুমতি দিয়েছেন তাদের শাসক নির্ধারণ করার, যে শারীয়াহ কায়েম করবে এবং তিনি শাসককে আদেশ দেন যেন, সে আল্লাহর আইন দিয়ে মানুষকে শাসন করে। এক্ষেত্রে আল্লাহ দুনিয়াতে শাসককে অধিকার দিয়েছেন অবাধ্যদের শাসন করার, যতক্ষন শাসক দুনিয়াতে আল্লাহর কাজ করছে। আল্লাহ জনগণকে সতর্ক করেছেন, শাসক যদি শরীয়াহ দিয়ে না শাসন করে তবে যেন সে শাসকের আনুগত্য না করা হয়। এবং

এক্ষেত্রে শাসকের অন্ধ অনুসরণ হচ্ছে এমন একটি কাজ শিরক আকবর (বড় শিরক) বলে গণ্য হবে। জনগণ এবং শাসকের মধ্যে এই চুক্তিটিকে বলে বাই'য়াহ।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শাসক যদি শরীয়াহ দিয়ে শাসন না করে তাহলে বাই'য়াহর আর বৈধতা থাকে না, কারণ শাসক নিজেই এই ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ করেছে। ইসলামী আইনে, জনগণকে এইরকম শাসককে পরিবর্তন করে ফেলতে হবে ন্যায় ব্যবস্থা এবং ইনসাফ (অর্থাৎ ইসলামী শারীয়াহ) প্রতিষ্ঠার জন্য। যদি জনগণ এমনটা করতে অস্বীকার করে, আর সেনাবাহিনীও শাসককে সমর্থন করে, তবে সে সম্পূর্ণ ভূমিটি দারুল হারব হয়ে যায়। আর এই অবাধ্যতার মাধ্যমে সৃষ্টি মালিকুল মুলক আল্লাহ্ আযযা ওয়াজালকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করে। বিশ্বস্ত তথা হক্কপন্থি 'আলিমদের উচিত তখন এই শাসককে মুরতাদ ঘোষণা করা, এবং এই শাসকের অনুগত দলকে আল্লাহর দৃষ্টিতে কাফির দল ঘোষণা করা।[1] এই দলের সকলেই আল্লাহ-র শত্রু না এবং তাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা নিশ্চিতভাবে শুধু পাপী (আল্লাহ-র শত্রু না, ব্যক্তিগতভাবে)। জিহাদ তখন সকল মুসলিমের জন্য ফরয, যতক্ষণ না সঠিক শাসক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে এবং শারীয়াহ দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হচ্ছে।

উপরে আমরা যে মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করলাম, তা বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে সরাসরি যুক্ত। অথচ বর্তমানে সকল শাসকই এই চুক্তি সম্পূর্ণ ভাবে ভঙ্গ করে শাসন করছে। এ অবস্থা প্রথম শুরু হয়েছিল যখন উসমানী খিলাফাতের সময় থেকে। যদিও সেই সব উসমানী শাসকদের এই দিকে কমতি ছিল, কিন্তু তবুও তারা শাসন বিধান ক্ষেত্রে আল্লাহর শারীয়াহকে অন্য কিছু দিয়ে পরিবর্তন করে দেন নি। কিন্তু যখন মিসরীদের বুকে জাতীয়তাবাদের আগুন জ্বলে উঠল এবং এর কিছুকাল পর সাউদীদের; এবং তারা উসমানীদের থেকে স্বাধীন হয়ে গেল, যারা কিনা শরীয়াহ দিয়ে শাসন করতেন। এই শাসকরা ছিল সত্যিকারের খারেজি, যাদের কিনা উসমানীদের থেকে আলাদা হওয়ার কোন গ্রহণযোগ্য কারণ ছিল না। উসমানীদের সময় থেকেই ফিলিস্তিনে পরিস্থিতি নষ্ট করার

[1] যেসব আলিমরা এই শয়তান প্রশাসনকে সমর্থন করে, তারাও তাদের একজন, এবং আল্লাহর শত্রু।

আশঙ্কায় ইহুদীদের উপস্থিতির উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল, মুসলিমদের জন্য সীমান্ত খোলা ছিল যারা কিনা দারুল ইসলামে হিজরত করতে চাইতো, জনগণদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সাদকা, যাকাত দেয়া হত, জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই অবাধ্য এবং যালিম জাতিগুলো (মিশরী, সাউদী) বিদেশীদের এই খিলাফাহকে উৎখাত করতে এবং ১৩০০ বছরের ন্যায় বিচারের পর যুগের সমাপ্তি ঘটাতে সাহায্য করেছিল। আর এর ফলে এসেছে এমন এক সময় যা বর্বরতাও ধ্বংসলীলার দিক থেকে তাতাদেরকেও হার মানায়।

এই লোকগুলো শুধু বৈধ শাসকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রই করে নি, সাথে সাথে তাদের অবৈধ সরকারকে যারা বাই'য়াহ দেয় নি তাদের উপর বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তিকালের ১০০ বছর পার হওয়ার আগেই মনসূর নামক এক জাঁদরেল ব্যক্তি অনৈতিক ভাবে খালিফাহ হয়ে বসে। সে জোর করে মানুষদের থেকে বাই'য়াহ আদায় করত, যদিও কিছু মানুষ তাকে বা'য়াহ দিয়ে দিয়েছিল তবে সাধারণ মানুষজন নফস উয-যাকিয়াহকে রাহিমাহুল্লাহকে বাই'য়াহ দিতে চেয়েছিল, যিনি ছিলেন খালিফাহ হবার যোগ্য দাবীদার।[1]

যাই হোক, মানুষজন অযুহাত তৈরি করলো, তারা কিভাবে আবার বাই'য়াহ দিবে, তারা তো ইতোমধ্যে মনসূরকে বা'য়াহ দিয়েই দিয়েছে। মানুষজন ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ এর কাছে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেই হাদিসটি বলতে লাগল যে, যদি তোমাদের মধ্যে দুইজন খলিফা থাকে, তবে দ্বিতীয়জনকে হত্যা কর, যে পরে দাবী করেছে। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ ফাতাওয়া দিলেন যে, মানসূরকে বাই'য়াহ দেয়াটা ছিল, কোন লোককে জোর করে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ানোর মত, যেহেতু বাই'য়াহটি জোর পূর্বক ছিল, তাই এটি অবৈধ। যদিও ফাতাওয়াটি হাজার বছর আগে দেয়া হয়েছিল, এরপরও সেটা এখনো প্রযোজ্য। বর্তমান এইসব শাসকদের সাথে জনগণের কোন

---

[1] আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে কুফরের ব্যাপারে আরো তথ্য জানতে, The Need for Shari`a, Allah's Governance on Earth, Answering the Words of Ibn `Abbas and The Way to Get Shari`a.

চুক্তিই নেই। এখন তারা কতগুলো নির্বাচনে অংশ নিল, আর আমরা নিজেরা তাদের ব্যাপারে কি ভাবলাম আর না ভাবলাম এগুলোর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। যতক্ষণ না আল্লাহর কাছে তাদের শাসন বৈধতার স্বীকৃতি পাচ্ছে, ততোক্ষণ আমরা এদের স্বীকৃতি দিতে পারি না। যেমনটা আল্লাহ বলেন,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১৯৪)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আশা করবো যে আপনারা ইতিমধ্যে বুঝতে পারছেন যে আসলে খারেজি কারা। এর পরেও আমরা এই ব্যাপারে আরো একটু খোলাসা করতে চাচ্ছি সেসব ভয়ংকর খারেজিদের ব্যাপারে যারা ক্ষমতায় রয়েছে। তাহলে তাদের বার্তা এবং কাজগুলোকে খতিয়ে দেখা যাক, বাকি সিদ্ধান্ত আপনারাই নিবেন। আপনারা সকলেই ইতিহাস জানবেন এবং মূল ব্যাপারটি বুঝবেন। তাদের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নীতি, তাদের মূল শত্রু এবং মিত্র, তাদের আনুগত্য এবং ভালোবাসা কাদের প্রতি এসব ভালো করে জানলেই যারা আমাদের শাসন ক্ষমতায় চেপে বসে আছে, আপনারা তাদের পরিচয় জানতে পারবেন।

আপনারা দেখবেন যে এরা হচ্ছে ধার্মিকতাহীন খারেজি। তারা হয়ত আমাদের ভাষায় কথা বলে, আমাদের মতই হয়ত গায়ের চামড়া, এমনকি চাপে পড়লে সুবিধা অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহ থেকে হয়ত আমাদের মতই দলীল দেয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে তাদের ছুরিতে সর্বদা মুসলিমদের রক্তই লেগে থাকে, আর তাদের হাত সর্বদা কুফফারদের মিষ্টি খাওয়াতেই ব্যস্ত। এর পাশপাশি তাদের পক্ষ থেকে কুফফারকে দেয়া আরো অন্যান্য সুবিধা দেয়া তো আছেই, যেমন মুসলিমদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো কুফফারদের হাতে তুলে দেয়া, অথবা মুসলিম নারীদের পণ্য হিসেবে কুফফারদের কাছে বিক্রি করে দেয়া। ইসলামের বিরুদ্ধে এই অনবরত

যুদ্ধে এইসব প্রশাসনের কিছু দুনিয়ালোভী দরবারী কিছু শাইখ বা 'আলিমও আছে, এরা উৎসাহের সাথে যালিম এবং তাদের দূর্নীতির স্বপক্ষে ব্যালেট বক্সে ভোটও দেয়। এমনকি যদি শাসকরা গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, প্রকাশ্যেই কুফরি উচ্চারণ করে এবং কুফরি সংঘটন করে তবুও এসব বেতনভোগী, দুনিয়ালোভি 'আলিমরা শাসকের দাসত্ব থেকে নিবৃত্ত হবে না।

সাউদী কারাগারে নির্যাতনের বিশেষ প্রতিবেদনঃ[1]

গত কিছু মাস সাউদী কারাগারে কাটানো এক ভাইয়ের সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকার এখানে তুলে ধরা হল। জিহাদের ভূমি হতে ফেরার পরই তাকে আটক করা হয়েছিল, তবে আলহামদুলিল্লাহ, তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং সাম্প্রতিক ঘটনার আগেই তিনি দেশ ছেড়েছেন। আমরা আপনাদের ভালোভাবে আশ্বস্ত করছি যে, উল্লেখিত ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য এবং সরাসরি সে ভাই হতে পাওয়া, যিনি নিজেই নির্যাতিত হয়েছিলেন। যদিও সাউদী প্রশাসনের সমর্থক এবং রক্ষকারীরা এই ঘটনাকে মিথ্যা এবং বনোয়াট বলা চেষ্টা করবে।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

"আমি বুঝতে পারছি না যে কোথা থেকে শুরু করবো, কিন্তু আমাকে যে সত্যটি বলতেই হবে, বিশ্বকে জানাতেই হবে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম মুনাফিক এই প্রশাসনের আসল চেহারা। আমারা সাথে যা হয়েছে তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব না। আফগানিস্তানে আমি মজলুম মুসলিমদের সাহায্যে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন করতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরে আসার পর, সাউদী আরবের পূর্ব প্রদেশের আল-

[1] ঘটনাটি আযযাম ওয়েব সাইটে প্রকাশ হয় এবং বিশ্বাসযোগ্য ভাইদের দ্বারা সত্যায়িত।

খুবার-এ[1] আমরা নিজ বাসায় পরিবারের সাথে এক রাতে ঘুমাচ্ছিলাম। সেই রাতে হঠাৎ সদর দরজায় জোরে করাঘাতে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আমার ভাই দরজা খোলা মাত্রই কিছু লোক তাকে দেয়ালে ঠেসে ধরে। তারা আমার পরিবারের আরো কয়েকজন সদস্যের সাথে ঠিক এমন কাজটাই করে। তারা আমার ঘুম ভাঙিয়ে, আমার কাপড় ধরে টেনে হিচড়ে বের করে আনে, এবং আমাকেও দেয়ালে ঠেসে ধরে। তারা জোরে জোরে আমাকে বলতে থাকে,

"ব্যভিচারিনীর সন্তান! কুকুর! কোথায় অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিস?"

আমি তাদের বললাম যে এখানে কোন অস্ত্র নেই। এরপরও তারা আমার পরিবারের সামনেই আমাকে মারধোর করা শুরু করল। তারা সারা-বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজলো। এরপর হাতকড়া পড়িয়ে গাড়িতে করে গোয়েন্দা সংস্থার হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গেল। সেখানে পৌছে জোর করে গাড়ি হতে নামিয়ে একটা রুমে নিয়ে আমার সব কাপড় খুলে ফেলল। তারা আমরা আওরাহ (লজ্জাস্থান) এর ব্যাপার কটু মন্তব্য আর হাসাহাসি করতে শুরু করল। যখন তাদের জিজ্ঞেস করলাম যে কেন তারা এমনটা করছে, তারা বলল যে এটা নাকি তদন্তের অংশ। এরপর তারা আমাকে কাপড় ফেরত দিয়ে আরেকটি রুমে নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করতে বলল। ঘরটি ছিল খুব ঠান্ডা। আমি একটি চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়লাম। ১১ ঘন্টার মত ছিলাম, যতক্ষণ না একটি লোক চড় মেরে আমার ঘুম ভাঙায় এবং বলে,

"কুকুর, এত বড় সাহস তুই ঘুমিয়েছিস?"

তারা গালাগাল শুরু করে, "সমকামী, মা-বোনের সাথে ব্যভিচারী!"

আমি তাদের বললাম, "এসব বলো না, এগুলো ইসলাম সম্মত নয়।"

---

[1] আল-খুবার হল সেই শহর যেখানে মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল।

তারা দুইটি গার্ডকে আমাকে আঘাত করতে ইশারা করল। তারা কয়েকবার আমাকে আঘাত করল। এরপর লোকটি বলল, "আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবি না, তোর চাইতে আমরা ভালো জানি।"

এরপর তিনজন অফিসার ঢুকলো, আহমাদ মুহাম্মা আল-বা'আদী, নিদা আল-উতাইবী, সামীর রশিদ আল-কাহতানী। তারা সকলেই যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করেছে। তারা এসে বসল এবং আমাকে দেখে বলল,

"এর মুখ দিয়ে তো তেমন রক্তই বের হয় নি, এটা তো মানায় না।"

এরপর এক বিশালকারের সৈন্য এসে আমাকে চড় দেয়া শুরু করল যতক্ষণ না রক্ত বের হয়। এরপর তারা জিজ্ঞেস করল, "কোথায় তুই মুজাহিদ হতে শিখলি?"

আমি বললাম, "আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহ হতে।"

তারা বলল, "মিথ্যুক! আল্লাহর কিতাব ওয়ালী উল-আমর এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শিক্ষা দেয় না।"

আমি বললাম, "আমি কোন ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করি নি।"

তারা বলল, "কোন কথা বলবি না, শুধু আমরা বলবো।"

তারপর ১৩ ঘন্টা ধরে তারা আমাকে প্রশ্ন করেই চলল, তারা শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ এর ব্যাপারে প্রশ্ন করল। আমি তাদের বললাম, সাউদী সরকার তো শাইখের ব্যাপারে মিডিয়াতে ভালোই বলে। তখন আহমাদ মুহাম্মাদ আল-বা'আদী বলল,

"আমরা আব্দুল্লাহ আযযামের ব্যাপারে ভালো করেই জানি। সে নাবালক সব ছেলেগুলোকে আফগানিস্তানে ডেকে নিয়েছে জিহাদের নামে একে অপরের সাথে সমকাম করার জন্য।"

আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কেন আমাকে সেখানে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমার তারপর মনে হল এই প্রশ্ন না করাই ভালো ছিল। তারা বলল,

"মনে হচ্ছে তোমাকে এখনো ঠিকমত শিক্ষা দেয়া হয় নি!"

এরপর তারা গার্ডদের বলল আমাকে উচিত শিক্ষা দিতে। গার্ডগুলো আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মারতে থাকল যতক্ষণ না অফিসাররা বলল, "যথেষ্ট হয়েছে!"

আমাকে নিয়ে কারাগারে ফেলা হল, এবং পরের দিন তারা আবার এসে জিজ্ঞেস করল, "কেন তুই জিহাদে গেলি?"

আমি বললাম, "মুসলিমদের সাহায্য করতে যেন তারা কুফফারদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়।"

তারা বলল, "মিথ্যাবাদী! তুই চাস সাউদী প্রশাসনকে উৎখাত করতে।"

আমি বললাম যে, তা সত্য নয়।

এরপর তারা ৬ ঘন্টা ধরে প্রশ্ন করল। জিজ্ঞেস করল যে কোথায় আমি অস্ত্র এবং বিস্ফোরক লুকিয়ে রেখেছি। আমি তাদের বললাম যে আমি এমন কিছু লুকিয়ে রাখি নি। তারা আমাকে আরো প্রশ্ন করল। আমি বললাম যে, আমি জানি না।

তারা গার্ডদের বলল আমাকে রুমে নিয়ে যেতে এবং দাঁড় করিয়ে রাখতে। আমি ভাবলাম যে আমাকে একদিন দাঁড় করিয়ে রাখা হবে, খাবার দেয়া হবে। কিন্তু তারা আমাকে ৮ দিন দাঁড় করিয়ে রাখল কোন খাবার এবং ঘুম ছাড়াই, তারা শুধু আমাকে পানি পান করতে দিয়েছে।

যখন আমি সালাহ আদায় করতাম, আমি দীর্ঘ সিজদা করতাম একটু আরামের জন্য। একজন অফিসার আমাকে এসে লাথি মারত, পা দিয়ে আমার ঘাড় উঠিয়ে বলত,

"বেশিক্ষণ সিজদা করবি না! উঠ!"

এবং গালাগাল করত। সে এমনটা করত যখন আমি সালাহ আদায় করতাম।

৮ দিন পর মনে হল যে আমি মরেই যাবো, কারণ কোন খাবার এবং ঘুম ছিল না। এরপর অফিসারেরা এসে আমাকে ডেকে পাঠালো।

তারা খাবার এবং পানীয় দিয়ে বলল,

"এখন তোমাকে আমরা মৃত্যু থেকে বাঁচালাম, এবার বল যে কোথায় অস্ত্র আর বিস্ফোরক লুকিয়ে রেখেছিস?"

আমি তাদের বললাম যে, আমি জানি না, কারণ আমার কাছে এমন কিছুই নেই। তারা বলল,

"মনে হচ্ছে এখনো তোর শিক্ষা হয় নি!"

তারা আমাকে একটি রুমে নিয়ে চেয়ারে বসালো, এবং আমার হাত-পায়ে ইলেটকট্রোডস জড়িয়ে দিল। একজন অফিসার ৩০ ভোল্টে সুইচ অন করল। তারা আবার জিজ্ঞেস করল যে, কোথায় অস্ত্র আর বিস্ফোরক। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ছাড়া কিছু বলবো না। এরপর সে ভোল্টেজ ৬০, এরপর ৯০ এরপর ১২০ নিয়ে গেল; একপর্যায়ে ১৫০ নিয়ে গেলে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। পরের দিন জাগার পর তারা আমাকে আবার সেই রুমে নিয়ে এল এবং আমার গায়ে ঠান্ডা পানি ঢাললো আর ইলেকট্রিক শক লাগার জন্য। তখন আমি বললাম,

"ঠিক আছে, আমি তোমাদের বলবো কোথায় অস্ত্র এবং বিস্ফোরকগুলো রয়েছে!"

তারা জিজ্ঞেস করল যে কোথায়। আমি বললাম, "আমি সেগুলো আফগানিস্তানে ফেলে এসেছি!"

এরপর তারা আমাকে আবারো মারধোর এবং গালাগাল শুরু করল। দুইদিন আমাকে কোন খাবার দেয়া হল না। এরপর একজন অফিসার জিজ্ঞেস করল যে আমি খেতে চাই কিনা। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন সে বলল যে কোন রেসটুরেন্টে খেতে চাই। আমি বললাম,

"মাশা'আল্লাহ! তোমারা তো এখানেই ফাইভ-স্টার সার্ভিস দিচ্ছ!"

সে বলল, "আসলে তুই দেখবি যে আমরা এখানে টেন-স্টার সার্ভিসও দেই।"

এরপর সে হাসা শুরু করল। আমি তার হাসি দেখে অবাক হলাম। সে আমাকে একটি রুমে নিয়ে জিজ্ঞেস করল যে কি খেতে চাই। আমি ভাবলাম সে আসলেই জানতে চাচ্ছে। আমি বললাম যে, হারদিসের চীজ-বার্গার। সে বলল,

"আর কিছু?"

আমি বললাম, "ফ্রেঞ্চ ফ্রাই।"

"আর কিছু?"

"একটা পেপসি।"

সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে আরো কিছু লাগবে কিনা, তখন আমি বললাম যে এতটুকুই যথেষ্ট। তারপর সে বলল, "একটা আপেল পাই আনলে কেমন হবে?"

আমি বললাম, "আনুন তাহলে।"

সে আমাকে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর কিছু শক্ত-সামর্থ্য লোককে নিয়ে ফিরে এসে, আমাকে লোকগুলোকে দেখিয়ে বলতে লাগলো, "এই নাও চীজবার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, পেপসি এবং আপেল পাই। এতেই তোর পেট ভরবে, ইনশা'আল্লাহ।"

আমি টেবিলের উপর হাত রেখে চেয়ারে বসে ছিলাম। "চীজ-বার্গার" নাম দেয়া লোকটি একটি বেত এনে আমার হাত দুইটি নীল হওয়ার আগ পর্যন্ত মারতে থাকল। অফিসারটি জিজ্ঞেস করল যে আমার খাওয়া শেষ হয়েছে কিনা। আমি হ্যাঁ বলতে চাচ্ছিলাম কিন্তু ব্যাথার দরূণ কোনো কথাই বলতে পারলাম না। এরপর "ফ্রেঞ্চ ফ্রাই" নাম দেয়া লোকটা তিনটা বেত এনে বলল, "এগুলো আজ ভাঙতেই হবে!"

সে পিঠে মারা শুরু করল কিন্তু আল্লাহর রহমতে সেগুলো দ্রুতই ভেঙে গেল। জানি না সে কতবার মেরেছিল কিন্তু তৃতীয়বারের পর থেকে আমার কোন ব্যথাই অনুভূত হচ্ছিল না। এরপর আসল "পেপসি" আর "আপেল পাই"। তারা আমাকে টেবিলে

শুইয়ে দিয়ে "ফালাকাহ" নামক একটি জিনিস আনল। এটা হচ্ছে দড়ি যুক্ত খাটো, পুরু কাঠের গুড়ি। তারা দড়িটি আমার পা হয়ে, কাঠের গুড়িটি পায়ের হাড়ের বিপরীতে রেখে দুইটি পা শক্ত করে বাঁধল। দুইজন দড়িটির দুইপাশ ধরে উচু করল যে আমার পা শূণ্যে উঠে যায়।

এরপর আরেকজন লোক একটি লম্বা-চিকন বেত নিয়ে আসল এবং রক্তাক্ত হওয়া পর্যন্ত আমার পায়ের তালুতে মারতে থাকলো (এই কারণে ছয়দিন দাড়াতে পারি নি)। তাদের থামানোর জন্য অনুরোধ করলেও তারা কোন কর্ণপাত করে নি। চারঘন্টা নির্যাতনের পর তারা চলে গেল।

এরপর অফিসারটি এসে জিজ্ঞেস করল যে, আমার আর কোন খাবার লাগবে কিনা। আমি বললাম, "না! যথেষ্ট।"

যে বলল যে আমার কী কেক বা মিষ্টির দরকার কিনা। আমি রেগে বললাম, "দূর হ, কাফির! কুকুর! দাজ্জাল! আমরিকার দালাল! ইসরাইলের দালাল! ক্রুশের পূজারী!"

এর সে দুইবার হাতে তালি দেয়ার পরই তিনজন লোক তিনিটি গ্লাসের ট্যাংক নিয়ে ঢুকলো, প্রতিটি ট্যাংকেই ছিল একটি করে সাপ। এরপর সে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল,

"এগুলো কি ছেড়ে দিবো? আমি কাফির, হ্যাঁ? আমি কুকুর, তাই? আমরা এগুলো ছেড়ে দিবো এবং কিছু বিছাও নিয়ে আসবো।"

একটি সাপ ছিল আমার হাতের মত মোটা এবং আরেকটি ছিল গোখরা।

"এগুলো তোমাকে আনন্দ দিবে", এই বলে সে গ্লাসের ঢাকনা খোলার নির্দেশ দিল। আমি খুব ভয়ে কেঁদে দিলাম এবং বললাম,

"আমি সব বলবো, কিছুই লুকোবো না, শুধু এই সাপগুলো দূরে নিয়ে যান।"

অফিসারটি খুব খুশি হয়ে আমার দাড়ি এবং মাথায় বাড়ি দিয়ে বলল, "মাশা'আল্লাহ! খুব ভালো ছেলে, খুব বুঝে গেছ তাহলে!"

সে আমার চোখের পানি মুছে দিতে দিতে বলল, “কেঁদো না ছোট বাবু, আমি তোমার বাবার মত।”

আমি লোকটির ব্যাপারে আল্লাহর ধৈর্য্যে বিস্মিত হলাম। তারা আমার শিকল খুলে দিলে আমি বললাম, আমি হাটতে পারি না। অফিসারটি বলল,

“চিন্তা করো না, তোমাকে সেবা দেয়া হবে।” সে অন্যদের আমাকে তুলে জিজ্ঞাসবাদের রুমে নিয়ে যেতে বলল।

তখন আমি মানসিকভাবে একেবারেই ভেঙে পড়েছিলাম। আমি তাদের ভাইদের ব্যাপারে তথ্য দিয়ে দিলাম, কিন্তু আমি তাদের সবটুকু বললাম না। কিন্তু আল্লাহ জানে যে, আমি তাদের কিছুই বলি নি যতক্ষণ না আমি এইরকম ভয়ংকর অবস্থায় পৌছাই। যারা এটি পড়ছেন, তারা আসলে আমার জায়গা থেকে কখনোই অনুধাবন করতে পারবেন না। আমি আল্লাহর কাছে এটি বিচার দিবসে একটি ওজর হিসেবে চাই।

আমাকে কারাগারে ক্লিনিকে নিয়ে আমার চোখ, পিঠ, পা এবং হৃদপিন্ডের চিকিৎসা দেয়া হল যা ইলেকট্রিক শকের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। আমি ছয়দিন ক্লিনিকে ছিলাম। যদিও এরপরে আমাকে কোন শারীরিক নির্যাতন করা হয় নি, কিন্তু প্রতিনিয়তই আমি মানসিক নির্যাতনের মধ্যে ছিলাম। যেমন তারা আমার সামনে উচ্চ আওয়াজে গান বাজাত এবং এত খারাপ ভাষায় গালাগাল করত যা কখনো চিন্তাও করা যায় না। এরপর তারা আমাকে একটি সাধারণ কারাঘরে নিয়ে গেল, সেখানে আরো তিনি জন মুজাহিদ ভাই ছিলেন।

সেই ভাইদের সাথে দেখা হওয়ার পর আমি বুঝলাম যে আমার সাথে যা ঘটেছে তা এই ভাইদের তুলনায় কিছুই না। এক ভাইকে তো শস্যদ্রব্যের ফ্রিজে দুই দিন ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ভাইটি বারবার নক করেছিলেন, অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তারা শুনে নি। কিন্তু তারা যখন তাকে বের করল, তিনি মানসিক ভাবে একেবারেই শেষ

হয়ে গিয়েছিলেন যে এমন কিছু স্বীকার করে নিলেন যে যা তিনি করেনই নি। সেই সময় থেকে তার বুকে ইনফেকশন।

আরেকজন ভাইকে রাখা হয়েছিল খুব গরম একটি রুমে, তাকে খুব লবনাক্ত খাবার দেয়া হত। তিন দিন তাকে কোন রূপ পানিই দেয়া হয় নি। এরপর তারা এসে তাকে পানি লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করল। ভাইটি এতই পীপাসার্ত ছিলোন যে, তার মুখ এতই শুকিয়ে গিয়েছিল যে তিনি কথা পর্যন্ত বলতে পারছিলেন না। তিনি কোনরূপ ইশারায় জানালেন যে পানি দরকার। তারা তার জন্য মিনারাল ওয়াটার এনে তৃপ্তির সাথে পান করতে দিল। তিনি টয়লেটে যেতে চাইলে, তারা তার হাত বেঁধে, প্যান্ট খুলে প্রশ্রাব করার স্থান কালো টেপ দিয়ে বন্ধ করে দিল। তারা হাসতে হাসতে বলল,

"যাও! প্রশ্রাব করো গিয়ে!"

কয়েক ঘন্টা পর তিনি কেঁদে কেঁদে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন,

"একটি কালো কাগজ নিয়ে আস, আমি সাক্ষর দিব। আমার সাক্ষরের উপরে যত খুশি অপরাধনামা লিখ। আমি সাদাতকে (মিশরের রাষ্ট্রপতি) হত্যা করেছি, আমি ফয়সালকে (সাউদীর আরবের রাজা) হত্যা করেছি, আমি জন এফ কেনেডিকে (যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি) হত্যা করেছি।"

তিনি পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যত সম্ভব সব রকম তথ্য দিয়ে দিলেন। এমনকি যে ব্যাপারে তারা প্রশ্নও করে নি। শেষ পর্যন্ত তারা তাকে প্রশ্রাব করতে দিল।

একজন ভাই নির্যাতন থেকে ফিরেছিল হাসি মুখে। তিনি খুশি ছিলেন, কারণ তিনি চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রকে সাউদী সরকারের সাহায্যের। জিজ্ঞাসাবাদের সময় এক মার্কিন অফিসারের আইডিন্টি কার্ডে তিনি পড়েছেন, "এফবিআই সাউদী আরাবীয়া শাখা"। এরপর আমি জানলাম যে, এমনকি এফবিআই-এর আল-খুবারেও একটা অফিস আছে!

আমি কারাগারে আরো দুইমাস দশ দিন ছিলাম। এক সকালে অফিসার আব্দুল গনি আশ-শরীফ এসে, "ওই ব্যভিচারিনীর সন্তান, মায়ের সাথে ব্যভিচারী" বলে এক ভাইকে ডাকলো। ভাইটি তাকে আল্লাহকে ভয় করতে বললেন। সে উত্তর দিল,

"তুই কী আমাকে আমার প্রভুর ব্যাপারে শেখাস চাস? আমি আমার প্রভুকে ভালো করেই জানি! তোর প্রভুর উপর লা'নত! তোর দ্বীনের উপর লা'নত!"

এই অফিসারকে আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কেন আমাকে নির্যাতন কর হচ্ছে, অথচ আমরা দুইজনই কুরাইশ গোত্রের? সে উত্তর দিয়েছিল,

"হ্যাঁ, কিন্তু তুই মুহাম্মাদের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বংশের এবং আমি আবু জাহলের বংশের।"

প্রিয় ভাইয়েরা, আপনারা হয়ত বিশ্বাস করবেন না যদি আমি বলি যে সেই দিনগুলো ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনগুলো। আমরা প্রতি রাতে একসাথে সালাহ আদায় করতাম, সারাদিন সিয়াম সাধনা করতাম, যেমনটা ইমাম ইব্ন তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

"আমরা শত্রুরা আর কিইবা করতে পারে? আমার জান্নাত তো আমার অন্তরে, যেখানেই যাই সাথেই থাকে। আমাকে হত্যা করবে? আমি শহীদ হবো। আমাকে কারারুদ্ধ করবে? আমি তো আল্লাহর সাথে একান্তে সময় কাটাবো। এবং আমাকে বের করে দিবে? আমি তো হিজরত করবো।"

কিছু ভাই তো দেয়ালে এই কথাগুলো রক্ত দিয়ে লিখে রেখেছিল। এবং কারাগারে আমরা বারবার একটা শ্লোগান বলতাম, আমাদের গর্ব হত, সত্য মনে হত,

لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله

"লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ! এতেই আমরা বেঁচে থাকি, এতেই আমরা মরি। এই পথেই আমরা জিহাদ করি এবং এই পথেই দেখা করি আল্লাহর সাথে।"

কারাগারের প্রতিটি কক্ষের কারারুদ্ধ ভাইয়েরা একসাথে শ্লোগানটি বারবার পাঠ করত। গার্ডগুলো দরজায় লাথি মেরে চুপ করত বলত, এবং বলত. "আল্লাহ তোদের জিহবা কেঁটে নিক, নতুবা আমরা যেন তোদের মুখে লাথি মারতে পারি।"

কিন্তু এতে আমাদের আওয়াজ শুরু বাড়তই। এবং আমরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কেঁদে কেঁদে আল্লাহু আকবার বলতাম, কারণ আমরা জানতাম যে এই কারগার হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা, যেন আমাদের গুনাহগুলো থেকে ঈমান বিশুদ্ধ হয়ে যায়, যেমনটা বিলাল রাদ্বিয়ায়ল্লাহু আনহু, ইয়াসির রাদ্বিয়ায়ল্লাহু আনহু এর পরিবার, আব্দুল্লাহ বিন মা'সূদ রাদ্বিয়ায়ল্লাহু আনহু, কা'ব বিন 'আরাত রাদ্বিয়ায়ল্লাহু আনহু, আবু যর আল-গিফারী রাদ্বিয়ায়ল্লাহু আনহু এবং তাদের সকলের আগে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হয়েছিল।

যখন এই শাস্তিগুলো আল্লাহর ঈমানের সাথে মিলিত হয়, তখন সেটা দূর্ভাগ্য নয় বরং আল্লাহর রহমতে পরিণত হয়। ভাইদের স্বর সর্বদা কুরআন পাঠ এবং আল্লাহ যিকিরেই মগ্ন থাকত। আমরা অনুধাবন করতে লাগলাম যে এই স্বরই আগামীতে জালিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অস্ত্র হয়ে দাড়াবে। যতবারই আমরা যালিমের অত্যাচার বেড়ে যেতে দেখেছি, তত তাদের শেষ পরিণতি কাছে এগিয়েছে, কারণ আল্লাহ অবকাশ দেন কিন্তু উপেক্ষা করেন না।

তারপর আমার ব্যাপারে কোর্টে সাক্ষ্য প্রমাণের পর, আল্লাহ আমাকে কারাগার এবং দেশ থেকে বের হওয়ার সুযোগ করে দেন। আমি লেখাটি সকল মুসলিম এবং মুসলিম বিশ্বের কাছে লিখছি, যেন তারা এই মুরতাদ প্রশাসনের বাস্তবতা বুঝতে পারে। যেন তারা বুঝতে পারে এটা হচ্ছে মিথ্যার প্রশাসন, যারা ইসলাম বহন করার ভান করে মাত্র, অথচ ইসলাম তাদের কর্ম থেকে নিশ্চয়ই দায়মুক্ত। এবং তাদের জানাতে যারা এই প্রশাসনের পক্ষে এবং এদের সালাফী বলে বেড়ায়, বলে বেড়ায় যে এই প্রশাসন নাকি তাওহীদের আক্বীদাহ প্রতিষ্ঠিত করেছে, অথচ এর সৈন্যরা তাওহীদের কথা বলার কারণে মুসলিমদের শাস্তি দিয়ে বেড়াচ্ছে।

একজন মুজাহিদ ভাই

একজন বোনের গল্পঃ

বাসার নারী এবং শিশুরা হুড়োহুড়ি করে উপর তলার দিকে ছুটল। উপরে ছিল দুইটি ছোট রুম এবং খুব সরু করিডোর, আর করিডোরের সমান একটি অতিরিক্ত রুম। এ রুমটি ছিল খালি। এ ছোট রুমেই আটজন শিশু সহ আমরা চব্বিশজন লুকিয়েছিলাম। রুমের বাইরে আমরা পদধ্বনি শুনতে পেলাম। দুই-তিনজন পুরুষের কণ্ঠ ভেসে এল।

এক ঝটকায় দরজাটি খুলে ফেলার আগ মুহুর্তে আমরা দাড়িয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করার চেষ্টা করছিলাম... কিন্তু দরজার ওপাড় থেকে ভয়ঙ্কর চাহনি নিয়ে তারা আমাদের দিকে তাকিয়েছিল।

শিশুদেরকে আমদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হল। তারা চিৎকার করছিল। আমরা তখন কি করব? চুপচাপ বসে থাকবো! ভালো কিছুর আশা করবো! দুআ করবো!

হে আল্লাহ আমাদের শিশুদের রক্ষা করুন!

এবার তারা ঘরের ভেতর ধ্বংসযজ্ঞ চালানো শুরু করলো। আমি শুধু নীরবেই দেখে গেলাম। এগুলো তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের নিয়মিত অংশ। একসময় আমাদের টেনে হিচঁড়ে, ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামানো হল। কয়েকজনকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। সময়টা ছিল দুপুর তিনটার কাছাকাছি। ভরদুপুরে, সূর্যের খুব কড়া রোদে আল-আনবা'ঈন যেন ফুটছিল।

নাদিয়ার পোশক টেনে ছিড়ে ফেলা হয়েছিল, ওর পায়ে কোন জুতাও ছিলনা। ভেজা মুখের উপর ওর চুলগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়েছিল!

তারপরও ও বাচ্চাকে শক্ত করে বুকে আঁকড়ে রেখেছিল। ওর গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। ওদের থাবা গুলো নাদিয়ার শরীরের দিকে ক্রমেই এগিয়ে আসছিল। আরও শুধু বারবার ওর সন্তানের জীবনের ভিক্ষা চাচ্ছিল! আমার সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অনেকটা নিজের অজান্তেই যেন, আমি হাত বাড়িয়ে ধীরে ধীরে নাদিয়ার দিকে এগুতে থাকলাম। আমরা বিধ্বস্ত মনের এককোণায় তখনো মনে হচ্ছিল যে, আমি হয়তো বাচ্চাটাকে নিতে পারবো।

নাদিয়ার চেহারার দিকে তাকাতে আমার যেটুক সময় লাগলো, তার মধ্যেই ওরা বাচ্চটিকে বেয়োনেটে বিদ্ধ করে উঁচিয়ে ধরলো। নাদিয়া চিৎকার করে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। কিন্তু তাকে মাটিতে ফেলে দেয়া হল। আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!! বেয়োনেটের আঘাতে তার শরীর দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করলো। সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

এবার আমার পালা। কিন্তু তাদের মনোযোগ বিঘ্নিত হল। কী জন্যে, আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। যতটুক কম করে সম্ভব, ডানদিকে ফিরে দেখলাম, নাযলা ছয়তলার বারান্দায় এসে দাড়িয়েছে। ওর পড়নে কামিস ছাড়া কিছুই ছিলনা। ও কিনারায় উঠে বসল। ওর উদোম পাগুলো কাঁপছিল। কিন্তু সেদিকে ওর খেয়াল নেই, মনে হচ্ছিলো ও যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। লাফ দেয়ার আগে ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলো।

আমি প্রাণপণে মেইন রোডের দিকে ছুটলাম, কিন্তু বৃথা গেল। আমাদের একটি মিলিটারি গাড়ির পেছনে তোলা হল। ভেতরে আরো ১১ জন মুসলিম বোন ছিল! আমাদের সকলের পর্দা খুলে ফেলা হয়েছিল, অথচ পর্দা হচ্ছে আমাদের পবিত্রতা।

মরুভূমির নীচের আন্ডারগ্রাউন্ড কারাগারগুলো ছিল পৃথিবীর মাঝে জাহান্নাম স্বরূপ। অন্ধকারময়, প্রবলভাবে জনাকীর্ণ এবং দূর্গন্ধে আবদ্ধ... রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টাই ওরা আমাদের উপর নযর রাখত। আমদের বিভিন্ন সমস্যা এবং গোপণীয়তার রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা দেখে কুৎসিত উল্লাস আর পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করত। আমাদের প্রতিদিনকার খাবার ছিল একটা বাসি রুটি এবং এক প্লেট নষ্ট মসূর ডাল। ডাল গুলো থেকে ফেনা উঠত, কারণ সেগুলো তিন—চারদিন আগে রান্না করে মরুভূমির রোদে ফেলা রাখা হতো।

ধর্ষণ এবং মারধোর ছিল সেই জাহান্নামের প্রতিদিনকার সাধারণ ব্যাপার। সবচেয়ে জঘণ্য ছিল যখন আমাদের গ্রাউন্ড লেভেলে নিয়ে যাওয়া হত, উলঙ্গ করে, শিকল এবং হাতকড়া পরিয়ে। তারপর ভাইদের নিয়ে আসা হতো, যাতে আমাদের উপর চালানো প্রাত্যহিক নির্যাতন তাঁরা দেখতে বাধ্য হন।

আমাদের অপরাধ কী ছিল! আমরা কি সন্ত্রাসী? আমরা কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি? আমরা কি অন্যদের হত্যা করেছি? না, আমরা এগুলো কিছুই করিনি! হ্যাঁ, আমাদের একটাই দোষ ছিল। আমরা ছিলাম এবং এখনো আছি, দ্বীনদার মুসলিমাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আর আমাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন যারা দ্বীনদার মুসলিমদের দ্বীনদার স্ত্রী।

এমন না যে আমরা জনসম্মুখে বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে বেড়াতাম। হ্যাঁ আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় একত্রিত হতাম, সালাত আদায় করতাম, কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করতাম, বাচ্চাদের বলতাম যেন স্কুলে থাকাকালীন অবস্থাতেও যেন তারা সালাত ছেড়ে না দেয়। আমাদের মেয়েরা আমাদের মতোই পর্দাপালন করতো।

আমাদের পুরুষরা কোন হদিস ছাড়া উধাও হয়ে যায়। আমাদের সন্তানদের সাথে নির্মম আচরণ ও উপহাস করা হয়, অনেক ক্ষেত্রে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়। আর আমাদের সাথে কি রকম বর্বরতা করা হয়, তার কিছু আমি এরই মধ্যে আপনাদের বলেছি। আর এই হল আজকের মিশরের অবস্থা।

একজন ক্লান্ত কিন্তু এখনো আল্লাহ-র উপর, তাঁর সাহায্যের উপর এবং তাঁর দ্বীনের উপর বিশ্বাসী বোন হিসেবে, অন্য সকল বোনের পক্ষ থেকে আমি দাবি জানাচ্ছি যেন আমাদের ভাইদের নিরাপত্তা দেয়া হয়। কেননা এত কিছুর পরও আমরা জানি আল্লাহ্ বলেছেন এটা আমাদের অধিকার। আমরা আপনাদের সকলের কাছেই এই আহবান জানাই।

উপসংহারঃ

সবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রতিবদ্ধকতা খুব বিশাল। এই প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে লক্ষ্যে পৌছানো কষ্টসাধ্য। এই চরম সত্যের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহর পথে এই পরিস্থিতির মুকাবিলা করা আল্লাহ পক্ষ থেকে অশেষ নিয়ামাত নিয়ে আসবে, যা তিনি ওয়াদা করেছেন।

এই ছোট প্রচেষ্টার সাথে, এই গবেষণার সাথে যারা জড়িত ছিলেন, আমরা সবাই আশা করি আমাদের এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারবে, যদিও আমরা যুদ্ধ করছি এক monolithic শক্তির বিরুদ্ধে, কিন্তু এটি গঠিত বিভিন্ন রকম ক্রিয়াশীল অংশের মিশ্রণে। যার মধ্যে কিছু অংশ অন্য অংশগুলোর সাথে কিছু-কিছু ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক। এ কারণে খারেজিদের মধ্যে কিছু দল এমন আছে, যেগুলো মতপার্থক্যের ব্যাপারে তাদের আদর্শিক জ্ঞাতি ভাইদেরকেও পরোয়া করে না।

কিন্তু যদি আমরা তাদের সবার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখবো যে তাদের সকল দলই একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়া। ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই এ বিভিন্ন দলগুলোর সূচনা হয়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাদের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট হয়ে পরে। বিভিন্ন বিভ্রান্তিতে পড়ে এক সময় দালীলের চাইতে নিজেদের মতামত তাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, ফলশ্রুতিতে তারা এমন সব ধারণার উদ্ভব ঘটায় যেগুলো ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যহীন। এ কারণে পাঠকদের এ ব্যাপারটা বুঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, কিছু খারেজি অবৈধ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে, পাশাপাশি শারীয়াহর বিরুদ্ধে ও বিদ্রোহ করে বসে। আবার এমন খারেজিও আছে, যদি শাসক বৈধ হয়, তবে তারা শারীয়াহর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে।

এমন খারেজি আছে যারা সালাত আদায় করে। তেমনি কোন রকম ইবাদাতই করেনা এমন খারেজিও আছে। এরা হচ্ছে ইসলাম এবং মুসলিমদের শত্রু।

কিছু আছে মুরজি'আ খারেজি যারা কিছু লোককে কুফফার বলে। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে গিয়ে নিজেদের বানানো নিয়ম, তারা নিজেরাই মানে না।

খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে যে খারেজিদের মধ্যে সর্বদা বিভক্তি লেগে থাকে। ক্রমাগত তাদের এক শাখা থেকে আরেক শাখার উদ্ভব হয়। তারা মতবিরোধ করতে থাকে নিজেদের মধ্যে এবং মুসলিম উম্মাহর সাথে।

খারেজিরা অন্যান্য এমন বিদা'আত এবং মুবতাদিদের (বিদ'আতি) সাথেও যুক্ত হতে, যাদের সাথে তাদের কিছু কিছু ধ্যান ধারণা মিলে যায়। যেমন: মুতাজিলা খারেজি, শিয়া খারেজি, মুরজি'আ খারেজি, এসব গুলোই আদি খারেজিদের (হারুরিয়্যাহ) শাখা-প্রশাখা, যারা সবাই মীমাংসার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছিল। তাদের থামনোর একমাত্র রাস্তা হল তাদের সাথে যুদ্ধ করা এবং তাদের এলাকা থেকে তাদের বহিঃস্কার করা।

মাঝে মাঝে খারেজিদের চেয়ে মুরতাদ এবং বহিঃশত্রুদের পক্ষ থেকে বিপদ বেশি ভয়ংকর হতে পারে, তখন সুন্নি মুসলিম ইমামদের উচিত খারেজিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর শত্রু তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে তাদের সাথে যুদ্ধ কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রাখা। আর সম্ভব হলে একযোগে সকল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যেমনটা আলজেরিয়াতে মুজাহিদরা একই সাথে মুরতাদ সরকার এবং খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন।

কিছু চরমপন্থী আছে যারা তাদের চরমপন্থি বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে অন্য মুসলিমদের হত্যা করেনা। তবে তারা মুসলিমদের সাথে বিতর্ক করে আর তারপর মুসলিমদের তাকফির করে। তবে বাস্তবে মুসলিমদের তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে হত্যা করেনা। এরা হচ্ছে তাকফিরিয়্যাহ বা তাকফিরি। এক্ষেত্রে উত্তম হল এদের যুদ্ধ না করে, এদের প্রকৃত রূপ মুসলিমদের সামনে উন্মোচন করে দেয়া। কখনো যদি এমন হয় যে, মুসলিমদের বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে তাকফিরিরা ছাড়া আর কেউ যুদ্ধ করছে না, তবে সে ক্ষেত্রে তাদের নেতৃত্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ। পূর্বে এমন প্রমাণ আছে যে কিছু তাবি'ঈন খারেজিদের নেতৃত্বে শি'আদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। যখন তাদের এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হত, তখন তারা বলতেন, "আমরা আল্লাহ শত্রুদের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছি।"

আমাদের সময়ের খারেজিদের ভয়াবহতা মুরজি’আদের তুলনায় কম। কারণ খারেজিরা দ্বীনের নিয়মগুলোর মধ্যে অতিরিক্তি কঠোরতা আরোপ ও অতিরঞ্জন করে। আর মুরজি’আরাতো ইসলামের কোনরকম প্রতিরক্ষা করার চেষ্টা করা ছাড়াই দ্বীনের মূলবিষয় গুলোকেই একে একে ছেড়ে দেয়। মুরজি’আদের কাজের পরিণাম কি হতে পারে, তা জানার জন্য, আজকের কসভো, আলবেনিয়া এবং এমন অন্যান্য জায়গার মুসলিমদের দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। এখানকার মুসলিমরা ইসলাম হতে দূরে সরে গিয়েছিল, এবং একমাত্র চরম বিপর্যয়ের পরই তারা ইসলামে ফিরে আসার চেষ্টা করছে। পুরো উম্মাহ যদি মুরজি’আদের অনুসরণ শুরু করে তবে সমস্ত উম্মাহ-র সাথেই এরকম ঘটতে পারে।

আমরা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করি এবং একমাত্র তাঁরই সাহায্য চাই। খিলাফাহ ব্যবস্থার বিলুপ্তির পর আমাদের শরীয়াহ, সম্মান, মর্যাদা, আমাদের সাহস আজ যে যখন নির্যাতনের মুখে পড়েছে, এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য, আমরা যেন শুধু আল্লাহর দ্বীনেই আবার প্রত্যাবর্তন করি, শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই, এবং আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার কাছে এই ব্যাপারে সাহায্য চাই। আমরা আল্লাহ-র কাছে ভিক্ষা চাই, তিনি যেন আমাদের সাহায্য করেন অহংকারীদের উত্তম শিক্ষা দিতে এবং উম্মাহর সম্মান ও শক্তি পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন: মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ যে নিজেকে জাজিরাতুল আরবের প্রধান ধর্মীয় নেতা এবং আল-সাউদ পরিবারকে ক্ষমতার স্বীকৃতি দিয়ে ফাতওয়া দিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে কি বলবেন?

উত্তর: মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ তার সময়ে অনেক সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন, যেমন তখনকার উসমানি খলিফারা ছিলেন সুফী। সুফী বলতে বর্তমান সময়ে যেরকম সুফী দেখা যায়, সেরকম না; বরং তারা ছিলেন হানাফী মাযহাবের এবং তারা আল্লাহর পথে জিহাদও করেছেন।

সে সময় কবরপূজা খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই ব্যাপারে করণীয় হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ। তিনি জানতেন যে, তিনি এর বিরোধিতা শুরু করলে তাকে খাওয়ারিজ আখ্যা দেয়া হবে না, কারণ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা বাধ্যতামূলক। যদিও খলিফা নিজে সেই পাপের সঙ্গে জড়িত নন, তবে স্থানীয় লোকজন জড়িত ছিল।

তিনি বর্তমানের শয়তান আলিমদের মত নন, যারা সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতে দেখলেই খারেজি ডেকে বসে। পূর্বে এমন অনেক আলিম ছিলেন, সাহাবারাও ছিলেন, যেমন আল-হাসান, আল-হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ওয়া ইজমা'ইন। যারা একই রকম কাজ করেছিলেন, খলিফা অপছন্দ করুক আর পছন্দ করুক, তারা তার ধার ধারেন নি।[1]

---

[1] হিদায়াতপ্রাপ্ত আলিমদের তথ্যের জন্য যারা কিনা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের জন্য শাসকদের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন। Answering the Words of Ibn `Abbas দেখার অনুরোধ রইল

যখন তিনি আল-সাউদ পরিবারকে ক্ষমতার স্বীকৃতি দিলেন, তিনি তাদের বলেন নি, "আমরাই খুলাফা (শাসক)", না; তিনি এটা বলেন নি। তিনি তাদের বলেছিলেন, "তোমরা এই রাজত্বের দায়িত্বে, আমাকে এই রাজত্ব থেকে এই শয়তানি দূরে করতে সাহায্য করার জন্য।" তিনি আরেকটি খিলাফাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নি। একই ব্যাপার ক্রুসেডের সময় ঘটেছিল। ক্রুসেডরদের বিরুদ্ধে খলিফা যুদ্ধ করতে চাইত না, কিন্তু আলিমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেত, অথচ এটা খলিফার প্রতি এক ধারণের অবাধ্যতা। এর পরেও তারা মিম্বরে খলিফার জন্য দুআ করতেন, তাকে অর্থ দিতেন রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য এবং খিলাফার মুদ্রা ব্যবস্থাও ব্যবহার করতেন।

এবং আল-সাউদ এমনটা করে নি এবং করার ইচ্ছাও ছিল না। তাদের সময়ে তারা জিহাদের জন্যেই প্রায় সব অর্থ ব্যয় করে ফেলত। তবে সাউদি পরিবার জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয় করত না। সাউদি পরিবার শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাবকে ব্যবহার করছিল তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে, আর তিনি সাউদি পরিবারকে ব্যবহার করছিলেন আগুন এবং কবর পূজারীদের বিরুদ্ধে একত্রিত করতে। তিনি আল্লাহর রাস্তায়ই কাজ করছিলেন এবং তারা কাজ করেছিল শয়তানের রাস্তায়, যে ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা সূরা নিসার ৭৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন।

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا

"যারা মু'মিন তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে। তাই যুদ্ধ করতে থাকো শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে। দেখবে যে শয়তানের চক্রান্ত নিতান্তই দূর্বল।"

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহহাবের রাহিমাহুল্লাহর ইজতিহাদ ছিল গোত্র এবং মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য। তিনি জানতেন যে তিনি যদি তাদের কাছে গিয়ে খলিফাকে মান্য করতে বলতেন, তবে তারা হয়ত তাকে হত্যা করত। তখন জাজিরাতুল আরবে কবর পূজারী

এবং ব্রিটিশরা রাজ করত, তাই তিনি সাধারণ মানুষদের বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, তারা এখানকার ক্ষমতাবান এবং এখান থেকে শয়তানি দূর করতে তারা তাকে সাহায্য করবে। তিনি কখনো তাদের বলেন নি যে তারাই হচ্ছে খুলাফা। উম্মাহর মধ্যে শুধুমাত্র একজন খলিফা থাকবেন, দ্বিতীয় দাবিদারকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হত্যা করতে বলেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ তাদের আনুগত্যের শপথ দিয়েছিলেন, কারণ তারা তাকে জাজিরাতুল আরবে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করছিল।

কিন্তু এখন আরব উপদ্বীপে শারীয়াহ কই? কোথায় শারীয়াহ? কোন আইন বলে যে মক্কা-মদীনায় গেলে তাদের পর্দা করতে হবে কিন্তু রিয়াদে কামনা যুক্ত শার্ট, অথবা কোন শার্ট ছাড়াই যাওয়া যাবে? অনেক সাউদি রিয়াদে আজকাল মিনিস্কার্টও পরা শুরু করেছে। অনেক সমকামীও আছে সেই ভূমিতে, জেদ্দার এয়ারপোর্টে গেলে সেটা টের পাওয়া যায়। তারা শারীয়াহ প্রতিষ্ঠিত করছে?

শাইখের প্রচেষ্টা ছিল এই অঞ্চলটিকে পরিষ্কার করা, আল্লাহর দিকে এখানকার ইবাদাতগুলোকে পরিশুদ্ধ করা। তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু সাউদিরা তার চেয়ে চালাক ছিল; তাই শাইখের মৃত্যুর পরপরই তারা খিলাফার চরম শত্রু ব্রিটিশদের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করল। তারা তাদের সাহ্য্য করা শুরু করল খিলাফার বিরুদ্ধে বোম্বিং এবং বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিতে, এর বিপরীতে তারা বিভিন্ন জায়গার ক্ষমতা চাইতে লাগল যেমন মিশরের। অর্থাৎ শাইখ যে ব্যাপারগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর আল-সৌদ পরিবারের মাধ্যমে সেটা জাজিরাতুল আরবে আবার ফিরে এসেছিল। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর স্বীকৃতি দেয়ার পর একটি বড় দায়িত্ব হচ্ছে জিহাদ করা, বিশেষ করে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে। তাই তাদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিন বা আরব উপদ্বীপে জিহাদের জন্য ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কি করে এইসব খারাপ লোকগুলোকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভূমিতে ছেড়ে দিতে পারি? এটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে অনেক খ্রিষ্টান বিভিন্ন ভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ চুরি করার চেষ্টা করছে!

সালাহ আদ-দ্বীন আল-আইউবী রাহিমাহুল্লাহ স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেন, যেখানে তিনি বলেন, "আমাক এই দুই স্বর্ণকেশী থেকে রক্ষা করো!!" সালাহ আদ-দ্বীন আল-আইউবী রাহিমাহুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, "এই দুই স্বর্ণকেশী কারা?" যখন তিনি জাগলেন, বাহিরে গিয়ে দেখলেন যে সাদা স্বর্ণকেশী দুই বিদেশী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর খনন করছে, তার দেহ চুরি করার জন্য।

এরপর তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের চারপাশে ধাতব পাত দিয়ে বাধাই করে দিলেন যে কেউ পুনরায় এমনটা আর না করতে পারে। আমাদের অবশ্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ আদেশটি মান্য করতে হবে, "জাজিরাতুল আরব থেকে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বের করে দাও।" কিন্তু ইব্‌ন বায কি বলেছেন? বলেছেন, তাদের এখানে থাকা উচিত! অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তাদের বের করে দিতে। অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহর রাহিমাহুল্লাহ সাথে প্রতারণা করা হয়েছে, আমাদের প্রতারিত করা হচ্ছে। তবে কতদিন আর! যদি আমরা এই অন্যায় রোধ করতে চাই, যারা এই অন্যায় চালিয়ে যাচ্ছে, যারা খিলাফাহ ব্যবস্থাকে চুরি করেছে, খিলাফাহকে ধ্বংস করেছে, তাদেরকে তো শুধু এই কারণেই হত্যা করা উচিত। আর শরীয়াহর মধ্যে বিকৃতি ঘটানো যেমন, নারী কাপড় খোলা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের কাছ থেকে অর্থ নেয়া, মুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, এইসবের কথা তো বাদই দিলাম। মুসলিমদের হত্যা আর কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা, এটা কাদের লক্ষণ? এইরকম তো খারেজিরা করে। কারা এইকম করছে? সেটা আমরা না, বরং শাসকরা।

প্রশ্ন: একটি লিফলেটে জিহাদের জন্য দাড়ি শেভ করার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে যে এতে কুফফারদের নযর এড়িয়ে চরা সম্ভব হবে। কিছু মানুষ এর পক্ষে, কিছু বিপক্ষে। এক্ষেত্রে সঠিক পন্থ কোনটা? জিহাদি ভাইদের মধ্যে এর পক্ষে এবং বিরুদ্ধে ভাইয়েরা আছেন। এক্ষেত্রে কি করা উচিত?

উত্তর: দাড়ি শেভ করার সাথে জিহাদিদের কোন দেনা-পাওনা নেই। "সালাফি", "জিহাদি", এ রকম পরিভাষা আমাদের ব্যবহার করা উচিত নয়, যখন আমাদের পরিচয় হল আমরা শুধুমাত্র মুসলিম। এরকম পরিভাষার ব্যহারকে আসলে ইসলাম সমর্থন দেয় না, যেমনটা আমি একটি অডিও রেকর্ডিং এ বলেছিলাম, "এটা কি সালাফিজম নাকি শাইখিজম?" আসলে এই রকম বলা যে, "ও জিহাদিরা তো এমনটা বলেছে.. " আসলে একজনকে ইসলামের সীমারেখা থেকে বের করে দিতে পারে কারণ এধরণের বক্তব্যের মাধ্যমে জিহাদকে অবজ্ঞা, হাসি-ঠাট্টা অথবা নিন্দা করা হয়।

দাড়ির এই বিষয়টির ক্ষেত্রে আমাদের যা ভালোভাবে বুঝতে হবে তা হল, এ ধরণের ব্যাপারগুলোতে বিভিন্ন ধরণের অবস্থা হতে পারে। এখানে প্রক্ষাপট অনুযায়ী কিছু পার্থক্য রয়েছে যা কখনো মোটা দাগে একটি নিয়মের মধ্যে ফেলা যাবে না। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা এমন না যে, আপনার সাথে কারো কথা হল, 'ঈসা আলাইহিস সালাম এর ব্যাপারে যার দৃষ্টিভঙ্গি আহলুস সুন্নাহ থেকে ভিন্ন, যেমন সে ভাবছে তিনি আলাইহিস সালাম মৃত, অথবা এমন কিছু। অথবা কেউ যদি কুরআনের আয়াতের বিপরীতে গিয়ে বলে যে ইহুদি-খ্রিষ্টানরা একটা সময় জান্নাতে যাবে – তার ক্ষেত্রে সমস্যাটা অনেক গুরুতর, কারণ এই ব্যাপারগুলো আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি। এইসব হচ্ছে আল্লাহ, তার কিতাব, তার নবী-রাসূল, মালাইকা, তাকদীর এবং আখিরাতের ব্যাপারে বিশ্বাসগুলোর মত। এইসব ব্যাপারে মত পার্থক্য করা হারাম কারণ এগুলো মু'মিনদের ঈমানের অঙ্গ।

আবার এমন কিছু কিছু বিষয় আছে, যেখানে ইজতিহাদের সুযোগ আছে। যেমন জিহাদ করার জন্য জিহাদের স্থানে কিভাবে যাওয়া হবে, এক্ষেত্রে ইজতিহাদের সুযোগ আছে (জিহাদ করা হবে কি না, এক্ষেত্রে ইজতিহাদের সুযোগ নেই। এটি ফারয, সুতরাং বাধ্যতামূলক,

ইজতিহাদী বিষয় না)। কিছু লোক বলে, "আমি জিহাদে যেতে চাই, কিন্তু তারা যদি আমাকে দাড়ি সহ দেখে ফেলে ময়দানে যাওয়ার আগেই, তবে তারা আমাকে হত্যা করবে।" এজন্যে তারা শেভ করে যেন নিরাপদে জিহাদে যেতে পারে।

এসব হচ্ছে ইজতিহাদের ব্যাপার, তাই আমরা আল্লাহর কাছে এ ধরনের ইজতিহাদি ব্যাপারে আমাদের ও তাদেরকে নির্দেশনা দেয়ার দু'আ করি, কারণ আল্লাহই তাদের অভিপ্রায় ভালো জানেন। কিন্তু দাড়ি শেভ করলে তার জন্য সালাতের ইমামতি করা উচিত নয়, কারণ ইমামের হওয়ার জন্য এটা শর্ত, সাথে সাথে পোষাকের সুন্নাহ-ও। যদি এই ব্যাপারে কোন ইজতিহাদ হয় (অর্থাৎ আলোচ্য প্রেক্ষাপটে দাড়ি শেভ করা) তবে সেটা নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য, পুরো উম্মাহর জন্য না।

কিছু মানুষ ইজতিহাদী ব্যাপারে মত বিরোধ শুরু করে দেয়, যেমন সালাতে প্রথম তাকবীরের পরও হাত উঠানো (রাফউল ইদা'ইন) জরুরী কি না, এবং তারা এসব বিষয়কে মূল বিষয় থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলে। তারপর তারা এমন বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়, যেখানে আর ইজতিহাদের সুযোগ নেই, যেমন ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করার বিষয়টি! তারপর আরেকটি হারাম যুক্তি যেমন এই সময় শরীয়াহ কায়েম করা যাবে কি না!! অথচ এইসব ব্যাপারে বিতর্ক চলে না এবং এখানে ইজতিহাদেরও সুযোগ নেই, কারণ উম্মাহ এইসব ব্যাপারে পূর্বেই সিদ্ধান্তে পৌছেছে। কিন্তু সালাতে জোরে আমীন বলা বা না বলা, প্রথম তাকবীরের পরও হাত উঠানো বা না উঠানো নিয়ে বিতর্ককে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত না এখন। কামিস না জালাবিয়্যা কোনটা সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী এটা নিয়ে এখন বিতর্ক করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব ব্যাপারে বিতর্ক মানে সময়ের অপচয়। সাহাবাদের রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম ওয়া ইজমা'ইন সময় তারা ঈমানের মূল বিষয়গুলোর ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন, কারণ এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তাই আমাদের বোঝা উচিৎ, ঈমানের মূল বিষয়গূলো ব্যতীত বাকি ফুরুয়ী বিষয় নিয়ে ক্রমাগত বিতর্ক হল (উম্মাহকে বিভক্ত করার জন্য) শয়তানের হাতিয়ার এবং আমাদের উচিৎ এ ধরণের তর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থাকা। তবে, আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ মাযহাবি ধারা কিংবা দলাদলী, ফিরকাবাজি নিয়ে আগ্রহী না, তারা শক্তিশালী

দলীলের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী। একটা সময় কুফফার এই মাযহাবিজমকে আর ফিরকাবাজিকে অর্থায়ন করত, কারণ এর মাধ্যমে উম্মাহকে বিভক্ত এবং তাদের মাঝে কলহ সৃষ্টি করা যায়। বর্তমানে এই অবস্থা অনেকটা কমে গেছে।

এই ব্যাপারে (ময়দানে নিরাপদে পৌছানোর স্বার্থে দাড়ি শেভ করা) আমার ইজতিহাদ হচ্ছে যে এটা বৈধ, কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি হাদিস আছে যে, মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নামে এক সাহাবী ছিলেন, যিনি কাব ইব্ন আশরাফকে হত্যা করার জন্য গঠিত দলের দায়িত্বে ছিলেন। কাব, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করতো। কাব ইব্ন আশরাফের নিকটাবর্তী হবার সুবিধার্থে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্ন মাসলামা রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহুকেও তেমন কটু বাক্য বলার অনুমতি দিলেন যেন তাকে সহজেই হত্যা করা যায়।[1] আরেকটি প্রমাণ হল যে, হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের সময়ে কিছু সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া ইজমা’ইন এবং তাবিঈন হাজ্জাজের বাহিনীর কিছু লোকদের ঘুষ প্রদান করতেন যেন তারা হাজ্জাজ এবং তার ফিতনাহ গুলোকে লুকিয়ে থাকতে দেয়। তাদের জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলে, “আমরা আমাদের দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দ্বীনের অন্য অংশ দিয়ে ক্রয় করছি।”

ঠিক এভাবে, যদি কোন যালিম সরকারের পুলিশ কোন মুসলিম মহিলার খোঁজে আসে, এক্ষেত্রে (তাদের কাছে পরিচয় লুকানোর জন্য) মহিলাটি হয়ত এক্ষেত্রে হিজাব অথবা শুধুমাত্র নিকাব ছাড়া কাজ করতে পারবে। এটা তাকে সেই দেশ থেকে, সরকারের নির্যাতন, ধর্ষণ এবং অন্য সকল কিছু যা তার দ্বীনের জন্য হুমকি, সেগুলোর কবল থেকে রক্ষা পাবার সুযোগ দিবে। সোজা কথায় যদি এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন ঈমানের শাখাগুলোর উপর পাবন্দি, ঈমানের মূলের জন্য হুমকি স্বরূপ হয়ে পড়ে, তবে সেক্ষেত্রে ঈমানের মূল রক্ষা করার দিকে গুরুত্ব দিবে হবে, এবং এজন্য প্রয়োজনে, শাখা প্রশাখাকে ছাঁটতে হবে (ঐ সময়ের জন্য, ঢালাওভাবে না)। এই ব্যাপারটি আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উক্তিটিও ব্যবহার করা যায়, যিনি বলেছিলেন, “যদি তুমি দেখ যে কোন মুরতাদ আযান

[1] সহীহ বুখারী, খন্ড ৫, হাদিস ৩৬৭

দিচ্ছে, তুমি গিয়ে আগে তাকে হত্যা করো, কারণ সে দ্বীনের একটি বিষয়কে আরেকটি বিষয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে।”

প্রশ্ন: আপনি বললেন যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে শাসকের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া বৈধ। কিন্তু কেউ যদি আজ সেটা করতে যায়, নিশ্চয়ই তাকে সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হতে হবে। অর্থাৎ মুসলিম দাবীদার কিছু মানুষের মুকাবিলা করতে হবে। যদি তাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়, তবে এটা কি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং নিরীহ মুসলিম হত্যা হয়ে গেল না? মুসলিমদের জন্য কি এই সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল, যারা বলে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ?

উত্তর: আল্লাহ এই ব্যাপারটি আমাদের ইজতিহাদের জন্য ছেড়ে দেন নি, কারণ এই ব্যাপারটি হচ্ছে ঈমান এবং কুফরের। এই রকম পরিস্থিতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ও ঘটেছিল। মুখে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলা কিছু লোক ইসলাম ও মুসলিমদের বিরোধিতা করেছিল। তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে হত্যা করা হয়, কুর’আনে এই কাজের প্রশংসা করা হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কাজ অনুমোদন করেন।

ভাই-বোনদের বুঝা উচিত আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে ঈমানের ব্যাপারে দুইভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। একটি হচ্ছে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তার ঈমানের অবস্থার পরীক্ষা। আরেকটি হল তার দল বা যে দলের প্রতি তার আনুগত্য ও সমর্থন রয়েছে, যে দলের জন্য সে চেষ্টা-সাধনা করে, সময় ও শ্রম ব্যয় করে সেই দলের ঈমানের অবস্থার ভিত্তিতে। এইভাবে চার প্রকারে মানুষকে ভাগ করা যায়। এই চারটি হল-

১। **যে ব্যক্তিগত ভাবে মুসলিম এবং দলগত ভাবেও মুসলিম:** এরা হচ্ছে সেইসব মুসলিম যারা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ পালন করেন এবং সাধ্যানুযায়ী ইসলামের উপর ‘আমল করেন। তারা হিদায়াত প্রাপ্ত দলের সাথে কাজ করেন অথবা তাদের সমর্থক। যেমন আনসার এবং

মুহাজির সাহাবাগণ। কিংবা সেসব মুসলিমরা যারা এমন খিলাফাহর আনুগত্য করেন যা শারীয়াহ অনুযায়ী শাসন করে। তারা আনুগত্য করেন যতক্ষণ খালিফাহ শারিয়াহ প্রতিষ্ঠিত রাখেন, যদি ব্যক্তি হিসেবে খালিফাহ যুলুমকারী হয় তাও। ১৯২৪ এর খিলাফাহ বিলুপ্তির পর এই উদাহরণ আর অবশিষ্ট নেই। এখন এর উদাহরণ হল, সেসব মানুষ যারা ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম পালন করছে এবং যারা শরীয়াহ ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা ও জিহাদ করছেন। এবং তাদের সাথে তারাও এ দলের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবেন, যারা তাদের সাহায্য করে, সমর্থন করে, যদিও তাদের তাদের সাথে একত্রে কাজ করতে পারছে না। যেমনটা আল্লাহ বলেন,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ কখনোই কাউকে সাধ্যাতীত দায়িত্ব দেন না।" (সুরা বাক্বারাহ, আয়াত ২৮৬)

২। যে ব্যক্তিগত ভাবে কাফির এবং দলগত ভাবেও কাফির: এরা হচ্ছে সেইসব লোক যারা বাহ্যিক ভাবেও দ্বীন পালন করে না, হোক কাফির আল-আসলি হবার কারণে অথবা মুরতাদ হবার কারণে। আরেকটি উদাহরণ হতে পারে, যে ব্যক্তি কোন কাফির অথবা মুরতাদ দলের অন্তর্গত এবং তাদের প্রতিরক্ষা করে। যেমন: ইহুদি, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী, নাস্তিক, অন্যান্য মুশরিকরা এবং মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে সরকারী সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা। আমরা তাদের এই শ্রেণীতে ফেললাম, কারণ তারা শরীয়াহ রক্ষা না করে শারীয়াহর বিরোধিতা করছে।

৩। যে ব্যক্তিগত ভাবে কাফির অথচ দলগত ভাবে মুসলিম: যে ব্যক্তি দেখায় যে সে মুসলিম, কিন্তু তার অন্তর কুফর এবং নিফাকে পূর্ণ। সে হয়ত একটি হিদায়াত প্রাপ্ত দলের অংশ যেটি আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু'মিনদের সাহায্য করছে। যদিও সে দলটির সাথে প্রতারণা করছে, ভিতর থেকে দলটিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, এমনকি ইবাদাতেও যোগদান করছে; যেন নিজের মূল বিশ্বাস গোপণ করা যায়। যেমনটা আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই এবং তার মত লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় করেছিল।

আমাদের সময় এদের উদাহরণ হল মুরতাদ সরকারগুলোর বিভিন্ন গোয়েন্দারা যারা ফ্রন্ট লাইনে গিয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগীরি করে। তারা বিভিন্ন হালাকা এবং জ্ঞান অর্জনের মজলিশেও যোগদান করে। তাদেরকেও আল্লাহর জন্য বের হয়েছে বলেই মনে হয়। তাদের স্বরূপ প্রকাশিত হবার আগ পর্যন্ত তাদের ব্যাপারটা আল্লাহ-র উপর ছেড়ে দিতে হবে। আর প্রকাশ পাবার পর তাদের উপর শারীয়াহ অনুযায়ী হাদ্দ প্রয়োগ করতে হবে।

৪। ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম অথচ দলগতভাবে কাফির: ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা উচিত আবারো। এটি যদি ঠিক মত না বুঝা হয়, তবে তাকফিরের ক্ষেত্রে এর অপব্যবহার হতে পারে। এই অপব্যবহার মূলত খারেজি, তাকফিরি এবং মুরজি'আদের দ্বারা বেশি হয়ে থাকে। এরকম পরিস্থিতি বা দল উম্মাহর জন্য নতুন কিছু না। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের রাদ্বিয়ায়ল্লাহু আনহু যুগেও এরকম দল ছিল, যখন রিদ্দার ঘটনাগুলো ঘটছিল। এই রকমটা তাতারদের সময়ও ঘটেছিল, যখন তারা মুসলিম ভূমিতে প্রবেশ করেছিল, পরবর্তিতে মুসলিমরা তাদের মাঝে এবং তারা মুসলিমদের মাঝে মিশে গিয়েছিল।

বর্তমানে মূলত উম্মাহর অবস্থা এমনই। এইরকম মুসলিম হয়ত ব্যক্তিগতভাবে ইবাদাত এবং ফরযিয়াত পালনের দিক থেকে ভালো মুসলিমও বটে। এমনও হতে পারে সে রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করে, হজ্জ্ব করে, সাথে অন্যান্য ইবাদাতও। যদিও সে এমন লোকদের সমর্থন করে যারা কিনা শরীয়াহর বিরুদ্ধে লড়াই করছে অথবা মু'মিনদের হত্যা করছে, তাদের সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ থেকে বাধা দিচ্ছে। কাফির আসলি কিংবা মুরতাদদের বিজয়ের না হওয়া পর্যন্ত, সে তাদের পক্ষে প্রচেষ্টা চালায়। এরকমটা হয়েছিল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'মিনদের নিয়ে তায়িফবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, যারা কিনা ইসলাম গ্রহণের পরও সুদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা বন্ধ করে নি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিষেধ সত্ত্বেও তারা তলোয়ারের আশ্রয় নিয়েছিল তাদের সেই সুদের ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ২১ দিন ধরে। তাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেন, মিনজানিক দিয়ে পাথর, সাথে সাথে আগুন ও সাপও নিক্ষেপ করা হয়েছিল, যদি এসব কিছু তাদের নারী-শিশু, বৃদ্ধ-অক্ষম সকলকেই আক্রান্ত করছিল, তারপরও যুদ্ধ বন্ধ না করে চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাদের সাথে কাফিরদের মতই আচরণ করা হয়েছিল, অথচ তারা সালাত, সিয়াম এবং ইসলামের অন্যান্য আহকাম পালন করত। কুরআনে তায়েফবাসীর আলোচনায় আয়াত নাযিল হয়েছে এবং এরকম উদাহরণ দেয়া হয়েছে, ঐসব মুসলিমদের যারা তখনো মক্কা থেকে মাদীনাতে হিজরাহ করেন নি এবং কুরাইশ তাদেরকে বদর যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য করেছিল। যেন এর দ্বারা মুসলিমদের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা ভয় দেখানো যায়। এই মুসলিমদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আব্বাস রাদ্বিয়ায়ল্লাহু আনহু-ও ছিলেন। সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনা তে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের বলেন যে: বনী হাশীমের কিছু লোককে এই যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে”। তিনি সাহাবাদের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া ইজমা’ইনকে বললেন, যুদ্ধের ময়দানে তাদের দেখলে যেন হত্যা না করা হয়, কেননা তাদের জোর করে আনা হয়েছে। আনসারদের মধ্য থেকে একজন সাহাবী বললেন, “যেখানে আমরা আমাদের পরিবারকে মৃত্যুর মুখোমুখি করছি, সেখান আমাদের শত্রুদের হত্যা না করে তাদের ছেড়ে দিতে যাচ্ছি!” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, “তুমি কী চাও যে আমার চাচা আব্বাসের গালে চড় পড়ুক?” এরপর উমার রাদ্বিয়ায়ল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে ওই সাহাবীকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে অনুমতি চাইলেন।

কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। যুদ্ধের সময় মুসলিম পক্ষে থেকে কুরাইশদের সাথে আসা সেই সব মুসলিমের ঘাড়ে-বুকে কিছু তীরও বিঁধেছিল। এটা দেখে আনসার এবং মুহাজিররা ভয়ে চিৎকার করছিল, “আমরা আমাদের ভাইদের হত্যা করেছি।!” এরপর আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ

فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا (٩٧) إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (٩٨)

"যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।" (সূরা নিসা, আয়াত ৯৭-৯৮)[1]

এরপর আল্লাহ দূর্বল এবং অক্ষমদের হিজরত না করার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে অব্যাহতির কথা জানিয়েছেন। এই ঘটনাটিতে একটি কুফরের দলের সাথে কি রকম আচরণের হবে, এর ব্যাপারে গুরুত্বটা ফুটে উঠে। চাচা আব্বাসের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি শক্ত বার্তা ছিল, যখন তিনি মুক্তিপণ আদায় থেকে অব্যাহতির জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন, সেটি হল, "এই যুক্তি একপাশে রাখুন। আপনি একটি যুদ্ধরত দলের সাথে এসেছেন এবং আপনার সাথে সেই দলের ভিত্তিতেই আচরণ করা হবে। আপনাকে অবশ্যই নিজের এবং আপনার ভাগিনার পক্ষ থেকে মুক্তিপণ আদায় করতে হবে।" আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে, "আপনাকে আমরা বাহ্যিক দিক থেকেই বিচার করব, অন্তরের ব্যাপার বিচার করবেন আল্লাহ।"[2]

এরপর তিনি তার চাচা আব্বাস রাদ্বিয়ায়ল্লাহু আনহু কে তার নিজের এবং তার ভাগিনার পক্ষ থেকে মুক্তিপণ প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। এরপর আল্লাহ নাযিল করলেন,

---

[1] তাফসীর উল-কুরআন উল-আযিম এবং তাফসির জা'মি উল-আহকাম

[2] কিতাব আল-গাজওয়াত এবং সহীহ বুখারীতে আয়াতটি তাফসীর

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّمَن فِىٓ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰٓ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِى قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"হে নবী, তাদেরকে বলে দাও, যারা তোমার হাতে বন্দী হয়ে আছে যে, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম মঙ্গলচিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" (সূরা আনফাল, আয়াত ৭০)

তিনি বিশ আউন্স স্বর্ণ তার নিজের এবং ভাগিনার মুক্তিপণ হিসেবে প্রদান করলেন।[1] কুফরের দল আর ঈমানের দলের মধ্যে বিচার করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا

"যারা মু'মিন তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে। তাই যুদ্ধ করতে থাকো শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে। দেখবে যে শয়তানের চক্রান্ত নিতান্তই দূর্বল।" (সূরা নিসা, আয়াত ৭৬)

এই আয়াতে বিভিন্ন দলের ব্যাপারে তিনটা বিধান রয়েছে,

১। যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তারা সাধারণভাবে মু'মিন, যদিও ঐ দলে মুনাফিক থাকতে পারে। তারপরও সেটা মু'মিনের দল।

---

[1] তাফসীর কুরতুবী, ইব্ন কাসি, তাবারীতে আয়াতটির তাফসীর

২। যারা আল্লাহর শত্রুদের পক্ষে যুদ্ধ করে, অথবা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন আদর্শের পক্ষে যুদ্ধ করে তারা হচ্ছে কুফরের দল। যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোক থাকতে পারে যারা কাফির না। তবুও তাদের দলগত হিসবে কাফির দল হিসেবে গণ্য করা হবে, বাহ্যিক ভাবে যা প্রকাশিত হয়েছে তার ভিত্তিতে।

৩। এই রকম দলের ব্যাপারে আমাদের নীতি ও আচরণ কি হবে তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের জন্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। কোন দলের সাথে আমরা থাকবো, কোন দলকে সাহায্য করবো, তাও আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বলে দিয়েছেন। এই আয়াতে আল্লাহ্ আমাদের বাহ্যিক দিক দেখেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেছেন এবং এই যুদ্ধ অবশ্যই চলবে।

অর্থাৎ আল্লাহ দলগত ভাবে কুফর আর ঈমানের পার্থক্য রেখেছেন যেন কাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে সেটা নির্ণয় করা যায়। যে দলটি আল্লাহর বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ করছে, তারা হচ্ছে ঈমানের দল এবং যারা তাগুতের পক্ষে যুদ্ধ করছে, তারা হচ্ছে কুফরের দল। আল্লাহ-র আইন ছাড়া অন্য যে সকল কিছু, কিংবা যে সকল ব্যক্তির কাছে মানুষ বিচার-ফয়সালার জন্য যায় তারাই হলো তাগুত। আর সন্দেহাতীত ভাবে এই প্রকার তাগুত পক্ষে যারা যুদ্ধ করে, তারা হচ্ছে কুফরের দল। এবং আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে যেখানে আল্লাহ কুফরের দল এসং ঈমানের দলের পার্থক্য টেনেছেন, এই ব্যাপারে হাদিসটি হলঃ

আয়িশা রাদ্বিয়ায়ল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, একটি সেনাবাহিনী কাবায় যুদ্ধ করতে আসবে। যখন তারা বাইদা নামক স্থানে আসবে, তখন ভূগর্ভে তাদের প্রথম লোকটি থেকে শেষ লোকটি পর্যন্ত বিলীন হয়ে যাবে। আয়িশা রাদ্বিয়ায়ল্লাহু আনহু বলেন, ইয়া রাসলুল্লাহ! কিভাবে তাদের সকলকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেয়া হবে, সেখানে তো বাজারের জন্যও কিছু লোক থাকতে পারে, অথবা এমন লোক যারা তাদের মধ্য থেকে নয়? তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, "তাদের প্রথম

জন থেকে শেষ জন সকলকেই ভূগর্ভে বিলীন করে দেয়া হবে, এর পরে পরকালে তাদের নিয়াত অনুযায়ী তাদের উত্থাপন করা হবে।"[1]

আহমাদ, তিরমিযি এবং ইব্‌ন মাযাহ রাহিমাহুমুল্লাহ এর বর্ণনা মতে, তাদের মধ্যে এমন লোক থাকবে যাদের জোর করে আনা হয়েছে। নাসাই'তে আরো বলা হয়েছে, জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তাদের মধ্যে যদি মু'মিনরা থাকে? এজন্যে আমরা জানি যে যদি তাদের মধ্যে কিছু মু'মিনও থাকে, তবুও তারা হচ্ছে কুফরের দল।

যদিও একটি দলের কাফির দল হয়, তবুও তাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে কাফির বলা যায় না। হতে পারে যে তাদের মধ্যে জোর করে আনা লোক রয়েছে, হতে পারে ফাসিক মুসলিমরা রয়েছে, যারা লোভে পড়ে সেখানে আছে, হতে পারে এমন লোক আছে যারা মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য সেখানে তার ঈমান লুকিয়ে আছে, যেমন মিশরের সেনাবাহিনীতে খালিদ আল-ইসলামবুলী[2] অথবা ফেরাউন পরিবারের সেই লোকটি,

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤۡمِنٌ مِّنۡ ءَالِ فِرۡعَوۡنَ يَكۡتُمُ إِيمَـٰنَهُۥٓ أَتَقۡتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدۡ جَآءَكُم بِٱلۡبَيِّنَـٰتِ مِن رَّبِّكُمۡۖ

"ফেরাউন পরিবারের সেই মু'মিন লোকটি, যে তার ঈমান লুকিয়ে রেখে বলেছিল, তোমরা কি শুধুমাত্র এই কারণে তাদের হত্যা করবে, যে তারা বলে, আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের প্রভু এবং সে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছে।" (সূরা গা'ফির, আয়াত ২৮)

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদিস ১৯৭৫

[2] এই লোকটি মিশরের একজন আলিম মুহাম্মাদ ইসলামবুলীর রাহিমাহুল্লাহ ভাই। আনওয়ার সাদাতের রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সময়ে খালিদ রাহিমাহুল্লাহ সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তিনি তাদের ধীরে ধীরে পদমর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, এবং যখন সত্য বলার কারণে তার ভাইকে প্রশাসন কারারুদ্ধ করল, খালিদ ৬ অক্টোবর ১৯৮১ সালে সাদাতকে হত্যা করলেন। এই কাজটি টিভিতে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিল, এবং সারা বিশ্ব দেখেছে মন্দের প্রতিহত করার ক্ষমতা এখনো শেষ হয়ে যায় নি। পরবর্তিতে মুবারাক প্রশাসন ঠান্ডা মাথায় ভাই খালিদকে রাহিমাহুল্লাহ হত্যা করে।

এই রকম দুই একটি কারণে, সেই দলকগুলোকে কুফরের দল থেকে বাদ দেয়া যাবে না। কারণে, ফিরাউনের পরিবারের কেউ কেউ মূসা আলাইহিস সালামকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এজন্য আল্লাহ্ ফিরাউন পরিবারের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেন নি।

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, যারা মুসলিম, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে, তাগুতের পক্ষে যুদ্ধ করে, তারা হচ্ছে কুফরের দল। এই শত্রুদের সাথে চরমভাবে যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না এরা আবার ইসলামের শরীয়াহতে, ইসলামের সীমারেখায় ফিরে আসে। যাতে করে ছোট বড় কোন ব্যাপারেই এই দল ইসলামি শরীয়াহ ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে ফয়সালা না করে। যদিও আমরা বলি না যে তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিঃসন্দেহে এক একজন কাফির অথবা মুরতাদ। আমারা তাদের নেতাদের, যারা সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের তাগুত বলি। অপরদিকে আমাদের মুসলিম ভূমিগুলোর জনসাধারণের অধিকাংশই হচ্ছে দূর্বল এবং অসহায়, তাদের বেশির ভাগই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার শরীয়াহকে ভালোবাসে।[1]

উপরের ব্যাপারগুলো থেকে বুঝতে পারলাম যে, যারা সমষ্টিগতভাবে কুফরের দলে থাকলেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ এবং যুদ্ধ করে নি, তাদের ব্যাপারে হুকুম কী ছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীর ব্যাপারটা নিয়ে মানুষের মধ্য সন্দেহ থাকে। কিছু লোক সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত, যারা তাদের দূর্বল এবং অসহায় ভাইদের বিরুদ্ধে অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে। প্রায়ই তাদের স্ত্রী-বোনকে আটকে করে তাদের নির্যাতন চালায় যেন তারা সহজেই সেই ভাইদের ধরে মুশরিকদের কাছে হস্তান্তর করতে পারে। সেসব মুশরিকদের কাছে যারা আল্লাহর শরীয়াহর ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সীমালঙ্ঘনকারী। এইসব সেনাবাহিনীর বাস্তবতা

---

[1] এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ কিছু লোক আছে যারা মুসলিম জনগোষ্ঠি গুলোর সকলকে সমগ্রিক ভাবে কাফির বা মুনাফিক বলে থাকে। তাদের প্রশ্ন করা উচিত, তাহলে তোমরা কাদেরকে উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করছ, যদি তারা সকলেই কাফির হয়ে থাকে? তাহলে তো এইসব ভূমি উদ্ধারের কোন অর্থই থাকে না। এইসব ধারণা থেকে বুঝি যায় যে, খুব জাহিল একজন মুসলিমও এইরকম কথা বলে, যেগুলো শুনতে ভালোই অনেক শ্রোতা জোগাড় করে ফেলতে পারে।

আমাদের বুঝতে হবে, যারা কিনা আপদমস্তক সেকুলার এবং ইসলাম বিদ্বেষী। তাদের মধ্যে আছে:

১। কিছু মুসলিম

২। ইহুদি-খ্রিষ্টান

৩। ইসলামত্যাগী, অন্য ধর্ম গ্রহণকারী

৪। ফ্রী মেসন এবং ফ্রী মেসনারী

৫। কিছু ভাড়া করা মিলিশিয়া, যাদের ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে বিভিন্ন অনির্দিষ্ট চুক্তিতে আবদ্ধ। তাদের শত্রু হচ্ছে বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনগুলো।

এটা আসলে খারেজিদের চরিত্র, যাদের সম্পর্কে বুখারি ও মুসলিমে এসেছে, "তারা মুসলিমদের হত্যা করবে, এবং মুশরিকদের ছেড়ে দিবে"।

যেমনটা বলেছিলাম মূল বইতে যে, তারা আল্লাহর সাথে তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করেছে, শুধুমাত্র শরীয়াহ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা শাসন করার কারণে। সুতরাং তাদের আনুগত্য করার জন্য কোন বা'য়াহ নেই। গুরুত্বপূর্ণ যে পূর্ববর্তী আলিমগণ এই ব্যাপারে দ্বীনের শরীয়াহ থেকেই স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন। এই ব্যাপারে আমাদের শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইব্‌ন তাইমিয়ার রাহিমাহুল্লাহ ফাতওয়াটি[1] পড়া উচিত, যেখানে এইরকম ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

আমরা বলি যে দল ইসলামের কোন সুস্পষ্ট, মীমাংসিত ও দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এমন বিধান ছেড়ে দেয়, যে বিধান যুগ যুগ ধরে কোন নতুন ব্যাখ্যা ছাড়াই চলে আসছে, তবে অবশ্যই এরূপ দলের বিরুদ্ধে মুসলিমদের ইমামদের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা উচিত, এমনকি যদিও তারা দুইটি শাহাদাহ বাক্য পাঠ করে (আশহাদু আল্লাহ্ ইলাহ ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাসূলুল্লাহ)।

---

[1] ফাতওয়া আল-মাসরিয়্যাহ, খন্ড ৪, জিহাদ অধ্যায়

“সুতরাং কেউ যদি এ দুটি তারা শাহদাত পাঠ করে, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ত্যাগ করে, অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, যতক্ষণ না তারা আবার সালাত আদায় করে। যদি তারা যাকাত আদায় না করে, তবে যাকাত আদায় না করা পর্যন্ত মুসলিমদের তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তেমনি তারা যদি রামাদানে সিয়াম পালন না করে, হজ্জ্ব অস্বীকার করে, তারা যদি মদ, জুয়া, ব্যভিচার, বেদী পূজা আরো যা শরীয়াহতে হারাম করা হয়েছে, সেগুলোকে হারাম মনে না করে, অথবা দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যবস্থা, জীবন, সম্মান, সম্পদ ইত্যাদির ব্যাপারে শরীয়াহ কায়েমে অস্বীকার জানায়, অথবা তারা যদি সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা থেকে সরে যায়, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছেড়ে দেয় যতক্ষণ না কুফফার ইসলাম গ্রহণ করে অথবা জিজিয়া দেয়, তবে তাদের বিরুদ্ধেও সেভাবে মুসলিমদের যুদ্ধ করতে হবে”।

“তেমনি যারা দ্বীনের মধ্যে, কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার মধ্যে বিদা’ত সৃষ্টি করে, এবং যারা উম্মাহর সালাফ এবং ইমামদের নিন্দা করে, তাদের কাজের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ছড়ায়, অথবা আল্লাহর স্বীকৃত সিফাত অস্বীকার করে, খুলাফায়ে রাশিদিনদের সময় থেকে চলে আশা আচার আচরণ প্রত্যাখ্যাণ করে, অথবা আনসার বা মুহাজিরদের এবং তাদের অনুসারীদের সমালোচনা করে; অথবা তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করে ইসলামের শরীয়াহকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তাদের আনুগত্য মেনে নেয়ার জন্য, এইরকম যতকিছু আছে, এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

وَقَـٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ (٣٩) وَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوۡلَىٰكُمۡۚ نِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ

“আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।” (সুরা আনফাল, আয়াত ৩৯)

"এবং এ সকল ক্ষেত্রে যখন দ্বীনের কিছু অংশ আল্লাহর জন্য এবং বাকি অংশ অন্য কারো বা কিছুর জন্য, মুসলিমদের তখন যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না দ্বীন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হয়। আল্লাহ বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।" (সূরা বাকারাহ, আয়াত ২৭৮-২৭৯)

এই আয়াত নাযিল হয়েছিল তায়িফের লোকদের জন্য, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, ফরজ সালাত এবং সিয়াম আদায় করত, কিন্তু সুদ বর্জন করে নি। এই আয়াত আদেশ দেয় যে তাদের সম্পদ ছেড়ে দিতে, যদি তারা এরপরও সুদ বর্জনে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা হবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শত্রু।

সুদ হচ্ছে কুরআনে হারাম করা সর্বশেষ গুনাহ, যদিও এটি পারস্পরিক সম্মতিতেই হত। কেউ যদি সুদকে অস্বীকার না করে, সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তাহলে সেসব গুনাহর ব্যাপারে কি যেগুলো সুদের আগেই হারাম করা হয়েছিল?!"[1]

---

[1] শয়তান সেনাবাহিনী এবং আলিমদের ব্যাপারে আরো তথ্যের জন্য, Allah's Governance on Earth এবং Be Aware of Takfir এই দুইটি বই দেখার অনুরোধ রইল।

প্রশ্ন: যেমনটা আমরা সকলেই জানি যে বসনিয়া এবং কসভোতে যা ঘটেছে তাতে সেখানের মুসলিমদের সংশ্লিষ্টতা ছিল। তবে এ ব্যাপারে অনেক অস্পষ্টতা রয়ে গিয়েছে। বসনিয়া অথবা কসভোর এইসব লোকরা মুসলিমদের শ্রেণীতে পড়বে নাকি কাফিরদের? এই জনপদগুলো বেশির ভাগই সালাত, সিয়াম, যাকাত আদায় করে না, এমনকি ইসলামের মূলনীতিগুলো সম্পর্কে খুব কমই জানে, এমনও আছে যে, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ ছাড়া কিছুই জানে না। যদি তারা নাই জানে যে কিভাবে কি করতে হবে, তবে তারা মুসলিম হয় কি করে? তাই এইসব জনপদের লোকেরা কি মুসলিম নাকি কাফির?

উত্তর: অবশ্যই বসনিয়া এবং কসভোর অবস্থা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখেছি যে সেখানে নামে মাত্র মুসলিমদেরও জবাই করা হচ্ছে। যেখানে ইসলামের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান নিতান্তই কম, তারপরেও তাদের বকরীর মত জবাই করা হয়েছে। আমরা এর আগে তাকফির এবং এর শর্তগুলো নিয়ে কথা বলেছি। সেই শর্তগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে অজ্ঞানতা বা জ্ঞানের অভাব।

বসনিয়া এবং কসভোর লোকেদের জন্য 'উজর বিল জাহল' অর্থাৎ 'অজ্ঞাতার অজুহাত' প্রযোজ্য। দুনিয়াতে মনে হয় না আর কোন অঞ্চলের মুসলিমদের এই গরীব, অপদস্থ, নিরীহ মুসলিমদের মতো ইসলামি জ্ঞানের এতোটা অভাব ও এতোটা প্রয়োজন আছে। এ কারণে তারা দ্বীনের ব্যাপারে শুধু লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ-ই মনে রেখেছে। এজন্যে আমরা সকলে তাদের মুসলিম বলি, তবে অবশ্যই আমদের তাদের দ্বীন শিক্ষা দেয়া উচিত। যদি তাদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার পর বা সময়ে তারা ঈমানের কোন মূলনীতি অস্বীকার, তখন তাদের ব্যাপার নিয়ে, তারা মুসলিম নাকি কাফির এ নিয়ে আমরা কথা বলবো। এর আগ পর্যন্ত, এইসব লোকদের জন্য আমাদের বিভিন্ন অজুহাত খুজতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তাদের জ্ঞান বাড়িয়ে দেয়ার জন্য, তাদের ভালো মুসলিম বানিয়ে দেয়ার জন্য, দুআ করতে হবে। যেমনটা ছিলেন তাদের ইউরোপিয়ান পূর্বপুরুষেরা, ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযি, ইমাম

নাসাই, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তাবারানী, ইমাম ইব্‌ন হিব্বান এবং অন্যান্যরা, আল্লাহ তাদের সকলের উপর রহম করুক। আমীন।

বিবলিওগ্রাফিঃ

নাওয়াক্বিদ উল ইসলাম – মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব

কাশফ আশ-শুবুহাত ফিত-তাওহীদ, তাফসিরুল ক্বুর'আন আল-আযীম, আল বিদায়াহ ওয়া আন নিহায়াহ, মাশরুহ ('মাক্তাবা তালিব আল 'ইলম ১৪১৪ হিজরি) –ইমাদ উদ-দ্বীন আবুল ফিদা ইসমা'ইল ইবন কাসির আল –ক্বুরাইশী আদ-দিমাশকি (৭০১-৭৭৪ হিজরি)

তাহকিম আল ক্বুর'আন (লিখিত -১৩৮০ হিজরি) (আল মাদীন আল মুনওয়ারা ১৪১১ হিজরিতে প্রকাশিত সংস্করণ) –আল শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহিম ইবন 'আব্দুল লতিফ (১৩১১-১৩৮৯ হিজরি)

মাক্বাল্লাত উল ইসলামিন – আবুল হাসান আল - আশ'আরি

আখবার উল ক্বাদআ'- আল ওয়াকি'আ

সাহীহ মুসলিম, দার ইহইয়াউত তুরাব আল 'আরাবি (১৪১৬) –আবুল হুসেইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল ক্বুশাইরি আন নিশাপুরি(২০৬-২৬১)

আল মিলাল ওয়ান – নাহাল (মু'সাসাত উল কুতুবউস – সারাফিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন (১৪১৫ হিজরি)) – আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল কারিম আশ- শাহরাস্তানি (৪৭৯-৫৪৮ হিজরি)

ফাতহুল বারি (আল মাকতাবাতউস সালাফিয়্যাহ , আলক্বাহিরা, মিশর ১৩৮০ হিজরি) – আহমদ ইবন 'আলি ইবন হাজার আল আসক্বালানি (৭৭৩-৮৫২ হিজরি)

সাহিহ আল বুখারি (দ্বারউল 'আরাবিয়্যাহ, বৈরুত ১৪০৫ হিজরি) –মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ইল আল মুগীরা (১৯১-২৫৬ হিজরি)

মাদারিজউস-সালিকিন (দ্বারউল কুতুবউল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪১৫ হিজরি) –আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবু বাকর ইবন আইউব ইবন ক্বায়্যিম আল- জাওযিয়্যাহ (৬৯১-৭৫১ হিজরি)

মুসনাদ – আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবন হানবাল

হাক্বীকাত উত-তাওহীদ (দ্বার উল ইসলাম লিন নুশর, মানসুরা, মিশর **১৪১৪** হিজরি) – মুহাম্মাদ বিন হাসান

আল মাহাল্লা – আবু মুহাম্মাদ ‘আলি ইবন আহমদ ইবন সাই’দ আয-যাহিরি ইবন হাযম (৩৮৪-৪৫৬ হিজরি)

মাজমু’আ ফাতাওয়া, কিতাব উল ঈমান – তাক্বিউদ- দ্বীন আহমাদ ইবন আব্দুল হালিম ইবন তাইমিয়্যাহ (৬৬১-৭২৮ হিজরি)

উমদাত উত তাফসির, হুকুমুল জাহিলিয়্যাহ (মাখতাবাতউস-সুন্নাহ আল ক্বাহিরা, **১৪১২** হিজরি) –আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ শাকির (**১৩০৯-১৩৭৭**)

আদ-দ্বারার উস-সুন্নিয়্যাহ ফিল আজওয়াবিয়্যাত ইন নাজদিয়্যা, কিতাব উল আক্বাইদ (**১৪১৭** হিজরি) –মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহিম, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব, সা’দ ইবন আতিক আল-আনক্বারি, মুহাম্মাদ ইবন ‘আব্দুল লতিফ ইবন আব্দুর রাহমান, প্রমুখ।